ফুলের বাগান

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত

প্রণীত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,

১৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

বৈশাখ, ১৩০৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং স্বভাবের শোভায়
যিনি চির-মুগ্ধ ;
বঙ্গসাহিত্যের যিনি অকৃত্রিম হিতৈষী
এবং
সাহিত্য-সেবীর যিনি সহৃদয় সুহৃৎ ;
শাস্ত্রচর্চ্চা তথা স্বধর্ম্ম রক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে,
যিনি বহু অর্থব্যয়ে
ঢাকা সারস্বত সমাজের
পোষণ ও পালন করেন ;
সেই বহুগুণে গুণবান্,—
বদান্যবর, ভাবুক, ভাওয়াল-ভূপতি
পরম পূজাস্পদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুর
মহোদয়ের শ্রীচরণে,—
আমার এই সাধের কাব্য-কুসুমোদ্যান
ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম।
আশা ও প্রার্থনা,—রাজাবাহাদুর ইহা সাদরে গ্রহণ করিবেন
এবং কৃপাচক্ষে দেখিবেন।

ভাওয়ালের অধীশ্বর,—বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

ভূমিকা।

"ফুলের বাগান",—কাব্য-কুসুমোদ্যানেরই নামান্তর। 'কাব্য-কুসুমোদ্যান' নামটা কিছু কটমট হয় বলিয়া, গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি,—"ফুলের বাগান।" উপন্যাস, গল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সমালোচন,—এই কয় প্রকার পুষ্পবৃক্ষে বাগান সাজাইয়াছি। বাগানের যদি কিছু শোভা হইয়া থাকে, এবং ফুলে যদি কিছু সৌরভ থাকে, অবশ্য তাহাই আমার পরম লাভ।

আমার ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর—সুকবি শ্রীমান্ বিপিন-বিহারীর রচনা-সংযোগে, 'বাগান' রচিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক-পত্রে,—আমাদের উভয়ের যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া,—পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন পূর্ব্বক, এই গ্রন্থে সন্নি-বিষ্ট করিলাম। সম্পাদন-কার্য্য আমাকেই করিতে হইয়াছে।

অর্থের পার্থক্য-রক্ষার জন্য, আমি এই গ্রন্থে—বল, কর, ভাল, কাল, ভাব, মত প্রভৃতি চলিত পদগুলিকে যথাক্রমে বলো, করো, ভালো, কালো, ভাবো, মতো প্রভৃতি,—ও-কার দিয়া বানান করি-য়াছি। অবশ্য ঐ ঐ শব্দের অর্থ যেখানে যথাক্রমে, শক্তি, হাত, অদৃষ্ট প্রভৃতি যথাযথ হইবে, সেখানে ঐ স্বাভাবিক বানান যথাযথ রাখিয়া দিয়াছি। ইহাতে এক পক্ষে যেমন অর্থের পার্থক্য রক্ষিত হইবে, অন্যপক্ষে উচ্চারণেরও তেমনি কিছু সুবিধা হইবে;—পাঠকালে পাঠককে অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া আর গোলে পড়িতে হইবে না। এ পন্থা, আপাততঃ অনেকের মনে ধরিবে না, তাহা জানি। জানিয়াও এ পন্থার অনুসরণ করিলাম,—কারণ এ পন্থা সমীচীন ও সুসঙ্গত। এখন বই পড়িতে বসিয়া, পাঠক না ঐরূপ নূতন বানান-পদ্ধতি দেখিয়া গোলে পড়েন,—লেখক বা মুদ্রাকরের

ভ্রম-প্রমাদ না ভাবেন,—তজ্জন্য এই ইঙ্গিতটুকু করিয়া রাখিলাম। অবশ্য, সংস্কৃত সাহিত্যে যে 'কাকু'র প্রচলন আছে,—কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া অথবা আবৃত্তির সুর বুঝিয়া, যে অর্থ উপলব্ধি করিতে হয়, উপস্থিত, বিনাচিহ্নে বাঙ্গলায় বুঝি সে নিয়ম খাটে না। লৌকিক সংস্কৃতে এক 'ছেদ' ভিন্ন কোন চিহ্নই নাই; কিন্তু বাঙ্গলায় এক্ষণে কমা, সেমি, সম্বোধন ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে যথন এ সমস্ত খুটীনাটীই আমরা মানিয়া চলিতেছি, তথন অর্থের সুস্পষ্টতার জন্য এবং কতকটা উচ্চারণের সুবিধার্থও বটে,—চলিত-কথার বানানেরও একটু নূতন পন্থা উদ্ভাবন না করি কেন? তাহাতে তো মূলে—ব্যাকরণে কোন দোষ ঘটিতেছে না? তাই আমরা কিছু দিন হইতে, মামুলি নিয়মের একটু পরিবর্ত্তন করিয়া, অর্থের পার্থক্যরক্ষা হেতু,—'করো', 'বলো', 'ভালো', 'কালো', 'ভাবো', 'মতো' প্রভৃতি চলিত শব্দ,—উচ্চারণ অনুসারে, স্পষ্টরূপে, ঐরূপ 'ও'-যোগে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। এখানে বলা আবশ্যক, এই নূতন ধরণের বানান-প্রথার প্রবর্ত্তক আমি নহি,—বঙ্গের সেই প্রথিতনামা লেখকশ্রেষ্ঠ, মনস্বী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়,—আপন উদ্ভাবনী শক্তিবলে ইহার সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রচলনও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যুক্তিযুক্ত এবং সমীচীন বোধ করিয়াই, আমি পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি।

শেষ কথা;—মলিনা, প্রেমের পরীক্ষা, প্রতিমা, উদ্বোধন, সংসার, মহাশ্বেতা,—এই ছয়টি উপন্যাস ও গল্প; "স্বপ্ন ও জাগরণ" এবং "ঘোম্‌টা",—এই দুইটি প্রবন্ধ; এবং "চিত্রদর্শন" ও "ছায়া-সীতা,"—এই দুইটি কাব্য-সমালোচন,—শ্রীমান্‌ বিপিনবিহারীর রচিত; অবশিষ্ট গুলি আমার লিখিত।

"জন্মভূমি"-পত্রিকায়,—বিপিনবিহারীর বাঙ্গলা লেখার একরূপ

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড

উপন্যাস ও গল্প।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবন্ধ।

তৃতীয় খণ্ড

সমালোচন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, "দুই ভাই"-এর সমধিক প্রচার উদ্দেশে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ, কাব্য-প্রিয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়,—"দুই ভাই"-এর স্বত্ব, আমার স্বত্বভুক্ত করিতে দিয়াছেন। তাঁহার এই উদারতায় আমি বাধিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, "দুই ভাই" আমার লিখিত হইলেও, ইহার স্বত্ব উক্ত গুপ্ত মহাশয়ের। তিনি ইচ্ছা করিলে, ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও ছাপাইতে পারিবেন।

হাতে-খড়ি হয়। আমি এক রকম জোর করিয়া বিপিনবিহারীকে বাঙ্গলা লেখায় প্রবৃত্ত করি। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা দেখিয়া, আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। তারপর যখন সেই রচনা আমি জন্মভূমিতে প্রকাশ করি,—তখন অনেক সহৃদয় ব্যক্তিও, আমারই ন্যায়, বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, 'শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত' নাম-স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও, কেহ কেহ অধিকতর অনুসন্ধানেৎসু হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"সত্যই কি বিপিনবিহারী রক্ষিত আপনারই কনিষ্ঠ সহোদর,—না, আপনি-ই তাঁহার নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন?"—আমার প্রতি তাঁহাদের এতটা অনুগ্রহ-আস্থা কেন জন্মিয়াছিল জানি না,—কিন্তু সেই অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী রচনা যে, সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল,—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই এক রচনাতেই বিপিনবিহারী,—সাহিত্য-সংসারে তথা বিদ্বজ্জন-সমাজে সুপরিচিত হইলেন; সেই হইতেই তাঁহার লেখা সকলে সাগ্রহে ও সমাদরে পাঠ করিতে লাগিল। এরূপ সৌভাগ্য, সহস্রের মধ্যেও একের হয় কিনা সন্দেহ। ভাগ্যবান্ বিপিনবিহারীর সেই প্রথম রচনা,—"মহাশ্বেতা।" বস্তুতঃ, মহাশ্বেতার ভাষা, ভাব, লিখন-ভঙ্গিমা,—অতি অপূর্ব্ব।

বিপিনবিহারী,—প্রতিভাবান্ লেখক। তাঁহার প্রতিভার গতিও অতি বিচিত্র। তিনি অধিক লিখেন নাই বটে, কিন্তু অল্প যাহা লিখিয়াছেন, সমস্তই সারবান্ ও সুচিন্তার পরিচায়ক। তাঁহাকে হাত-মক্স করিতে হয় নাই; দশজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সাহায্য লইতে হয় নাই; প্রতিষ্ঠাবান্ সম্পাদকের কৃপাপ্রার্থী হইতে হয় নাই;—নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে,—যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিয়া,—প্রকৃতির এক নিভৃত কোণে থাকিয়া, হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, তিনি লেখনী ধারণ করিলেন;—শান্ত স্নিগ্ধ মধুর ঊষার অরুণ-কিরণের ন্যায়, ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিভা-কিরণ ফুটিতে লাগিল;—

সে কিরণে, চিন্তাশীল ও ভাবুক পাঠক, বিপিনবিহারীকে চিনিলেন।

বিপিবিহারীর সকল লেখা মৌলিক নয় বটে;—ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ভাব ও চিন্তা তাঁহার প্রধান্ উপকরণ বটে;—পরন্তু ইহা ঠিক যে, তাঁহার ভাষা ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি,—তাঁহার নিজস্ব। এই নিজস্বে, তাঁহার অসাধারণ অদ্ভুত ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার "উদ্বোধন"—টেনিসনের "Day Dream" হইতে অনূদিত হইলেও, তাঁহার "স্বপ্ন ও জাগরণ" ইংরেজী দর্শনের আংশিক ভাব অবলম্বনে লিখিত হইলেও, তাঁহার "ছায়া-সীতা"র স্থলবিশেষে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের দুই একটা কথা আসিলেও, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে,—বিপিনবিহারী চিন্তাশীল ও ভাবুক; বিপিনবিহারী কবি ও সমালোচক; বিপিনবিহারী দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্। তাঁহার লেখায় আন্তরিকতা আছে,—ভাণ নাই; সহানুভূতি আছে,—শ্লেষ নাই, তন্ময়তা আছে,—অসংযত কল্পনা নাই। বিশেষ তাঁহার ভাষা এত কোমল, করুণ ও মধুর যে,—অল্পমাত্র পড়িলেই প্রাণ গলিয়া যায়। তাঁহার বর্ণনা এমন মর্ম্মস্পর্শিনী ও আবেগময়ী যে, কিয়দংশ পড়িলেই বুকে একটা ছাপ্ উঠে। করুণ-রসের অবতারণায় ও সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণের মুন্সীয়ানায়, বিপিনবিহারী যে সুসিদ্ধ, তাহা অম্লানবদনে বলা যায়। তাঁহার চিত্র-দর্শন, প্রেমের পরীক্ষা, প্রতিমা, ঘোম্‌টা প্রভৃতি ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বিপিনবিহারী আমার স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া বলি-তেছি না,—প্রকৃতই আমার বিশ্বাস, বিপিনবিহারীর ন্যায় প্রতিভা-বান্ লেখকের অভ্যুদয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য গৌরবান্বিত।—ঈশ্বর বিপিনবিহারীকে চিরজীবী করিয়া রাখুন।

কলিকাতা,
১৩ই বৈশাখ, ১৩০৬। } শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ফুলের বাগান

মলিনা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা-সৈকতে।

গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া; এক চিত্রকর, শোভাময়ী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, চিত্রফলকে অঙ্কিত করিতেছিলেন। তখন দিবা অবসান হইয়াছে। দূরে,—পশ্চিম নীল আকাশখণ্ডে অস্তমিত সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই বিক্ষিপ্ত স্বর্ণ-কিরণে চারি দিক্ উজ্জ্বলীকৃত। সন্ধ্যার ম্লান-ছায়াটুকু তখনও তাহা মলিন করিতে পারে নাই।

গঙ্গার পরপারে সুন্দর মাঠ। তৃণশষ্পসমাচ্ছাদিত সেই মাঠের উপর শয়ন করিয়া, গাভী রোমন্থন করিতেছে। নদীতটে,—মাঠের প্রান্তভাগে, বৃক্ষব্রততিগুলি শ্যামশোভায় সমাকীর্ণ, পরস্পরে বুকে বুকে মিলিয়া, পরস্পরকে প্রাণে প্রাণ বাঁধিয়া রাখি-

যাছে। মধুরকণ্ঠ বিহগ,—শব্দ-তরঙ্গে আকাশ প্লাবিত করিতেছে সেই মধুর শব্দ-তরঙ্গে সান্ধ্য জল-কল্লোল মিশিয়া, সৌম্য-সন্ধ্যার সেই অপূর্ব্ব মাধুরীটুকু আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে

আর কোথাও কিছু নাই। চিত্রকর অতৃপ্তলোচনে সেই শোভা দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া ভাবিলেন,—"ক্ষুদ্র মনুষ্য আমি, কি সাধ্য আমার,—এ জীবন্ত ছবি এ ক্ষুদ্র চিত্রপটে অঙ্কিত করি!" যতই দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; চক্ষু মুদিয়া আসিল; বাহিরের সে রূপ চিত্রকরের অন্তরে জাগিয়া উঠিল!

অন্তরে রূপ-জ্যোতি,—কি মধুর! কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর! মুহূর্ত্তের জন্য চিত্রকর আত্মবিস্মৃত হইলেন।

চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার ম্লান-ছায়ায় সে ক্ষীণ আলোক ক্ষীণতর হইয়াছে। চিত্রকর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ভাবিলেন,-

"কি অমূল্য মুহূর্ত্তটুকু পাইয়াছিলাম! সংসারের কোলাহলে, অতৃপ্ত জীবনের এই অশান্তির মাঝে, এমন শুভ মুহূর্ত্ত আর কি মিলিবে? অন্তরে কি রূপ-জ্যোতি দেখিলাম! আ মরি মরি! কি রূপ! সে রূপ কি এই প্রকৃতির? এমন সন্ধ্যার আকাশতলে, এমনই গঙ্গা-সৈকতে, কতবার প্রকৃতির এই মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াছি,—কৈ, আগে তো এমন সুখ অনুভব করি নাই!—হায় সুখ! কতদিন ধরিয়া, তোমার জন্য নানাস্থানে লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছি, কোথাও তো তোমার সন্ধান পাই নাই! আজি জীবনের এ শুভ মাহেন্দ্র-যোগে, বুঝি সেই চির বাঞ্ছিত বস্তুর অস্পষ্ট ছায়া পাইলাম!"

ভাবিতে ভাবিতে চিত্রকর আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিত্রাঙ্কন।

সেই দিন, সেই গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, চিত্রকর যখন চিন্তা-নিমগ্ন,—তখন তাঁহার সম্মুখে একটি কুসুম-কমনীয়া বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল। বালিকা, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ছিল। চাহিয়া চাহিয়া একবার আকাশ পানে চাহিল, তারপর তাহার প্রশান্ত আঁখি দুইটি চারিদিক ঘুরিয়া আবার চিত্রকরের মুখপ্রতি ন্যস্ত হইল।

চিত্রকর চক্ষু মেলিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন,—সৌন্দর্য্যের সীমারূপিনী, বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি—একটি বালিকা-মূর্ত্তি!

মুহূর্ত্তের জন্য চারিটি চক্ষুর মিলন হইল।

আমি বুঝাইতে পারিব না যে, সেই মুহূর্ত্তটুকুর মধ্যে, পরস্পরের সেই দেখা-দেখির ভিতর দিয়া কি হইয়া গেল! আমার মনে পড়ে, সেই অচ্ছোদ সরোবরে এমনই শুভমুহূর্ত্তে একদিন মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের শুভ সন্দর্শন ঘটিয়াছিল! এমনই একদিন পৃথিবীপতি দুষ্মন্তের চক্ষে, সেই আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার রূপরাশি প্রতিভাত হইয়াছিল। এমনই একদিন সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপমাঝে ফর্দিনন্দের সমক্ষে সেই প্রকৃতিপালিতা মিরন্দার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তগুলি আজ আমার মনে পড়িতেছে। আমি বুঝাইতে পারিব না,—এমন মুহূর্ত্তগুলি কি গভীর রহস্যপূর্ণ!

বলিতে পারি না, বালিকার সেই মুখখানিতে কি-একটুখানি অপূর্ব্ব মাধুরী মাখানো ছিল। তাহার সেই ডাগর আঁখি দুটিতে কি অপূর্ব্ব শোভা! সমস্ত অবয়বে কি সৌকুমার্য্য!

সেই সুনীল আকাশতলে, সেই পূর্ণতোয়া গঙ্গা-সৈকতে, সন্ধ্যার সেই আধ-ছায়া, আধ-আলোর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে, প্রকৃতির সেই অতি প্রীতিপ্রদ মুহূর্ত্তে, সেই চারিটি বিশাল আঁখি পরস্পরের প্রতি অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল।

মুহূর্ত্তের দেখা; কিন্তু সেই দেখা-দেখি হইতেই পরস্পরের হৃদয়ে যেন একটা আকর্ষণ হইল! কেহ কাহাকে চিনিত না,—আজি এই প্রথম দেখা, কিন্তু তবুও বহুদিনের পরিচিতের মত হৃদয় হৃদয়ান্তরকে আজি চিনিয়া লইল!

কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না। সেই সন্ধ্যার আকাশে, নক্ষত্রগুলি যেমন উদ্যানস্থিত স্ফুটনোন্মুখ যূথিকা-কুঁড়িগুলির প্রতি নীরবে চাহিয়া ছিল, এ দৃষ্টিও তেমনই নীরব।

বালিকার পিতা গঙ্গায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছিলেন। তাহা সম্পন্ন করিয়া তিনি কন্যাকে ডাকিলেন,—"মলিনা, এস মা, ঘরে যাই।"

বালিকা চকিতের ন্যায় ফিরিয়া চাহিল। আবার একবার সেই আঁখিযুগল আকাশপানে তাকাইল। তারপর—ধীরে ধীরে চিত্রকরের মুখ প্রতি,—কিন্তু নয়নে নয়ন মিলিয়াই, চিত্রকরের চরণ প্রতি,—তাহা বিন্যস্ত হইল। সে দৃষ্টি বড় করুণ।

পিতা ডাকিলেন, কন্যা চলিয়া গেল। চিত্রকর মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চিত্র-পটে একটিও রেখাপাত হয় নাই। কিন্তু হৃদয়-পটে,—সেই মাধুরী-মণ্ডিত সারল্যের আধার,—সেই নিষ্কলঙ্ক মুখখানি অঙ্কিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

সুরেশচন্দ্র মিত্র ভাগলপুর সহরের একজন পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব পরোপকারিতা, উদার স্বভাব ও বিদ্যানুরাগ,—সেই সহর মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বজন-পরিচিত করিয়াছিল। পরন্তু অর্থ-সঙ্গতি তাঁহার তেমন-কিছু ছিল না,—আয় সামান্যই ছিল; তাহাতেই কিন্তু সচ্ছন্দে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

একটি অনাথা বিধবার কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই ভার্য্যা, রূপেগুণে স্বামীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অনিন্দ্যসুন্দর সে রূপ! তার উপর ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মে মতি, স্বামীতে ঈশ্বরানুরূপ শ্রদ্ধা, অতিথি-অভ্যাগতে সেবা,—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী সে গৃহলক্ষ্মী! সুরেশচন্দ্র দেখিতেন, তাঁহার সংসার-উদ্যানে স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়াছে। সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার গৃহ আমোদিত।

সেই স্নেহময়ী পতিপ্রাণা,—বিংশতি বৎসর বয়সে, তাঁহার সোণার সংসার আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন। একটি মাত্র শিশু-কন্যা ছিল, তাহার বয়স তখন দুই বৎসর মাত্র। সেই শিশু-কন্যাটিকে স্বামীর ক্রোড়ে রাখিয়া, স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া, সতী সাধনোচিত পুণ্যলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দুঃখিনী জননী,—সুরেশচন্দ্রের গৃহে রহিলেন।

সুরেশচন্দ্র মাতৃহারা শিশুর নাম রাখিলেন,—মলিনা। মলিনা তখন হইতেই পিতার আদরের ধন। দিদিমার সহিত তাহার বড় একটা বেশী ভাব ছিল না। সকল সময়েই সে, পিতার কাছে কাছে

থাকিত,—কখন তাঁহার কাছ-ছাড়া হইত না। কেবল "রূপ-কথা" শুনিবার জন্য, রাত্রে দিদিমার নিকট শয়ন করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুরেশচন্দ্র বিদ্যানুরাগী; কন্যাটিকেও সযত্নে তিনি লেখা-পড়া শিখাইলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমে কন্যার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিতে লাগিল। মলিনা একটু সঙ্গীতও শিখিল।

সন্ধ্যাসমাগমে নিকটবর্ত্তী গঙ্গা-তটে সুরেশচন্দ্র যখন বেড়াইতে যাইতেন, মলিনা তাঁহার সঙ্গে যাইত। গঙ্গা-তটে বসিয়া, পিতা প্রকৃতির শোভা দেখিতেন; কন্যা পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, কুসুম-সুকুমার দেহখানি সৈকত-শয্যায় বিস্তৃত করিয়া, মধুরকণ্ঠে মধুর গীত গাহিয়া পিতার প্রাণ জুড়াইত। সেই সুমধুর কণ্ঠ,—মধুর জল-কল্লোলের সহিত মিশিয়া, মধুর হইতেও মধুরতর হইত। যে শুনিত, সেই-ই মুগ্ধ হইত; পিতা সেই গান শুনিয়া, স্নেহ-পরিপ্লুত হৃদয়ে কন্যার সেই নির্ম্মল মুখখানি চুম্বন করিতেন; আর সেই সময় তাঁহার নয়নপ্রান্তে জল আসিত।

মায়ের মত সেই অতুল রূপ,—সেই মুখ, সেই চোক, সেই গ্রীবা, সেই সব; সেই দীর্ঘ-আয়তন নিবিড় কেশরাশি, সেই বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর, সেই সব; মায়ের মত সেই স্নেহ—শ্রাবণের গঙ্গার মত পরিপূর্ণ,—অপরিমেয়, কূলপ্লাবী! পিতা দেখিতেন;—বালিকার ক্ষুদ্র বুকটুকু পূর্ণ করিয়া সেই স্নেহধারা প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইত। তখন সেই জলপূর্ণ চক্ষু দুইটি উপর পানে রাখিয়া মনে মনে তিনি কাহাকে কি জানাইতেন!

সতীশের পিতা অধিক কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা সুরেশ, অনেক দিন হইতে এই সম্বন্ধ চলিতেছে। শুনিয়াছি, সতীশও নাকি এই সম্বন্ধের কথা অনেককে বলিয়াছে। কিন্তু আজ যে হঠাৎ সতীশের পিতা দুই এক কথায় এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া গেলেন?"

সুরেশ। আমার সহিত অনেকবার এ কথা হইয়াছে। সে সকল আপনাকে বলি নাই। এখন আপনার ইচ্ছা কি? এ সম্বন্ধে আপনার বোধ হয় কোন আপত্তি নাই।

বৃদ্ধা। কোন আপত্তি নাই। এমন ঘরে ও বরে যে, আমার মলিনার বিবাহ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভগবান্ দুটিকে মনের সুখে রাখুন,—আমি নিয়তই এই প্রার্থনা করি।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সে অশ্রুপূর্ণ আঁখির মর্ম্ম সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন। অতীতের সেই সুখ-স্বপ্ন সহসা জাগিয়া উঠিল। স্বপ্ন!—সুরেশচন্দ্র তাহা স্বপ্ন বলিয়াই ভাবিতেন। তাঁহার হৃদয়কুঞ্জ আলো করিয়া, সংসার-উদ্যান সৌরভে মাতাইয়া, সেই যে পরিপূর্ণ শতদল তাঁহার গৃহ-সরোবরে ভাসিয়াছিল,—যাহা দেখিতে দেখিতে তিনি আত্মহারা হইতেন,—এ কুহক-দুরিতপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও স্বর্গের পবিত্রতা দেখিতেন,—তাহা আজ তাঁহার মনে পড়িল। অতীতের সেই চক্ষু লইয়া ভাবে বিভোর হইয়া তিনি দেখিলেন, এ পৃথিবী সুন্দর; চাঁদ সুন্দর, ফুল সুন্দর; চাঁদ ও ফুলের প্রতিবিম্ব লইয়া যে স্রোতস্বতী কুলুকুলু চলিয়াছে, তাহাও সুন্দর। তখন সেই সৌন্দর্যে মাঝে তিনি দেখিতে লাগিলেন, তিনিও সুন্দর! ভাবিতে ভাবিতে

সকল সৌন্দর্য্যের সার,—সেই অপূর্ব্ব সুন্দর,—বাক্য ও মনের অতীত,—সেই পরম সুন্দরকে তখন চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিল,—বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কি অপূর্ব্ব সে যোগ!—হায়! একজনের সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়-মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে,—হৃদয়ের দেবতা তবুও আজি সে ভাঙ্গা-মন্দিরে বিরাজমান! তাই সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, "সে সুখ-স্বপ্ন, রবিকরস্পর্শে নিহার-কণিকার মত সহসা অন্তর্হিত হইল! কেবল পোড়াইবার জন্যই তাহার ছায়া আজিও বর্ত্তমান! সে মূর্ত্তি,—সেই স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, আনন্দময়ী সে মূর্ত্তি,—হায়, কি পাপে, কার অভিশাপে, এত শীঘ্র আমি হারাইলাম?"

গভীর সমুদ্রের ন্যায় সে হৃদয়। অন্তরের অন্তরে কি ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গ,—তাহা কে জানিবে! কিন্তু বাহিরে তাহার একটুও উচ্ছ্বাস নাই। আজ কিন্তু সংযমীর সে সংযমতা তিরোহিত হইল। বৃদ্ধা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর সেই অশ্রুপূর্ণ আঁখি দেখিয়া, তাঁহার আর দুইটি আঁখির কথা আজ মনে পড়িল। হায়, জীবনের বিনিময়েও কি সেই আঁখি দু'টি আর একবার মিলে না? বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেমন জলপ্রবাহ চলিয়া যায়, তেমনই সেই রুদ্ধ শোকাবেগ আজ দুর্ভাগা সুরেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

মলিনা অন্তরালে থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিল। পার্শ্বে বসিয়া, অন্য কথা পাড়িয়া, সে পিতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য,—মলিনার চক্ষে একবিন্দুও জল নাই!

বালিকা এখন শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতে বসিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাল্য-প্রণয়।

সতীশচন্দ্র,—মলিনার শৈশবের সহচর। বয়সের কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে বড় ভাব ও ভালবাসা ছিল। সতীশ—রূপবান্, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ যুবক। অধিকন্তু তিনি ধনীর সন্তান।

শৈশবে দুটিতে বেশ প্রণয় ছিল। কেহ কাহারও মুহূর্ত্তের বিরহ ভাল বাসিত না। উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া ভাবিত,—এমন সুন্দর আর কিছুই নাই! খেলাঘরের ধূলা-খেলা ছাড়িয়া, উভয়ে এক একবার নির্নিমেষনয়নে পরস্পরের পানে চাহিয়া থাকিত। উভয়ে নীরবে উভয়ের প্রতি তেমন আত্ম-বিস্মৃত ভাবে চাহিয়া কি দেখিত, কি বুঝিত,—তাহা কেবল তাহারাই জানিত। দুই জনে কে কাহাকে বেশী ভালবাসে, তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিত। মলিনা বলিত, "আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তেমন ভালবাস না।" সতীশ উত্তর দিত,—"আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তাহার সিকিও তুমি ভালবাসিতে জানো না।"

মলিনা। তাহা হইতে পারে। তোমার মত অত কথা আমি জানি না। তাহা হইলে বুঝাইতে পারিতাম, আমি তোমায় কত ভালবাসি।

সতীশ। আমি যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণ তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু আমি সর্ব্বক্ষণ তোমায় ভালবাসি। তোমার ঐ নির্ম্মল মুখমণ্ডলে যে কি অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাই,

তাহা বলিতে পারি না। মাষ্টার পড়াইতে আসেন, তোমায় কাছে দেখিতে পাই না, কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে যাই; পড়িতে পারি না, তোমার মুখ মনে পড়ে! স্কুলে যাই, তোমায় তো দেখিতে পাই না,—অমনি বুকের ভিতর কেমন করিতে থাকে! কখন ছুটী হইবে,—কখন তোমাকে দেখিব, কেবল তাহাই ভাবি। ছুটী হইলেই আগে তোমাকে দেখিয়া, তবে ঘরে যাই! তুমি কি আমায় এত ভালবাস?

মলিনা গুছাইয়া সব কথা বলিতে পারিত না, কাজেই হারি মানিত। বুঝাইতে পারিত না যে, সতীশের মূর্ত্তি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ভরিয়া আছে। বুঝাইতে পারিত না যে, সে ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—আত্মগোপন। এই আত্মগোপনের জন্য, রমণী নিত্য যাহাকে গৃহদেবতার ন্যায় হৃদয়-আসনে বসাইয়া মনে মনে পূজা করে, বুক ফাটিলেও, মুখে তাহার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে না,—ব্যক্ত করিতে জানে না। মনে মনে পূজা করিয়াই সে সুখী। তুমি বুঝিতে পারো আর নাই পারো, সে তাহা দেখিবে না;—সে ভাল বাসিয়াই সুখী। রমণী ব্যতীত এমন ভালবাসা আর কে বাসিতে পারে?

সতীশ ও মলিনার প্রায়ই এইরূপ কথাবার্ত্তা হইত। সতীশ নানা কথা বলিয়া, আপনার ভালবাসা বুঝাইত; বালিকা মলিনা নীরবে তাহা শুনিত। এত ভালবাসা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কলহ ছিল, অশ্রুপাতও ছিল। কিন্তু সে কলহ,—প্রণয়ের অভিমান; সে অশ্রুপাত,—মিলনের আকাঙ্ক্ষামাত্র!

সতীশ বনফুল তুলিয়া মলিনাকে বনদেবী সাজাইত; মলিনা মধুরকণ্ঠে মধুর-গীত গাহিয়া, সতীশকে মুগ্ধ করিত। সে গীত

কেমন? কোকিল যেমন ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উচ্চে—আরও উচ্চে—আরও উচ্চে তান ধরিয়া, মধুর শব্দ-তরঙ্গে আকাশ প্লাবিত করে, বালিকাও তেমনি সেই কোমলকণ্ঠ ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া, অতি উচ্চে তুলিত;—যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিতে থাকিত! আর সেই সুকুমার দেহখানিও সেই তরঙ্গ-ভঙ্গে হেলিত, দুলিত, কাঁপিত। সতীশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সে শোভা দেখিত।

বালক বালিকার প্রণয় এইরূপ ছিল। বাল্য-প্রণয়ে এতই সরলতা এবং সারল্যে এতই পবিত্রতা বিদ্যমান।

কিন্তু এ অবস্থা অতিক্রম করিয়া, জীবনের পথে আর একটুকু অগ্রসর হইলে, বাল্যের সে মোহন-ছবি আর বড় দেখিতে পাই না। বাল্যে যাহাকে অতীব সুন্দর দেখিয়াছি; কৈশোরে যাহার সৌন্দর্য্যে নৈর্ম্মল্য দেখিয়া, যাহাকে জীবনের চির-সহচর করিতে ইচ্ছা করিয়াছি,—এখন তো কৈ, তাহাকে আর পাই না! হয়ত তাহার অভাবে এ জীবন মরুভূমি হইয়াছে;—আশা—উৎসাহ—আকাঙ্ক্ষা,—হয় তো সকলই উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে;—তথাপি এ কাতর প্রাণের আকুল-আহ্বানের একটুও ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তো মিলে না!

তাই বলিতেছিলাম, বাল্য-প্রণয় বড় মধুর,—স্বর্গাধিক মধুর বটে,—কিন্তু ইহাতে বড় বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে নাই!

সতীশ বড় হইলে, সেই শৈশব-সঙ্গিনী মলিনাকে ভুলিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রাণে তেমন একটা বিশেষ ভাব কিছুই রহিল না। মাঝে মাঝে সতীশের মনে পড়িত,—মলিনা সুন্দরী, এবং মলিনার মুখখানিও নির্ম্মল বটে। এই পর্য্যন্ত।

পক্ষান্তরে, মলিনাও সতীশকে খুব ভাল বাসিত, আজিও বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা আর নাই। যে ভালবাসা, চিরদিনের জন্য উভয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষা করে, এ সে ভালবাসা নহে। এ দুঃখপূর্ণ সংসার মাঝে, যে ভালবাসা, ধন্বন্তরীর সুধাভাণ্ডের ন্যায় অমৃত-সিঞ্চনে প্রাণ শীতল করে, এ সে ভালবাসা নহে;— এ ভালবাসা, সংসারে যেমন পাঁচজন পাঁচজনকে ভাল বাসে, সেইরূপ।

সতীশের সহিত যে বিবাহের কথা হইতেছে, মলিনা তাহা শুনিল। শুনিয়া তাহার মনে বিশেষ কিছু একটা ভাবোদ্রেক হইল না, তবে একটু ভাবনা হইল। সে ভাবনাটুকু কি?

সেই গঙ্গা-সৈকতে, সৌম্য-সন্ধ্যায়, সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি,— বালিকার আঁখি দুইটির মাঝে নিয়তই তাহা জাগিতেছে। মলিনা মনে মনে বলিল, "সেই গঙ্গা-সৈকতে, সে দেবতার চরণে এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি তিনি দাসী বলিয়া চরণে স্থান দেন, তবে তাঁহারই,—নহিলে আমি আর কাহারও হইব না!"

বালিকা-হৃদয়ের রহস্য বুঝাইতে পারিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখ।

প্রফুল্লকুমার গৃহত্যাগী হইয়া, নানা তীর্থ, নানা দেশ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু যাহার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ফিরিলেন, তাহা মিলিল না। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, বড় আদরের, বড় স্নেহের ধন।—ধনপূর্ণ ভাণ্ডার, স্নেহময়ী

জননীর অযাচিত স্নেহ,—কিছুই তাঁহার মন বাঁধিতে পারিল না। অকলঙ্ক চরিত্র, বিমল যশঃ, অসাধারণ বিদ্যা, কমনীয় রূপ,—কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না;—সেই চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে সে সকলেরই তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল থাকিলেও, প্রাণের ভিতর অনুক্ষণ তিনি একটা মহা অভাব অনুভব করিতেন।—"সুখ কৈ? প্রাণ তো কিছুতেই তৃপ্ত হয় না! যাহা করি, সকলই ক্ষণিক সুখ দিতে সমর্থ, কিন্তু সে স্থায়ী সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? প্রাণের ভিতর কেমন এক হাহাকার, অশান্তি ও অভাব! কোথায় যাইলে এ জ্বালা জুড়াইবে?" শাস্ত্রাভ্যাসে রত হইলেন, ভালো লাগিল না; দর্শনবিজ্ঞানে মনঃসংযোগ হইল না; অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হইল না;—তবে কৈ, সে সুখ কোথায়?

গৃহ তাঁহার ভালো লাগিল না। গগনবিহারী পক্ষী, যেমন আকাশমার্গে উড়িতে উড়িতে মধুর সঙ্গীতে নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন উপবন প্লাবিত করিয়া আকাশ পরিপূর্ণ করে, তাঁহার সাধ,—"তেমনি করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই! নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন রাজ্য, নূতন নিয়ম, সবই নূতন দেখিয়া বেড়াই; সেই নূতনত্বের মধ্যে ডুবিয়া দেখি,—যদি কিছু শান্তি পাই! তখন সেই শান্তিপূর্ণ প্রাণে শান্তির গান গায়িয়া বেড়াইব। সুখ কি মিলিবে না? যদি প্রেমেই সুখ থাকে, তবে সে প্রেম কি মিলিবে না? হৃদয়ে মাতার স্থান, তাহার মূলে—ভক্তি; বন্ধু-বান্ধবের স্থান স্বতন্ত্র, তাহার মূলে—স্নেহ; দীনদুঃখীর স্থানও স্বতন্ত্র, তাহার মূলে—দয়া; কিন্তু সেই ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে যে প্রেম,—যাহা পাইলেই বাঞ্ছিত সুখ মিলে,

তাহা কোথায়? সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায়, যে প্রেম অবিচলিত, অবিকৃত, অপরাজিত,—কৈ সে প্রেম? ভগবানে আত্মসমর্পণ কি সেই প্রেম? কিন্তু চিত্ত চঞ্চল,—এ আসনে তাঁহাকে বসাইতে পারি না। তবে সুখ কি মিলিবে না?"

প্রফুল্লকুমার গৃহ ত্যাগ করিলেন। স্নেহময়ী জননী ও আত্মীয় স্বজন বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, "বিবাহ করা হইবে না; হৃদয়ের এই অবস্থা,—কে জানে বিবাহে আরও কি হইবে। সে পরীক্ষার মাঝে পড়িতে চাহি না। এ প্রাণ সুখ-শান্তি হীন;—ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রেমে ইহা শান্ত হইবে না। সেই মহাপ্রেম চাই। আমার এ বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা,—বালিকার ক্ষুদ্র প্রেমে পরিতৃপ্ত হইবার নহে!"

গৃহত্যাগ করিয়া প্রফুল্লকুমার অনেক দেশ ঘুরিবেন, কিন্তু কৈ, বাঞ্ছিত সুখ তো মিলিল না। অতৃপ্তির মাঝে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

তখন একদিন নির্জ্জন এক পার্ব্বত্য প্রদেশে বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অদূরে নির্ঝরিণী মধুর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, মাথার উপর পক্ষীগণ সঙ্গীত-সুধা ঢালিয়া দিতেছে, চারিদিকে অরণ্যানীর স্নিগ্ধ শ্যাম-শোভা বিরাজ করিতেছে। নির্ম্মল ঊষা;—বাল-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ এখনও তরুশির রঞ্জিত করে নাই।

প্রফুল্লকুমার নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন; জননী জন্মভূমি, পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব,—তাহারা কোথায়, আর তিনিই বা কোথায়? যাহাদিগকে পরিত্যাগ

রিয়া সুদূর প্রবাসে তিনি দিনের পর দিন অতি কষ্টে কাটাই-
তেছেন,—সংসারে সেই সব ব্যক্তির ভাগ্যে কি সুখ মিলে নাই?
তাহাদের জীবন কি এমনি হাহাকার পূর্ণ? না, তাহা নহে;
তাহারা তো আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া জীবন
কাটাইতেছে;—তবে তিনি এমন হইলেন কেন? বুঝি বিধাতা
তাহার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই;—নহিলে তাঁহার এ দশা কেন?

দশা কি? তাহাই ভাবনার বিষয়। সব আছে, তবু অন্তরে
অভাব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সম্মান, খ্যাতি,—সকলই আছে, কিন্তু
প্রাণ তবু কাঁদে। কেন কাঁদে, কিসের জন্য কাঁদে, কে বুঝিবে!
কিন্তু তবু মনে হয়, কি যেন হইল না, পৃথিবী যেন বুকের ভিতর
করিয়া কি লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে দিল না! তাই
এমন অশান্তি,—সংসারের সম্পদের মাঝেও তাই এমন হাহাকার!

প্রফুল্লকুমার যখন এইরূপ চিন্তা-নিমগ্ন, তখন কে একজন
আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রফুল্ল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিলেন। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—

"যুবক, কালি তোমাকে এত বুঝাইলাম, তবু এখনও ইতস্ততঃ
করিতেছ? আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা নূতন কিছুই নহে,—
পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রীতিই সংসারের সুখ। সুখ আত্ম-
প্রতিষ্ঠায় নাই,—আত্ম-বিসর্জ্জনে। যে ভাবে বিভোর হইয়া
আমরা পরের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করি, তাহাই প্রীতি। প্রীতিই
আত্ম-বিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়। প্রীতিই ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।
কেন না, সর্ব্ব-জীবে প্রীতি ভিন্ন, মনুষ্য ঈশ্বরলাভ করিতে পারে
না। এই প্রীতির শিক্ষাস্থল—আপনার গৃহ। ক্ষুদ্র গৃহ হইতে
আরম্ভ করিলে, ধীরে ধীরে অনন্ত জগৎ লক্ষ্যস্থল হয়। তাই

ধার্ম্মিকের পক্ষে, সুখের প্রত্যাশায় গৃহ-পরিত্যাগ ঠিক নহে;—বরং তাহাতে অধর্ম্ম ও পাপ আছে। সংসারে থাকিয়াই সুখের অনুসন্ধান করিতে হইবে। পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনাকে উৎসর্গ করিতে না পারিলে এবং পরকে আপনার জ্ঞান করিয়া পরের সুখ দুঃখ আপনার সুখদুঃখে মিশাইতে না পারিলে, সুখ সম্পূর্ণ হয় না; এবং যে ধর্ম্ম-পালন হইতে চিত্ত শান্ত হয়, তাহাও লাভ হয় না। তুমি কাহার জন্য কি করিয়াছ? কয়জনের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? কয়জনের সুখে তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছ? বৃথায় এ দেশ পর্য্যটন,—বৃথায় এ হাহাকার! গৃহে যাও, দার-পরিগ্রহ করো, তাহাতেই প্রীতি লাভ করিবে। সেই প্রীতি স্বর্গ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া তোমাকে অক্ষয় অনন্তসুখ প্রদান করিবে; তোমার চিত্ত শান্ত হইবে। চিত্ত শান্ত না হইলে, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও ভাগ্যে সুখ মিলে না।"

প্রফুল্ল নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। তখন প্রভাত কাল, প্রভাতের রবি-কিরণে অরণ্যানী উদ্ভাসিত। পক্ষি-কূজনে চারিদিক উল্লসিত। নির্ঝরিণীর চূর্ণ-জলকণায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত।

তেমন প্রীতিপ্রদ সময়ে, চিত্তের সেই বিক্ষিপ্ত অবস্থায়, এই এই অমৃতময়ী উক্তিগুলি প্রফুল্লের বড়ই মধুর লাগিতেছিল। তাঁহার অন্তরে অন্তরে কথাগুলি মিশিতেছিল। অন্তরের অন্তরে প্রতিধ্বনি হইতেছিল—'প্রীতিই সংসারের সুখ!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিত্রকর।

প্রফুল্লকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার প্রণাম করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ইহাঁরই আদেশ পালন করিব। এত নে বুঝিলাম,—মিথ্যা এ পর্য্যটন! সুখ আমার অন্তরেই বটে। য়, কেন দেখিলাম না,—কেন বুঝিলাম না? অন্তর সুখহীন না বে কেন? আমি যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই সুখের ভিখারী;— রের মঙ্গল-মন্দিরে আত্ম-বিসর্জ্জন তো কখন করি নাই;—আমার গ্যে সুখ মিলিবে কেন? সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নাই, আত্ম-সর্জ্জনে,—এতদিন এই কথা বুঝি নাই। তবে হায়, এতদিন কি খিলাম? বৃথায় বিদ্যার অভিমান করি। কতকগুলা গ্রন্থ ধ্যয়নেই শিক্ষা হয় না। আমার সুখের আকাঙ্ক্ষা-মূলে যে আত্ম-তিষ্ঠা বিরাজিত;--আমার ভাগ্যে সুখ মিলিবে কেন? দুঃখিনী ননীর সেই অশ্রু,—এখনও মনে পড়িতেছে! বন্ধুবান্ধবের সেই তরতা,—হায়! কেন সে সকল উপেক্ষা করিলাম?"

গৃহত্যাগী প্রফুল্লকুমার আবার গৃহে ফিরিলেন। যে চক্ষু ংসারের কোথাও সুখের সামগ্রী দেখে নাই, সেই চক্ষুই আজ যেন রিদিকে সেই সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে দেখিতে লাগিল। দেখিল, ংসারের সর্ব্বত্র প্রীতি বিরাজ করিতেছে,—সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে;—কে বলে সংসারে সুখ নাই?

যুবক যে দিন আপনার ভ্রম বুঝিলেন, সেই দিন হইতেই নের গতি ফিরাইলেন। তখন আবার এই সুখ-[illegible]-হীন ংসারে, তিনি অনেক সুখের সামগ্রী দেখিতে পাইলেন। যিনি

বলিয়াছিলেন, সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নাই,—আত্ম-বিসর্জ্জনে; তিনি সুখ দুঃখের অপূর্ব্ব রহস্য সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু দার-পরিগ্রহেই কি চিত্ত শান্ত হইবে?—প্রফুল্ল এখন সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখী হইলেন। ভাগলপুরে তাঁহার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন, একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া প্রফুল্ল ভাগলপুরে উপস্থিত হইলেন।

বন্ধুর অনুরোধে প্রফুল্লকে কিছুদিন ভাগলপুরে থাকিতে হইয়াছিল। প্রথম দিন নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিন, প্রফুল্ল একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। চিত্ত শান্ত করিবার জন্য তিনি চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। দিবা-বসানে গঙ্গার সেই মনোহারিণী শোভা দেখিয়া, সেই মধুর দৃশ্য চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে বসিলেন।

সেই গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, তাঁহার যে চিত্রাঙ্কন হইল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রফুল্লকুমার,—সেই চিত্রকর।

নবম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-হারা।

প্রফুল্লকুমার গঙ্গা-সৈকতে সেই বালিকা-মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন। কাহার কি মত, জানি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস, এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন জীবনের ছিন্ন-গ্রন্থি-গুলা সব এক হইয়া বাজিয়া উঠে। সহস্র ব্যাপারে নিযুক্ত রাখিয়া যে মন বাঁধিতে পারি নাই, মুহূর্ত্তের গুণে, একটি অতি সামান্য ব্যাপারেও, সেই মন আপনি আকৃষ্ট হয়।

প্রফুল্লকুমার ভাবিলেন, "এই বালিকা কে,—কেন আসিয়াছিল,—কিছুই জানি না। ইহাকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এমন পুণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিব বলিয়াই কি আজ হৃদয় এমন প্রফুল্ল ছিল? এমন রূপ চক্ষে দেখিব বলিয়াই কি অন্তরে তেমন রূপ-জ্যোতি প্রত্যক্ষ করিলাম? সেই মুখ, সেই আঁখি, সেই দৃষ্টি,—আর একবার কি দেখিতে পাই না? যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলাম,—একটি কথাও কহিতে পারিলাম না! ভগবান কি এতদিনে এ অধমকে দয়া করিয়া, অন্তরের অভাব ঘুচাইবার এই পথ দেখাইয়া দিলেন?"

রহস্য এই যে, কেহ কাহাকে চিনিল না,—জানিল না;—মাঝখান হইতে উভয়ে উভয়ের আকর্ষণে বাঁধা পড়িল।

প্রফুল্ল, বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন। বন্ধুর নাম সুধীরকুমার।

সুধীর বলিলেন, "প্রফুল্ল, এই ভাবে যে তোমার মন ফিরিল, ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। কিন্তু ভাই, এ যে বিষম সমস্যায় ফেলিলে! গঙ্গা-সৈকতে কাহার কন্যাকে দেখিয়া আসিলে? তাহারা কোন্ জাতি, কোথায় বাস,—কিছুই জানো না, অথচ সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা বালিকাকে দেখিয়া কি একেবারে চিত্ত-সমর্পণ করিতে হয়?"

প্রফুল্ল। তুমি উপহাস করিবে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমার বোধ হয় না যে, সে বালিকা কোন নীচবংশে জন্মিয়াছে। আমি জ্ঞাতসারে তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করি নাই। আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার মনের ভিতর কি গোলমাল হইয়া গেল! আমার মনে হয়, সেই যে প্রেমপ্রতিমা দেখিয়া

এ নয়ন সার্থক করিয়াছি, তাহা হইতেই আমি সুখী হইব। তুমি ভাবিও না। সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমি আমার অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছি,—সে আমার।

সুধীর মনে মনে হাসিলেন। বুঝিলেন, যদি বা একপ্রকার রোগের উপশম হইল, আবার এক নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু রোগ যখন আপনি ধরা দিয়াছে, তখন বিশেষ ভাবনা নাই।

আর অধিক কিছু কথা হইল না। সুধীর কেবলমাত্র বলিলেন,—"সে বালিকা কে, কাহার কন্যা, সমস্তই আমি সংবাদ লইব।" মনে মনে ভাবিলেন,—"প্রফুল্ল যেরূপ বলিতেছে, বালিকাটি কি তবে সুরেশ বাবুর কন্যা মলিনা? মলিনাই তো প্রায় গঙ্গাতটে পিতার সহিত বেড়াইতে আইসে। তাহাই কি হইবে? যদি তাহাই হয়, সকল দিকে মঙ্গল হয়। সুরেশ বাবু সৎকুলীন, কায়স্থ-সমাজে সুপরিচিত; প্রফুল্লও একজন ঘরণাঘরের ছেলে;—দত্তবংশ খুব বিশিষ্ট ও বনিয়াদী ঘর। রূপে, গুণে, ধনে, মানে প্রফুল্লকুমারই,—মিত্রজ মহাশয়ের জামাতা হইবার যোগ্য। কিন্তু শুনিয়াছি, সুরেশ বাবুর কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে;—তাহা হইলে কি হইবে? আর প্রফুল্লের মনোনীতা বালিকা যদি অন্য কাহারও কন্যা হয়, তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

সুধীর মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন। আর প্রফুল্ল ভাবিতেছেন,—"আর একবার কি দেখিতে পাই না?" পরক্ষণেই আবার ভাবিতেছেন,—"জীবনের এই চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে, আজি একটি ক্ষুদ্র বালিকার জন্য এমন ভাব কেন হইল? মানুষ বড়ই পরমুখাপেক্ষী,—বড়ই আত্মনির্ভর শূন্য!"

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা।

সতীশচন্দ্রের সহিত মলিনার বিবাহ এক প্রকার স্থির। মলিনা আর বাটীর বাহির হইতে পায় না।

সকলেই বুঝিয়াছিল যে, এই বিবাহে বর কন্যা উভয়েই সুখী হইবে। কিন্তু বিবাহ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে মলিনার অবস্থা অতি শোচনীয় হইতে লাগিল। সেই গঙ্গা-সৈকতে, সেই যে দেব-মূর্ত্তি দেখিয়াছিল,—বালিকা তাহা ভুলিতে পারিল না। মাতৃহীনা শিশুর যে মলিন মুখখানি দেখিয়া পিতা নামকরণ করিয়াছিলেন— মলিনা, মলিনার সেই মুখখানি দিন দিন আরও মলিন হইতে লাগিল। শ্রাবণের আকাশের মত, সে মুখখানি নিয়তই মেঘাচ্ছন্ন থাকিত। ডাগর আঁখি দুটি সতত জলপূর্ণ থাকিত। অধরের সে হাসি,—নির্ম্মল, শুভ্র শারদ-কৌমুদীবৎ, স্ফুটনোন্মুখ মল্লিকা-কুসুমতুল্য সেই যে হাসি,—তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সঙ্গিনীরা আসিয়া বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া আমোদ করিত, কিন্তু মলিনার মলিন চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকিত। সঙ্গিনারা তাহা বড় একটা লক্ষ্য করিত না। সুরেশচন্দ্রও বিশেষ কিছু বুঝিলেন না।

সুধীরের সহিত সুরেশচন্দ্রের বিশেষ জানা শুনা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রতিবাসী, উভয়ে উভয়ের গুণে বাধ্য। সুধীর অনুসন্ধানে জানিলেন, যে বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার বন্ধু আত্মহারা হইয়াছেন, সে বালিকা সুরেশচন্দ্রের কন্যা মলিনা। কিন্তু তাঁহার এই অনুসন্ধান ঠিক কি না, তাহা জানিবার জন্য, একদিন তিনি প্রফুল্লকে লইয়া সুরেশচন্দ্রের বাটীর দিকে বেড়াইতে আসিলেন।

তখন নির্ম্মল প্রভাতকাল। সুরেশচন্দ্রের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী শোভিত। লতিকা ফুলভরে অবনতা;—বৃক্ষের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, বৃক্ষের শাখা প্রশাখা নানা ফুলে সাজাইয়া দিয়াছে। ঘুমন্ত কুসুম-কলিকার উপর শিশির পড়িয়াছে, রবিকিরণ এখনও তাহা মধুর-চুম্বনে জাগাইয়া তুলে নাই,—মৃদুল বায়ু মৃদু হিল্লোলে ব্রততীগুলি ঈষৎ কাঁপাইতেছে। সেই মধুর-বিকম্পনে মধুর শোভা হইয়াছে। মধুমক্ষিকা স্থানচ্যুত হইয়া আকুলপ্রাণে ফুলের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেফালিকা-শাখে বসিয়া, সেই মধুর-বিকম্পনের তালে তাল রাখিয়া, সুরে সুর মিলাইয়া, পাখী গায়িতেছে। সেই পরম প্রীতিপ্রদ সময়ে, প্রেম-প্রতিমা মলিনা,—প্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষব্রততীর মাঝে দাঁড়াইয়া আছে মাধবী-শাখা, বায়ু বিকম্পিত হইয়া, মলিনার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছে; ফুটন্ত গোলাপ, মলিনার সীমন্তে উঠিয়াছে। সেই ফুলের মাঝে, ফুল্লনলিনী সে প্রেম-প্রতিমাখানি কি মনোহারিণী!

মলিনা, প্রভাতে বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া, তাহার সযত্ন-রোপিত বৃক্ষলতাগুলি প্রতিদিন দেখিয়া যাইত।

সেই দিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে, দূর হইতে প্রফুল্ল ও সুধীর,—সেই দৃশ্য দেখিলেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, সেই ক্ষুদ্র কুঞ্জমাঝে কে একখানি প্রতিমা স্থাপিত করিয়াছে। বসনাঞ্চল ভূমে লুটাইতেছে, উন্মুক্ত কেশরাশি চরণ চুম্বন করিয়াছে, বিশাল আঁখি-দুটি স্থিরভাবে কি নিরীক্ষণ করিতেছে। মুখখানি মলিন, কিন্তু সে মালিন্যে সৌন্দর্য্য আরও বিকশিত। বন্ধুদ্বয় আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, প্রতিমা সজীব,—বিধাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সীমারূপিণী একটী বালিকামূর্ত্তি!

সুধীর চিনিলেন। প্রফুল্লও চিনিলেন।—যে ধ্রুবতারা তাঁহার আঁখি-মাঝে জাগিতেছে, এই—সেই!

"বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি! হায়, এ আঁখির আবার পলক হইল কেন?"—প্রফুল্ল মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

সহসা আবার চারিটি চক্ষুর মিলন হইল। মলিনা, অঞ্চল গুটাইয়া, ভূমিপানে চাহিয়া, ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিল।

সুধীর ও প্রফুল্ল গৃহে ফিরিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়-পরিণাম।

সুধীর সকলই বুঝিলেন। কিন্তু মলিনার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এজন্য কিছু চিন্তিত হইলেন।

সেইদিন প্রভাতে সংবাদ আসিল,—"প্রফুল্লকুমারের জননী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা; এখনি তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হইবে।" প্রফুল্ল আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

বহুদিনের পর পুত্রহারা জননী, সন্তানকে কাছে পাইয়া, রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু এবার আর পুত্রকে বাটীর বাহির হইতে দিলেন না।

যেদিন প্রভাতে, সেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, মলিনা দেখিল, তাহার আরাধ্য-দেবতা তাহারই সম্মুখে;—সেইদিন বালিকার ক্ষুদ্র

বুকটুকুর ভিতর হর্ষ-বিষাদের এক তুমুল ঝটিকা উঠিল। মলিনা সুধীরকে বিশেষরূপ চিনিত, তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। সুধীর কতদিন সুরেশচন্দ্রের নিকট কত বিষয়ে পরামর্শ লইয়াছে, কতবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছে। বালিকা ভাবিল,—"সুধীর দাদা কি তবে উহাঁকে চিনেন?—চিনিলেই বা আমি কিরূপে সকল কথা জ্ঞাত হইব? কেনই বা তিনি আসিয়াছিলেন? আমার মনের ভাব কি তবে তিনি বুঝিয়াছেন? বুঝিলেই কি আমার আশা মিটিবে?"

এইরূপ হর্ষ-বিষাদে বালিকার সেই দিন অত্যন্ত জ্বর আসিল। বালিকা বয়সে কি এত ভাবিতে আছে? দুই চারি দিনের মধ্যে পীড়া বৃদ্ধি পাইল। সুরেশচন্দ্র ভীত হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে বিকার দেখা দিল। চিকিৎসকও ভীত হইলেন। মলিনা কখন কাঁদে, কখন হাসে; কত কি প্রলাপ বকিতে থাকে। সুরেশচন্দ্রকে সকলেই ভালবাসিত, এই বিপদের দিনে সকলেই তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিল।

প্রলাপ অবস্থায়, মলিনার মনের কথা প্রকাশ পাইল। সেই গঙ্গা-সৈকতে, সৌম্য-সন্ধ্যায়, সেই ধ্যান-নিমীলিত-নেত্র দেবমূর্ত্তি;—আর একদিন সেই নির্ম্মল ঊষায়, পথিপার্শ্বে সুধীরকুমারের সহিত সেই আরাধ্য-দেবতা!—সকল কথাই প্রকাশ পাইল।

সুরেশচন্দ্র তখন সব বুঝিলেন। বুঝিলেন, এইজন্যই মলিনা দিন দিন এমন রুগ্না হইয়া যাইতেছিল। সুধীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বুঝিলেন, একই শরে দুইটি বিহঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছে।

অনেক দিনের পর সুচিকিৎসা-গুণে মলিনা আরোগ্যলাভ

করিল। আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের সে শ্রী আর ফিরিল না। তেমন যে তপ্তকাঞ্চন রূপ,—সে রূপ নিবিয়া গিয়াছে; তেমন যে ফুল্লাধর—তাহা আভাহীন; তেমন যে কমল-আঁখি—তাহা কোটরগত; তেমন যে সুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব—তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অস্থিগুলি যেন কেবলমাত্র চর্ম্মে আবৃত; দেহ শোণিত-শূন্য। তেমন যে বর্ষার নিবিড় মেঘের মত সেই সুদীর্ঘ কেশরাজি,—অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত,—অল্প অঙ্গসঞ্চালনে সেই যে কুন্তলগুচ্ছ সর্পশিশুর ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া সেই রক্তাভ চিবুক স্পর্শ করিত,—সে সকলই শ্রীহীন। সে শ্রীহীনা মূর্ত্তি দেখিয়া, মলিনাকে কষ্টে চিনিতে হয়।

তখনও মাঝে মাঝে কেহ মলিনাকে দেখিতে আসিত, কেহ সংবাদ লইত। সতীশের সহিত বিবাহের কথা স্থির হওয়া পর্য্যন্ত, সতীশ আসিত না। একদিন কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিয়া আসিল। আসিবার কারণ ছিল।

সতীশ অন্য এক বালিকাকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছিল। সতীশের পিতার সেখানে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সতীশ ইদানীং কিছু বিদ্যাভিমানী হইয়াছিল, কাহাকেও বড় গ্রাহ্য করিত না। সতীশ ভাবিল,—"তুলনা করিয়া দেখিব, যদি আমার নির্ব্বাচিতা পাত্রী অপেক্ষা মলিনা সুন্দরী হয়, তবে পিতার কথানু-যায়ী মলিনাকেই বিবাহ করিব,—নহিলে নহে।" সেইজন্য মলি-নাকে দেখিতে আসিল।

সুরেশচন্দ্র কোন আপত্তি করিলেন না। সুধীরের কথা যথার্থ হইলেও, এখনও তিনি কিছুই ঠিক করেন নাই যে, সতীশকে কিংবা প্রফুল্লকে কন্যা দান করিবেন।

তিনি ভাবী-জামাতা সতীশকে বিশেষ আদর-যত্ন করিলেন। এদিকে কিন্তু গৃহমধ্যে মলিনার সেই শ্রীহীনা মূর্ত্তি দেখিয়া, নব্যযুবক সতীশচন্দ্র ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।

সতীশের হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই তাহার ভাবী-পত্নী? দুই মাস পরে ইহারই সহিত তাহার বিবাহ হইবে? এঁ্যা, এই রূপ? এই মূর্ত্তি? এই গঠন?

পিতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে, গুণধর পুত্র গৃহে গিয়া মাতার নিকট আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মাতা বলিলেন,—"না বাবা! তবে ও পাড়া-বেড়ানি মেয়ের সহিত তোমার বিবাহ দিব না।"

যথাসময়ে সুরেশচন্দ্র একথা শুনিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন,—সতীশ অন্যত্র বিবাহ করিতে চাহে, এইজন্যই তাহার পিতা তাড়াতাড়ি আমার মলিনার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে আসিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র মনকে প্রবোধ দিলেন,—"বিষম রোগে ভুগিয়া মলিনা এমন দেখিতে হইয়াছে,—আবার মায়ের আমার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া আসিবে।—রোগে কে না হতশ্রী হয়?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রূপ।

বুঝা গেল, সতীশের সহিত মলিনার বিবাহ হইবে না কিন্তু তারপর? যে কারণে এ বিবাহ হইল না, প্রফুল্লও তো সেই কারণে এ বিবাহ না করিতে পারে। সুরেশচন্দ্র এখন তাহাই ভাবিতে বসিলেন।

সুধীরও বিশেষ ভরসা দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "প্রফুল্ল ধনীর সন্তান, তার উপর রূপবান্, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র। সুখের ভিখারী হইয়া যে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে, সে যে মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে, তাহার মূলে রূপমোহ। অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস। পরন্তু এক্ষণে আপনার কন্যা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে আমার আশা বড় কম। আপনি শীঘ্র বিবাহ দিতে চাহিতেছেন বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, কিছু বিলম্বে এ কার্য্য করিলে ভালো হয়। বিলম্বে, আপনার কন্যার সেই পূর্ব্ব রূপ আবার ফিরিয়া আসিতে পারে।"

সুরেশচন্দ্র কিন্তু বড় চঞ্চল হইলেন। তখন সুধীর উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রফুল্লকে এক পত্র লিখিলেন ;—

"ভাই প্রফুল্ল, তোমাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, না লিখিবার কারণও ঘটিয়াছিল। তুমি পত্র লেখ নাই কেন ? আশা করি, তুমি ভালো আছ।

"পৃথিবীর সহস্র ঘটনা তুমি ভুলিয়া যাইতে পারো, কিন্তু তোমার জীবনের সেই একটি দিন, বোধ হয়, তুমি কখনও ভুলিবে না। সেই যেদিন তুমি একাকী গঙ্গা-সৈকতে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলে,—সেদিনের কথা কি মনে পড়ে ? আমি তখন বুঝি নাই যে, তোমারই মত, সে বালিকাও তোমার জন্য ব্যাকুলা !

"মলিনা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছিল। তাহার অবস্থা যেরূপ, বিষম হইয়াছিল, তাহাতে সে সংবাদ পাইলে, না জানি তুমি কি বসিতে ;—বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস কি ভাই ? তাই সে

কথা তোমাকে কিছু লিখি নাই। মলিনার বাঁচিবার আশা ছিল না, অতি কষ্টে সম্প্রতি সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগ-শয্যায় বিকার-সময়ে সকল কথাই সে ব্যক্ত করিয়াছে। ছি! এমন করিয়াও ক্ষুদ্র একটি বালিকাকে মজাইতে হয়?

"তারপর, এখন তো সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে তাহার বিবাহের স্থির ছিল, সেখানে হইল না। এই বিষম পীড়ায় ভুগিয়া, মলিনার সে রূপ আর নাই। যে রূপ দর্শনে গৃহত্যাগীর আবার গৃহ-সুখে মন গিয়াছে, মলিনার সে রূপজ্যোতি নির্ব্বাপিত;—সে মুখশ্রী নাই, সে সৌকুমার্য্য নাই, সে কিছুই নাই। যেখানে বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেখানে না হইবার ইহাই কারণ। পাত্রের পছন্দ হইল না।

"আমার আশঙ্কা হয়, তুমিও হয়ত মুখ ফিরাইবে। এ শ্রীহীনা বালিকা তোমার মনের মত হইবে কি না, বলিতে পারি না। সুখের জন্য তুমি দেশে দেশে ঘুরিয়াছ; ভাগলপুরে যে তোমার সুখের সামগ্রী ছিল,—কে জানিত? এই বালিকাকে লইয়াই তুমি সুখী হইবে,—এ কথা আমি আজিও বুঝি নাই। যদি ইহার মূলে রূপতৃষ্ণা থাকে, তবে তোমার আশা মিটিবে না।"

প্রফুল্লকুমার অনেকবার এ পত্রখানি পাঠ করিলেন। মনে মনে হাসিলেন। শেষে এইরূপ উত্তর লিখিলেন;—

"ভাই সুধীর,

"তোমার পত্র পড়িয়া তোমাকে গালি দিয়াছি। নিকটে পাইলে, বোধ হয়, প্রহারও করিতাম। তুমি না বুদ্ধিমান্? আমার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া, অকারণ তুমি আমাকে এইরূপ কঠোর কথা লিখিয়াছ।

"মলিনা পীড়ায় ভুগিয়া কুরূপা হইয়াছে,—ইহাই তোমার
াত্রের তাৎপর্য্য। যেখানে বিবাহের কথা ছিল, সেখানে হইল
া;—ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

"তুমি স্বীকার করো আর নাই করো, সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানু-
ষের প্রাণে বড় বলবতী। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীর বুকে
াকিয়াও মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। তাই যেখানে
একটু সৌন্দর্য্য দেখে, মানুষ সেই থানেই অবনত-মস্তক। আমরা
কলেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। নয়ন তৃপ্ত হয় না,—আশা মিটে
া,—সাধ পূর্ণ হয় না;—তাই চিরদিনই মানুষ রূপের ভিখারী।
রূপে মুগ্ধ নয়,—কে ভাই? যে, রূপ দেখিয়া, রূপের চরণে
াসখত লিখিয়া দিতে চাহে, রূপের অভাবে সে মুখ ফিরাইবে না
কন? কিন্তু রূপ দেখিতে দেখিতে যে রূপে মজিয়াছে, সে রূপ
কি কখনও তিরোহিত হয়?

"রূপ কোথায়? তুমি যে তোমার গৃহিণীতে এত রূপ দেখ,
স রূপ কি তাঁহাতে, না তোমার অন্তরে? যদি তাঁহাতেই হয়,
বে বুকে হাত দিয়া বলো দেখি ভাই, সেই প্রথম যৌবনে, পূর্ণ
রোবরে, পূর্ণ-শতদল যেমন দেখিয়াছিলে, আজিও কি তেমনি
াছে? কিন্তু তবু দেখ, পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার ভালবাসা এখন
তগুণ বাড়িয়াছে! আর সহস্র কারণে তোমার ভালবাসা
র্দ্ধিত হউক, কিন্তু রূপের মোহ তোমার আজিও ঘুচে নাই। রূপ
মাদের অন্তরে। আমি সেই অন্তর হইতেই মলিনার রূপ
খিয়াছি। তোমাকে কেন, কাহাকেও এ কথা বুঝাইতে
রিব না যে, সেই মুহূর্ত্তের দেখা হইতেই, সেই বালিকা আমার
দয় অধিকার করিয়াছে। আমি যদি অন্ধ হইতাম, তথাপি

আমি অন্তরে তাহার রূপ দেখিতাম। মলিনা কুরূপাই হউক আর সুরূপাই হউক, তাহার রূপ আমার অন্তরে!

"আমার মাতাঠাকুরাণী সকল কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, যদি তাঁহাদের মত হয়, তবে আমরা ভাগলপুর গিয়া শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করি।"

সুধীর পত্র পাঠ করিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। আর সুরেশচন্দ্র ও মলিনার দিদিমার আনন্দ দেখে কে? কিন্তু মলিনা? মলিনা তো সকল কথা শুনে নাই; সে ভাবিল,— "এ আবার কি নূতন বিপদ্!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"শুভ-দৃষ্টি।"

তা তোমরা যদি কিছু না বলো, তো বিবাহের আগেই আমি বর-কন্যার "শুভ-দৃষ্টি" করাইব।

মলিনা, বিবাহের কথায় কিছু চিন্তিত হইল বটে, কিন্তু যখন শুনিল, তাহার সুধীর দাদা ইহার মধ্যে আছেন, তখন একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সুধীর কি অন্য পাত্র ঠিক করিতে পারেন না? আর মলিনা যাহাকে দেখিয়াছে, তিনি যে অবিবাহিত, তাই বা কে বলিতে পারে? বালিকা সময়ে সময়ে বড় ভাবে। কাতরপ্রাণে দেবতার কাছে প্রার্থনাও করে।

সুরেশচন্দ্র চিকিৎসকের পরামর্শ মত নানাবিধ সু-পথ্যে, কন্যার দেহ পুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশাও মিটিল। বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার কন্যার সেই পূর্ব্বের রূপ আবার ফিরিয়া আসিল

পূর্ব্বের রূপ ? না, তদপেক্ষাও অধিক রূপ হইল। সেই একটানা গঙ্গা-স্রোতে তখন ধীরে ধীরে নির্ম্মল যমুনা-ধারা আসিয়া মিশিতেছিল। সেই জ্যোৎস্নালোকের সহিত অল্পে অল্পে উষার আলোক মিশিতেছিল। সেই কুসুম সুকুমার কুমারী-দেহের উপর তারুণ্যের লাবণ্যটুকু ঘনীভূত হইতেছিল। সেই শারদীয় কৌমুদীর উপর একটু একটু করিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। নিদ্রিত প্রণয়-দেবতা তখন অল্পে অল্পে অর্দ্ধনিদ্রা—অর্দ্ধ-জাগরণে নিমীলিত আঁখি খুলিতেছিলেন। বাল্যের অতীত অবস্থা, যৌবনের অর্দ্ধোদয়,—সেই অপূর্ব্ব সঙ্গমস্থলে বালিকার রূপরাশি উছলিয়া পড়িতেছিল।

দুর্ভাগ্য সতীশ!—যদি এখন আসিয়া একবার দেখিত! যদি একবার আলুলায়িত কুন্তলা, নীলবসনা, প্রভাময়ী সেই বালার মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিত!—দেখিত যে, তাহার মনঃকল্পিত সৌন্দর্য্য-রাণী, মলিনার চরণ-রেণুরও সমতুল নহে!

সুরেশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, সুধীর প্রফুল্লকে পত্র লিখিলেন। প্রফুল্লও যথাসময়ে জননী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভাগলপুরে উপস্থিত হইলেন।

মলিনার এবার যথার্থ ভাবনা হইল। আর উপায় নাই, সব ঠিক হইয়াছে। সে এখনও কিছুই জানে না যে, পাত্র কে? অনেক চিন্তা করিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে একদিন দিদিমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল,—"দিদি মা! তোমার পায়ে পড়ি, আমি বিয়ে করব না।"

দিদিমা-বুড়ি বড় দুষ্ট, সব জানে, কিন্তু কিছুই না ভাঙ্গিয়া বলিল,—"কেন বিয়ে করবি নে? বড় হয়েছিস, এখন কি স্বয়ম্বরা হবি নাকি?"

মলিনা কাঁদিল। বুড়ি তবু কিছু ভাঙ্গিল না। শেষে বলিলেন,—"ছিঃ বোন্! বিয়ের কথায় কি কাঁদে? আমি আমার বিয়ের কথা শুনে আমোদে গ'লে পড়তুম। ভালো কথা, মণি! (বৃদ্ধা, মলিনাকে 'মণি' বলিয়া ডাকিতেন) তুই নাকি গঙ্গাতীরে কাকে দেখেছিলি,—তা'কেই বিয়ে করিবি?"

মলিনা, চক্ষের জল মুছিয়া, দিদিমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দিদি-মা বলিলেন,—"আমি সব শুনেছি, তোর ভিতর এত ছিল? তা সে যে ঐ বাগ্দীদের ছেলে, তার তিন্‌টে বিয়ে!"

মলিনা রাগে, দুঃখে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল; নিভৃতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। দিদি-মা রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি শুনিয়া ছিলেন,—সুধীর ও বরের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা বরকেও সঙ্গে আনিয়াছেন; সুতরাং শীঘ্রই মলিনার মুখে হাসি দেখিতে পাইবেন।

তার পর, পাত্রী দেখিবার জন্য বরপক্ষীয়েরা উপস্থিত হইলেন। সুরেশচন্দ্র শ্বশ্রূ-মাতাকে বলিলেন,—"মা, মলিনাকে পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন, পাত্রও স্বয়ং উপস্থিত। মলিনাকে সাজাইয়া দিন।"

তখন মলিনার সঙ্গিনীগণ সাজাইয়া দিল। কেশবিন্যাস করিয়া দিল না, অলঙ্কার পরাইল না,—যে স্বভাব-সুন্দরী, তাহার সে সকলে প্রয়োজন কি? তাহারা মলিনাকে কেবল একখানি পরিষ্কার সাড়ী পরাইয়া দিল; কুন্তলরাজি এলাইয়া দিল; কণ্ঠে কুসুম-হার দোলাইয়া দিল; কুসুমে কঙ্কণ গাঁথিয়া, হস্তে বাঁধিয়া দিল।

পরিচারিকা, মলিনাকে লইয়া বাহিরে আসিল। মলিনার বুকের ভিতর তখন সমুদ্রমন্থন হইতেছিল।

সুধীর ইচ্ছা করিয়াই মলিনাকে প্রফুল্লকুমারের সম্মুখে বসাই-লেন। উভয়েই অবনতমুখ। মঙ্গলবিধি সম্পন্ন হইলে, সকলেই পাত্রীর রূপ-গুণের প্রশংসা করিলেন।

সেই অবসরে,—মলিনা একবার মুখখানি তুলিল। অতি ভয়ে ভয়ে, অতি চুপি চুপি, অতি সন্তর্পণে,—একবার আঁখি দুটি খুলিল। প্রফুল্লকুমারও সেই সময়ে মলিনার প্রতি চাহিলেন।

আবার সেই দেখা! কিন্তু সে দেখায় ও এ দেখায় কত প্রভেদ! মুহূর্ত্তের জন্য চারিটি পিপাসিত-আঁখি আবার মিলিল।

মলিনার হৃদয়ে আবার সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইল। কিন্তু এ মন্থনে ধন্বন্তরী-সুধা উঠিল। এ কি প্রহেলিকা, মায়া, না ইন্দ্রজাল?

মলিনা বাড়ীর ভিতর আসিল। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি! বিয়ে কর্‌বি কিনা, এখন বল্।"

মলিনা মুখখানি নত করিল। বুঝিল, দিদি-মা সব জানিতেন।

বৃদ্ধা দেখিলেন, মলিনার অধরে হাসি আর ধরে না,—নয়নে কিন্তু অশ্রু! সেই হাসি ও অশ্রুর সমন্বয় কি মধুর ও অপূর্ব্ব! বৃদ্ধা দিদি-মা সেই মাধুরিমা দেখিবার জন্যই সমস্ত জানিয়াও কিছু ভাঙ্গেন নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্থিতি-বিধায়িনী।

তারপর যাহা ঘটিল, সে কথা না বলিলেও চলে। তবু বলি, নহিলে আমার এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ হইবে না।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, প্রফুল্লকুমারের সহিত মলিনার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল। স্রোতস্বতী সমুদ্র-হৃদয়ে আপন হৃদয় মিশাইয়া কৃতার্থ হইল।

মলিনা বলিত,—"চিত্রকর! গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া তেমন যাদুমন্ত্র কেন প্রয়োগ করিয়াছিলে?"

প্রফুল্ল উত্তর দিত,—"কুহকিনি! তুমিই যাদুমন্ত্রে এ বন-বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছ!"

মলিনা। আমি পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিতেছি, পক্ষী উড়িয়া যাক্।

প্রফুল্ল। উড়িয়া কোথায় যাইবে? চারিদিকে তুমি,—তোমাকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? সেই উদার আকাশ, ঘন বন, তুঙ্গ শৃঙ্গ—সকলই ভুলিয়াছি; তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে আজি এ বিহঙ্গ বন্দী! প্রেমময়ি, আমি আপনাকে ভুলিয়াছি, তোমারই প্রেমের আলোকে বিশ্ব সমুজ্জল দেখিতেছি।

মলিনা। আমি তোমার চরণ-রেণুরও যোগ্য নহি।

প্রফুল্ল। তুমি আমার "স্থিতি-বিধায়িনী।"

মলিনা, প্রভাতে উঠিয়া অগ্রে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিত। প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—"অগ্রে তুমি, পরে আর সব। তোমাকে প্রণাম না

করিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিলে, ঠাকুর-প্রণাম আমার সম্পূর্ণ হয় না।"

প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেন,—"সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায়, এই প্রেম অবিচলিত, অবিকৃত, অপরাজিত! ইহাই এ দুঃখের সংসারে ধন্বন্তরি-সুধা! আজি এ চিত্ত শান্ত, এ হৃদয় তৃপ্ত। এই প্রীতি হইতেই সেই পরমা প্রীতি পাইয়া বিশ্বসংসার আপনার জ্ঞান করিব।"

প্রেমের পরীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অমরচন্দ্র বসুর বিবাহের কথা হইতেছিল। গ্রামবাসী প্রকাশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার প্রধান সুহৃদ্। দুই জনের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব ছিল যে, অনেকে মনে করিত, দুই জনের এক হৃদয়, এক প্রাণ,—কেবল দেহ ভিন্ন। উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস; একের জন্য অন্যে, বুঝি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে।

এই বন্ধুত্বের মধ্যে একটুও স্বার্থ-মলিনতা ছিল না। শৈশব হইতে নির্ম্মল প্রেম, উভয়ের হৃদয়কে একত্র এমনই করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল যে, এ জগতে উভয়ে যেন উভয়ের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারাও পরস্পরকে এইরূপ বুঝিত। হর্ষ ও বিষাদ সে দুইটি হৃদয়ে এমন তুল্যরূপে একই তরঙ্গ তুলিতে পারিত যে, কেহ কখন উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাইত না।

কিন্তু তবুও কিছু পার্থক্য ছিল। অমরচন্দ্র কিছু বেশী হৃদয়-প্রধান এবং প্রকাশচন্দ্র কিছু জ্ঞানপ্রধান; এক জনের হৃদয়ে একান্ত

ভাবের উচ্ছ্বাস,—সুতরাং অতি সহজেই অল্পমাত্র কারণেই হৃদয় উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত; আর একজন কিছু গম্ভীর ও চিন্তাশীল,—সুতরাং সহজে সে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিত না। পরন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক যে, সেই গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা মাধুর্য্য-মিশ্রিত ছিল। দুই জনেই রূপবান্, চরিত্রবান্, বিদ্বান্;—দুই জনেই সমবয়স্ক। এমন দুই হৃদয়ের মিলন এ সংসারে বড়ই অল্প দেখা যায়।

সংসারে বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সুখ থাকিতে পারে না, তাই এই দুইটি হৃদয়ের এমন অপূর্ব্ব মিলনও বুঝি ঘটনার ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া,——কিন্তু সে কথা বলিবার আগে যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। দিবা-অবসানে সন্ধ্যা তো আসিবেই, তবে প্রভাতের এ শুভ্র সুস্নিগ্ধ আলোকের মাঝে রাত্রির অন্ধকার আনিয়া লাভ কি?

অমরের বিবাহের কথা হইতেছিল। দুই বন্ধুতে কর্ণগড়ের এক ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া নানাপ্রকার পরামর্শ করিতেছিল। কলনাদিনী কল্লোলিনী কর্ণগড়ের ভগ্নস্তূপের তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া, অবিরাম ছুটিয়াছে। পদপ্রান্তে সেই স্বচ্ছসলিলা স্ফীতবক্ষা গঙ্গা,—গঙ্গার সেই সুদূরবিস্তৃত জলরাশির উপর শুভ্র চন্দ্র-কিরণ,—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ,—সেই নীলাকাশে শত শত তারা,—সেই তারা-হারে জ্যোৎস্নাধারা;—সে সকলই সুন্দর; সকলই শোভাময়। সেই জ্যোৎস্নালোকে কর্ণগড়ের সেই প্রকাণ্ড স্তূপ অতি ভীষণ না দেখাইলেও, সে স্থানের সেই নীরবতা অতি ভীষণ বোধ হইতেছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দিবসেও কোন লোক, অতি প্রয়োজন না হইলে, সেখানে যাইত না।

কিন্তু সেইস্থান এই দুই যুবকের পক্ষে বড় প্রীতিপ্রদ,—বড় কবিত্বপূর্ণ ছিল।

ভাগলপুর হইতে কিছু পশ্চিমে চম্পানগর অবস্থিত। কর্ণগড় ঐ চম্পানগরের মধ্যে এক সময় অতি প্রকাণ্ড গড় ছিল। শুনা যায়, অতি প্রাচীনকালে মহাবীর কর্ণ ঐ গড় অলঙ্কৃত করিতেন। তাই আজিও উহা "কর্ণগড়" নামে প্রসিদ্ধ। এখন সে গড় ভূমি-সাৎ হইয়াছে, কতক গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে মধ্যে এখনও এমন সকল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় যে, যাহা তাহার বহু প্রাচীনত্ব ও অসাধারণত্বের পরিচয়স্থল হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই কর্ণগড়ের এক ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া, দুই বন্ধুতে মিলিয়া, বিবাহ-সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

অমর। বিবাহ তো করিব, কিন্তু সত্য বলিতে কি, বিবাহে আমি সুখী হইব কি না, সময়ে সময়ে তাহাই সন্দেহ হয়। আমার মনে হয়, বিশুদ্ধ প্রেম—যাহা সুখে দুঃখে অবিচলিত, অবিকৃত, অপরাজিত,—সে প্রেম এ সংসারে নাই।

প্রকাশ। সে কথা এখন থাক্। আর দু'দিন পরে, অবগুণ্ঠনাবৃত একটি ক্ষুদ্র বালিকার চরণে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যখন তোমাকে প্রেমে বন্দী দেখিব, তখন এ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে। তখন দেখিব, ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র বুকটুকুতে যে প্রেম, তাহা তোমার বিশাল কাব্যজীবন ডুবাইয়া রাখিতে পারে কি না? কিন্তু তখন কি আর এ বাল্য-বন্ধু কি আর কাহারও কথা ভাবিবার অবসর থাকিবে? না, আজিকার এ কথাও মনে থাকিবে?

অমর। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, বিবাহের পর হৃদয়ের এতটা অনুরাগ, এতটা স্নেহ-মমতা, বোধ হয়, সব আর তোমায় দিতে পারিব না। ক্ষুদ্র এক বালিকা আসিয়া এই হৃদয়টা অধিকার করিয়া রাখিবে। এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। জীবনের এই দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে এতটা অধ্যয়ন করিয়াও বালিকা-হৃদয়ের রহস্য আজিও বুঝি নাই। বুঝি সে হৃদয় সীমাহীন—অপার মহাসাগর! ক্ষুদ্র দেহটুকুর ভিতর এক অসীম অনন্ত হৃদয়-সমুদ্র,—"সসীমে অসীম"—এমন আর কিছুই নাই। আজীবন সন্তরণেও এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না।

প্রকাশচন্দ্র উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল,—"এখনো তো সাগরে ঝাঁপ দাও নাই, কূলে দাঁড়াইয়া এত আতঙ্ক কেন? ভয় নাই, বালিকা দস্যু নহে,—একদিনেই কিছু তোমার সমস্ত কাড়িয়া লইবে না।"

অমর। তুমি হাসিতে পারো; কিন্তু বিবাহ করিয়া পাছে তোমার প্রতি আমার স্নেহের কিছু হ্রাস হয়, আমি নিয়তই তাহা ভাবিয়া থাকি। বরং বিবাহ না করিয়া, আজীবন এই ভাবে কাটাইতে পারি, তথাপি তোমায় ভুলিতে পারিব না।

প্রকাশ। বিবাহ হইলেই বা আমাকে ভুলিবে কেন?

অমর। তাহা আমি জানি না। পুস্তক পড়িয়াছি, মনুষ্যের হৃদয় পড়িয়া উঠিতে পারি নাই,—সংসারের অনেক রহস্য আজিও জ্ঞানের অতিদূরে লুকাইয়া আছে। স্ত্রীকে কিরূপ ভালবাসিতে হয়, তাহা জানি না। এ হৃদয়ে তাহার কতটা আধিপত্য, কতটা দৌরাত্ম্য সহিতে হইবে, তাহাও জানি না। কিন্তু সে প্রেম-উন্মাদনার মধ্যে ডুবিয়া, যদি তোমায় ভুলিয়া

যাই,—তুমি আপনা হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া আমায়, আবার আপনার বলিয়া, তোমার অকৃত্রিম স্নেহবক্ষে স্থান দিও। কি জানি যদি কখনও তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কোন ক্রটি হয়, তবে নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিও। আর বলিব কি——

অমরের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। সেই জ্যোৎস্নালোকে অশ্রুপূর্ণ সেই আঁখিযুগল যে কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, প্রকাশ! ইহ-জীবনে তাহা তুমি ভুলিও না।

অশ্রুপূর্ণ লোচনে অমর বলিল,—"ভাই প্রকাশ! আর বলিব কি, কখন যেন তোমার স্নেহে বঞ্চিত না হই!"

তখন মাথার উপর চন্দ্র হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না-বিধৌত ভগ্ন স্তূপ কর্ণগড়ের পাদদেশে গঙ্গা অতি ধীরে বহিতেছিল। দুই জনে পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল—কেহ কাহাকে ভুলিবে না, কেহ কাহাকে স্নেহে বঞ্চিত করিবে না।

কিন্তু সে দুই জনের মাথার উপর কে এক জন, অলক্ষ্যে বড় নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছিল। তাহার হাসিতে মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ বায়ুশূন্য হইল। সে কে, জানি না; যেই হউক, তাহার মনে যাহা থাকে, সে তাহাই করে। তাহারই ইঙ্গিতে আমাদের বড় সাধের নন্দন-কানন মরুভূমিতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরচন্দ্রের বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। তাঁহার আপনার জন অন্য কেহ ছিল না; প্রকাশচন্দ্র ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ উপস্থিত হইয়া শুভদিনে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

পাত্রী কিছু বয়ঃস্থা হইয়াছিল। যৌবন তাহার হৃদয় টুকুর ভিতর প্রবেশ করিয়া, অতি ধীরে ধীরে নিদ্রিত প্রণয়-দেবতাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিশোরীর রূপ,—রবিকরপ্রোদ্ভিন্ন প্রভাত-কমলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। সে দেহ যেমন সুকুমার, সে হৃদয়ও তেমনি সুকুমার। অমর মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সৌন্দর্য্য-ধ্যানে বিভোর হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চিনিলেন। দুই জনের প্রতি দুই জনের প্রগাঢ় প্রেম জন্মিল। নির্ম্মলা তাহার স্বামীর মূর্ত্তিতে বিশ্ব-সংসার পরিপূর্ণ দেখিত। স্বামীর অত আদর, অত প্রেম, অত সোহাগ, বালিকার হৃদয়ে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিত। বালিকা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিত না, কিন্তু তাহার হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, সে দেখাইতে পারিত যে, অমরই তাহার সর্ব্বস্ব,—সে অমরময়। নির্ম্মলার সে পতিসেবা, সে প্রগাঢ় প্রেম,—সে ঐকান্তিকী ভক্তি, সে সকল দেখিয়া অমর বুঝিতেন,—নির্ম্মলার রূপ বাহিরে ভিতরে সমান; সে রূপের আলোকে তাঁহার গৃহ আলো, হৃদয় আলো, জগৎ-সংসার আলো। অমরের মনে হইত, তাঁহার প্রেমের প্রবাহ নির্ম্মলার সে অপার অতলস্পর্শ অনন্মুমেয় হৃদয়-সমুদ্রে মিশিয়া দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছে। প্রেমের সর্ব্ব-ব্যাপিনী মহাশক্তির চরণে অমর অবনত হইলেন।

অমরের চারি বৎসর এইরূপে কাটিল। বড় সুখে, বড় শান্তিতে,—ভক্তের দেবতাদর্শনের ন্যায়,—বড় আনন্দে কাটিল। জীবন-সহচর প্রকাশ আজিও তেমনি তাঁহার পার্শ্বে আছেন। প্রকাশ প্রায়ই অমরের বাড়ীতে আসিতেন, না আসিলে অমর ছাড়িতেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রকাশ এইরূপ ঘন ঘন আসা

বন্ধ করিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"অমরের বিবাহ হইয়াছে, বাড়ীতে অন্য অভিভাবক কেহ নাই, যখন তখন যাওয়া আসা আমার উচিত হয় না। যদিও কাহারও মনে কিছু না থাক্, তথাপি অমরের সম্মান রক্ষা করা আমার উচিত। অন্য কাহারও মনে কোন কথা না উঠে, তাহা দেখিতে হইবে। এ সংসারে এমন লোকের সংখ্যাও অল্প নহে, যাহারা বিনা স্বার্থেও পরের কথা বিকৃত-ভাবে লইয়া নানা গোলযোগ ঘটাইতে ভালবাসে। আমার এই যাতায়াতের মধ্যে আমার নিজের চরিত্রের সহিত অমরের নিষ্কলঙ্ক খ্যাতিও জড়িত রহিয়াছে।—দুষ্টলোকের পাপ মনে কখন কোন্ কথা জাগে, কে বলিতে পারে?" তাই প্রকাশ অল্পে অল্পে অমরের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলেন।

কিন্তু অমর সে কথা বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন,—"তুমি না আসিবে কেন? এ সংসারে তুমিই আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ ও আত্মীয়; তোমার বুদ্ধিই আমার বল ও ভরসা।"

প্রকাশ যাইতে স্বীকার করিতেন, কিন্তু যাইতেন না। অমরের এ প্রকার স্বাধীনভাবের মূলে বন্ধুর প্রতি প্রবল স্নেহ ও প্রগাঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দু-সমাজ মহিলাগণকে এইরূপে পর-পুরুষের সাক্ষাতে উপস্থিত করিতে একান্ত নারাজ। ইহার মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা সকলে না বুঝিয়া, অনুদার বলিয়া হিন্দুসমাজকে ঘৃণা করে। অমরচন্দ্রও তাহাদেরই একজন। আমরা অমরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, লৌকিক আচার-ব্যবহার,—হিন্দুর মত দেখিতে পাই না; পরন্তু তিনি যে কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মতে চলিতেন, তাহাও নহে।

প্রকাশকে মধ্যে মধ্যে অমরের বাড়ীতে যাইতে হইত, এবং

অমরের অনুরোধে নির্ম্মলা প্রকাশের সম্মুখে বাহির হইতেন। কিছুদিন পরে নির্ম্মলা—প্রকাশের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতেন।

বিবাহের চারি বৎসর পরে, একদিন অমর প্রকাশকে বলিতে-ছিলেন,—"ভাই, ঈশ্বর আমাকে সকল প্রকারে সুখী করিয়া-ছেন সত্য; আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, এই সম্মান ও খ্যাতি, তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু-রত্ন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী এই সহ-ধর্ম্মিণী,—সকলই আমি মনোমত পাইয়াছি। কিন্তু আজ কয়দিন হইতে একটি চিন্তা মনে জাগিয়াছে;—তাহাতে বড় কাতর আছি। কেন যে এমন চিন্তা মনে উঠিল, তাহা জানি না এবং ইহা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক, অন্যায় ও গর্হিত, তাহা বুঝিয়াও এ চিন্তা দূর করিতে পারিতেছি না। তোমাকে ছাড়া এ কথা আর কাহাকে বলিব? তুমি ভিন্ন ইহার প্রতিকার আর কে করিবে?"

প্রকাশ। তুমি আমাকে সকল কথাই বলিতে পারো। তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহা করিব।

অমর। তোমার কাছে বলিতে কি,—তোমার কাছে লুকা-ইবার আমার কিছুই নাই।—আমি জানি আমার স্ত্রী অতি সচ্চরিত্রা ও পতিব্রতা। কিন্তু যাহা আমি জানি, তাহা যথার্থ কি না, তাহাই জানিতে চাহি। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই, এ কথা সত্য বলিতেছি। কিন্তু ভাই, প্রলোভনে না পড়িলে, কে কেমন, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? কোন্ ব্যক্তি না স্বর্ণকে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া লয়? আমিও তাই দেখিতে চাই, আমার নির্ম্মলা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও আপনার নৈর্ম্মল্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে! যে কখন প্রলোভনের মধ্যে

পড়ে নাই, তাহার পক্ষে সতী ও পতিব্রতা হওয়া নিতান্ত কঠিন কথা নহে। কিন্তু আমার নির্ম্মলা যদি এইরূপ কোন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে,—এবং পারিবেও আমার বিশ্বাস,—তবেই জানিব, আমার তুল্য ভাগ্যবান্ পৃথিবীতে আর নাই। কিন্তু যদি নির্ম্মলা পরাজিত হয়? বোধ হয়, বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে,—যদি বাঁচিয়া থাকি, জগৎ অন্ধকার হইবে! কিন্তু যাহাই হউক, এ ইচ্ছা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। প্রকাশ! শুন ভাই, মুখ ফিরাইও না, আমি অন্যের হস্তে এ ভীষণ পরীক্ষা-ভার ন্যস্ত করিতে পারিব না,—তুমিই আমার এ কার্য্যের সহায় হও। কি জানি, যদি আমার আশার বিপরীত হয়, তবে তুমি প্রাণের বন্ধু প্রকাশ,—তোমা হইতে আর অধিক কিছু অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। আমি নির্ম্মলার এ প্রেমের পরীক্ষা চাই, নহিলে সুস্থিরে বাঁচিব না,—তুমি ইহার উপায় করো।

প্রকাশ সকল কথা শুনিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, অমরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিলেন,—"অমর! এ তোমার কিরূপ উপহাস! স্ত্রীর কথা লইয়া এরূপ উপহাস,—আমার সাক্ষাতেও তোমার উচিত নহে। তুমি যে এ কথা বলিতেছ, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিব না, বরং বিশ্বাস করিব, তুমি সে অমর নও। আর যদি যথার্থই এ কথা বলিয়া থাকো, তবে শুন অমর! তোমার মত হতভাগ্য ও মূর্খ এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই! এ পর্য্যন্ত জগতে এমন কথা কেহ শুনিয়াছে কিনা জানি না। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি কর্ত্তব্য-জ্ঞান সহসা কি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? স্ত্রীর প্রেমের পরীক্ষা!— যাহাতে তাহার সতীত্ব, তাহার চরিত্র, তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব

এবং তোমার জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে, তাহা লইয়াই তোমার এই কৌতুক! একি খেলা ভাই? তুমি পাগল হইলে নাকি?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তবু বুঝানো দায়! অমর সে কথা বুঝিতে চাহিলেন না। প্রকাশ ধীরভাবে যথার্থ বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিতে লাগিলেন,—"শুন অমর, তোমার এইরূপ প্রস্তাবে আমার বোধ হইতেছে যে, তোমার মতিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; নহিলে তুমি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া এরূপ কহিবে কেন? ইহার মধ্যে কি বিপদ রহিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না? তুমি কি বুঝিতেছ না, ইহাতে তোমার সর্ব্বনাশসাধন হইতে পারে? তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তোমায় বুঝানো দায়, কেননা, তুমি প্রকৃতিস্থ আছ বলিয়া বোধ হয় না। তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর প্রেমের পরীক্ষায় নিযুক্ত করিতে চাও!—অর্থাৎ প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া লুকাইয়া দেখি,—স্বভাব-সুন্দরী, বিশুদ্ধ-হৃদয়া, সে সোণার বিহঙ্গী ধরা পড়ে কি না!—সে দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গ কেন্দ্রচ্যুত হয় কি না!—সে স্বর্গের দেবী নরকের মোহে আত্মবিস্মৃত হয় কি না!—ছি! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাবিয়া পাই না।"

অমর একটু উপেক্ষার হাসি হাসিলেন; দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "ভাই প্রকাশ, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছি; তুমি মুহূর্ত্তের উপদেশে আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে পারিবে না।"

"তা না পারি, তোমার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব,—তোমায় বন্ধুতার বঞ্চিত হইব।"

"না প্রকাশ, অতটা নিষ্ঠুর হইও না;—আমার এ অনুরোধ তোমার রাখিতেই হইবে।"

এবার কতকটা বিস্মিতভাবে প্রকাশ বলিলেন, "অমর, তুমি কি সেই?—না, অমরের ছায়া লইয়া আমার সম্মুখে কোন যাদুকর আসিয়াছে?"

মুহূর্ত্তকাল উভয়েই নীরব। অমর অবনত মস্তক; প্রকাশ উত্তেজিত। প্রকাশ পুনরায় কহিলেন,

"অমর কতবার না তোমায় বলিতে শুনিয়াছি, তোমার স্ত্রী রূপপ্রভায় যেমন প্রদীপ্ত;—প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, দান ও প্রীতিতেও তাঁহার হৃদয় তেমনই প্রদীপ্ত!—পরীক্ষায় ইহার অধিক তাঁহাকে আর কি জানিবে? এখন তোমার হৃদয়ে তাঁহার যে উচ্চাসন রহিয়াছে, ইহার পর আর কি দিবে?—কি দিতে পারিবে? আর যদি বুঝিয়া দেখ, তাঁহার প্রেম বা ভালবাসা কৃত্রিম; তবে পরীক্ষায় ফেলিয়াই বা লাভ কি? সেই রূপই ব্যবহার করিতে পারো। যে অমূল্য কোহিনূরের জগৎপ্রসিদ্ধ খ্যাতি, কোন্ মূর্খ তাহা কঠিন প্রস্তরে ফেলিয়া তাহার বিশুদ্ধির প্রমাণ দেখিতে চাহে? প্রমাণ পাইলেও কি তাহার গুণগরিমা অধিক বাড়িবে? কিন্তু বিপরীত হইলে কি মর্ম্মভেদী মনস্তাপ সহিতে হয়,—ভাবো দেখি? ইহা বুঝিয়াও যদি পুনর্ব্বার এই কার্য্যে জেদ প্রকাশ করো, তো তোমায় মূর্খ ভিন্ন আর কি বলিব?

"ভাবিয়া দেখ, এ সংসারে সতী স্ত্রীর অপেক্ষা বহুমূল্য রত্ন আর কিছুই নাই। তুমি সে রত্নের অধিকারী হইয়া নিজ-হস্তে

তাহা বিনষ্ট করিবে? আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ কিছু দুর্ব্বলা; কোন বিপদ্-কণ্টক তাহার পথে না ফেলিয়া, তাহার পথ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কি জানি, কোন্ বিপদের মাঝে পড়িয়া সে আপনার পথ হারাইয়া আপনার সর্ব্বনাশসাধন করে, এইজন্য বিপদের পথে তাহাকে ফেলিতে নাই। সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও পুণ্যের মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে হয়; তাহা হইলে বিধাতা নারী-হৃদয়ে যে স্বর্গীয় রত্ন দিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে, এবং যে ভাগ্যবলে সে রত্নের অধিকারী হয়, ভাবিয়া দেখ, সে কি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় রমণীর খ্যাতি ও যশ অতি সাবধানে রাখিতে হয়,—এতটুকুও পাপ নিশ্বাসস্পর্শে তাহা মলিন হইতে পারে!

"আরও ভাবিয়া দেখ, এই সঙ্গে আমাকেও কি বিপদের মাঝে ফেলিতেছ! যখন তোমারই কথামত তোমার স্ত্রীর সম্মুখে আমি প্রলোভনের জাল বিস্তার করিব, তখন তিনি আমাকে কি ভাবিবেন! তিনি ভাবিবেন, হয়ত আমি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারি, এমন কিছু আভাস তিনি আমাকে দিয়াছেন!—এই ভাবনাতেই তাঁহার কি আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে ভাবো দেখি? তাঁহার নিন্দায়,—তোমারও নিন্দা; তাঁহার অখ্যাতিতে তোমারও অখ্যাতি। এখনও ভাবিয়া দেখ অমর! কি স্বর্গীয় পারিজাত তুমি সাধ করিয়া উষ্ণোদকে ফেলিতে চাহিতেছ! কি অমূল্য রত্ন শূকরের ন্যায় তুমি স্বেচ্ছায় হারাইতেছ! আর যদি একান্তই এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করো, তুমি আর কাহারও দ্বারা এ কার্য্য সাধন করো,—আমা হইতে ইহা হইবে না। ইহাতে যদি তোমার

স্নেহে চিরদিনের জন্য আমাকে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।”

ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে প্রকাশ নীরব হইলেন, কিছুক্ষণের জন্য অমরও নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন বিশালবক্ষা গঙ্গা অবাতবিক্ষুব্ধ হইয়া স্থিরভাবে অতি-ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল; বিশাল গঙ্গাবক্ষে বিশাল আকাশের যে বিশাল ছায়া পড়িয়াছিল, তাহাও মেঘ-শূন্য পরিষ্কার নীল। অমর গঙ্গাতটে বসিয়া এই সুন্দর ছবি দেখিতেছিলেন। সহসা একটুকু ঘন কালো মেঘ উঠিল, আকাশের নীল ছায়ার উপর একটা ঘন কালো দাগ পড়িল, একটু বাতাস বহিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া গঙ্গার স্থির-বক্ষ আন্দোলিত করিল। তারপর, বাতাসের জোর বাড়িল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া গঙ্গা আলো-ড়িত করিতে লাগিল, সুনীল আকাশের চারিদিকে মেঘ ছড়াইয়া পড়িল,—সহসা প্রকৃতির সেই শান্তমূর্ত্তি অতি ভীষণ হইল। অমর সে দুর্য্যোগের সময়ও বসিয়া ভাবিতেছেন,—“নির্ম্মলার প্রেমও কি সহসা এমনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না? সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে, অভাবে নির্য্যাতনে, পাপ ও প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও কি সে প্রেম অবিচলিত, অবিকৃত, পরিশুদ্ধ থাকিবে? তাহাই তো দেখিতে চাই। পাপে ও প্রলোভনে যে আত্মহারা হইল না, তাহারই প্রেম বরণীয়—আমি সেই প্রেমেরই পরীক্ষা চাই!”

তখন অমর প্রকাশ্যে কহিলেন, “ভাই প্রকাশ! তুমি যাহা বলিলে, সে সকলই সত্য। আমি যাহা করিতে বসিয়াছি, তাহার ভালো মন্দ সকলই ভাবিয়াছি, কিন্তু বুঝিয়াও আমার মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না। আমার এ মূর্খতা বিষম রোগ বলিয়াই

মনে করো ;—তুমি ইহার প্রতীকার না করিলে আমি বাঁচিব না। তুমি একবার আমার কথা রাখ, আমি সুখী হইব ;—সত্যই সত্যই সুখী হইব।”

প্রকাশ ভাবিয়া দেখিলেন, এ সংসারে যত প্রকার মূর্খতা আছে, ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত মূর্খতা আর কিছুই নাই। কিন্তু বুঝাইলে আর কি হইবে? বন্ধুর,—সহসা এ দুর্ম্মতি কেন হইল, তাহা তিনিও বুঝিলেন না। রোগ এমনই গুরুতর যে, যদি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে, ইহার জন্য অমর, চাই কি অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে পারে। অগত্যা প্রকাশ,—অমরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,— “পরীক্ষা আমা হইতে হইবে না, বলিব, নির্ম্মলার হৃদয় প্রলোভনে অবিচলিত,—শত প্রকার আক্রমণেও অজেয়।”

অমর প্রকাশের উপর পরীক্ষা-ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যখন যে সুযোগের আবশ্যক, তাহা তৎক্ষণাৎ সমাধা করিয়া দিবেন,—ইহাও বলিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই আকাশ একটু একটু করিয়া মেঘাচ্ছন্ন হইতেছিল,—এক্ষণে প্রবল ঝড় উঠিল। তখন দুই বন্ধু আপন আপন গৃহে ফিরিলেন।

মূর্খ অমর! যে রত্নভাণ্ডার আজ পরহস্তে সমর্পণ করিলে, আর কি তাহা ফিরিয়া পাইবে? যে অজেয় দুর্গ মধ্যে থাকিয়া, সংসারের শত বিঘ্ন বাধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে, আর কি সে দুর্গ মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে? বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য অতল জলে ফেলিয়া দাও, তুমি অতি বড় দুর্ভাগ্য,—এত সুখ তোমার অদৃষ্টে সহিবে কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে অমরের বাটীতে প্রকাশের নিমন্ত্রণ হইল। আহারাদির পর সকলে বিশ্রাম করিতেছেন, অমর সেই সময় স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে, এখনই একস্থানে যাইতে হইবে। খুব শীঘ্রই ফিরিব। যে পর্য্যন্ত আমি না আসি, প্রকাশ এখানে থাকিবে।"

সরলা সহধর্ম্মিণী সহসা স্বামীর এইরূপ প্রয়োজনের কারণ বুঝিলেন না; কহিলেন, "না, এখন গিয়া কাজ নাই, বেলা পড়ুক, অপরাহ্ণে যাইও।"

অমর সে কথা না শুনিয়া চলিয়া গেলেন। তখন প্রকাশ পূর্ব্বদিনের সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া ঈষৎ শিহরিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া, পুস্তকাধার হইতে একখানি পুস্তক লইয়া নীরবে পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলাও কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ-কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। কাহারও সহিত কোন কথা হইল না।

কিছু বিলম্বে অমর গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রকাশ ঘুমাইতেছে। অমর ভাবিলেন,—"আমি তো দুই তিন ঘণ্টা পরে আসিয়াছি, হয়ত কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়া থাকিবে,—প্রকাশ তাই এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। ভালো, ডাকিয়া দেখি।"

প্রকাশ উঠিলে, অমরের প্রশ্ন আরম্ভ হইল,—"কি, কেমন দেখিলে? কোন কথা হইয়াছিল কি না?"

প্রকাশ। অন্যান্য কথা অনেক হইয়াছে। এখন কি বেশী বলিতে পারি? আজ তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়াছি, কাল

তাঁহার গুণের কথা বলিব, অন্যদিন আমার জীবনের দুই চারিটা দুঃখের কাহিনী বলিব—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন, দু' কোঁটা চ'খের জলও ফেলিবেন,—এই রকম করিয়াই না মানুষকে আয়ত্ত করিতে হয়? সয়তানও না এমনই বেশ ধরিয়া জগতে পাপের বীজ রোপণ করিয়াছে?"

অমর বড় সন্তুষ্ট হইলেন। মাঝে মাঝে তিনি এইরূপ অবসর দিতেন, আর প্রকাশ হয় ঘুমাইয়া, না হয় পুস্তক পড়িয়া, সে অবসর টুকু অতিবাহিত করিতেন। পরে যথা সময়ে অমরের প্রশ্নে উত্তর দিতেন,—"আর কি পরীক্ষা করিব ছাই? দু'চার কথা বলিয়া এমনই তোমার স্ত্রীর চক্ষুঃশূল হইয়াছি যে, তিনি আর সম্মুখে আসিতে চান না।" অমর বলিলেন,—"এখনও হয় নাই, এই সহস্র মুদ্রা তোমায় দিতেছি, তুমি নানা স্বর্ণ অলঙ্কার তাহাকে উপহার দিয়া দেখ, সে প্রত্যাখ্যান করে কি না! এই আমার শেষ পরীক্ষা! আর তোমাকে কষ্ট দিব না। এই পরীক্ষায় নির্ম্মলা জয়ী হইলে, সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিব এবং তুমি যে নিষ্পাপ, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিব।"

মূর্খ অমর মনে করিয়াছিল,—"স্ত্রীজাতি অর্থ ও অলঙ্কার সহসা প্রত্যাখান করিতে পারিবে না। আজ আমি লুকাইয়া শুনিব,—উভয়ের কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়।"

এই বলিয়া অমর পার্শ্বস্থিত একটি কক্ষে লুক্কায়িত হইলেন।

কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো আজও কোন কথাবার্ত্তা নাই। প্রকাশ পুস্তক পাঠ করিয়া, এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিলেন, নির্ম্মলাও যথারীতি গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা রহিলেন।

অমর বাহিরে আসিয়া প্রকাশকে ডাকিলেন, এবং যেন কিছুই জানেন না—এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজিকার খবর কি ?"

প্রকাশ। আজিকার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। কথা-প্রসঙ্গে উপহারের কথা তুলিতে-না-তুলিতে তিনি এমন তিরস্কার করিয়াছেন যে, আর কিছুই বলিতে পারি নাই।

অমর। প্রকাশ! এই তোমার বন্ধুত্ব ? আমাকে প্রতারণা ? আমি আজ দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া দেখিয়াছি,—তোমরা কেহ কাহারও সম্মুখীন হও নাই, কিংবা বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করো নাই। আমার স্থিরবিশ্বাস হইতেছে, এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে তুমি পরীক্ষা করো নাই। ছি! আমার সহিত এইরূপ মিথ্যা ব্যবহার করা কি তোমার উচিত হইয়াছে ? এখন বুঝিতেছি, অন্য কাহা-কেও নিযুক্ত করাই আমার উচিত ছিল।

তখন প্রকাশ কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"সত্যই এ পর্য্যন্ত তোমার স্ত্রীর সহিত কথা কহা দূরে থাক্, তাঁহার মুখপানেও চাহি নাই। কিন্তু এবার তুমি নিশ্চিন্ত হও, এবার তোমার সহিত মিথ্যা কহিব না,—সত্যই পরীক্ষাভার গ্রহণ করিলাম।"

তখন অমর বিশেষ একটা কার্য্যের ভাণ করিয়া, কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নির্ম্মলা অনেক কাঁদা-কাটি, অনেক ওজর-আপত্তি করিল, কিন্তু অমর শুনিলেন না। 'প্রয়োজন বড় গুরুতর,'—স্ত্রীকে তিনি এইরূপ বুঝাইলেন। এখন, নির্ম্মলা একা গৃহে থাকেন কেমন করিয়া ? সাধ্বী, পিতৃগৃহে যাইতে চাহিলেন। অমর আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আমি যত সত্বর পারি, ফিরিব ; তুমি গৃহে থাকিও, প্রকাশ তোমাদিগকে দেখিবে, তাহাকেই এখানে রাখিয়া গেলাম।"

যাও মূর্খ অমর! পারো, তো আর ফিরিও না। দৈব-দুর্ব্বিপাকেই হউক আর নিয়তি বশেই হউক,—যেমন করিয়া হউক, যেন পথেই তোমার মৃত্যু হয়! গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আর কি দেখিবে,—হতভাগ্য তুমি! যে সুবর্ণমন্দিরে প্রেমের দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে,—দেখিবে, দেবতা অন্তর্দ্ধান করিয়াছে,—শূন্য মন্দির পড়িয়া আছে! দেখিবে, যে অমূল্য রত্নে তোমার গৃহ কুবেরের ভাণ্ডারকেও লজ্জা দিয়াছিল, সে রত্ন অপহৃত হইয়াছে! দেখিবে, যে প্রেম-প্রস্রবণে তোমার হৃদয় বিকশিত ও প্রফুল্লিত, সে প্রেম-উৎস শুকাইয়া গিয়াছে!—হায়! ইহাই দেখিবার জন্য আসিবে? মরিবার জন্যই গৃহে ফিরিবে?

আর তুমি অপরিণামদর্শী যুবক প্রকাশচন্দ্র! তোমার ঐ মাধুর্য্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, যে পবিত্রতাটুকু এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছ, তাহারই বলে কি তোমার এই সাহস? যে রূপের শিখা চক্ষের সমক্ষে অহর্নিশ জ্বলিতে থাকিবে,—পতঙ্গ তুমি,—তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? যাহাকে প্রলোভনের মাঝে তুমি ফেলিতে চলিয়াছ, তাহার প্রলোভন হইতে আপনাকে ঠিক রাখিতে সমর্থ হইবে? হায়! এ কিরূপ উন্মত্ততা,—কিরূপ পরীক্ষা? কাল-সর্পের সহিত ক্রীড়ার অভিলাষ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমর কিছুদিনের জন্য দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন। প্রকাশ তাঁহার বাটীতে অভিভাবক স্বরূপ হইয়া রহিলেন। তিন চারি দিন অতিবাহিত হইল, কাহারও মনে কিছু নাই। আকাশ মেঘশূন্য, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত, নীল; গঙ্গা অবাত-বিক্ষোভিত, তরঙ্গ-ভ্রুকুটী-বিহীন।

নির্ম্মলার এক পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম পার্ব্বতী। পার্ব্বতী বয়সে নির্ম্মলার অনুরূপ না হইলেও ব্যবহারে সমবয়স্কার ন্যায় ছিল। নির্ম্মলা সখীভাবে তাহাকে আদর ও যত্ন করিত। কিন্তু পার্ব্বতীর স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল না।

প্রকাশ যখন অমরের বাড়ীতে থাকিতেন, নির্ম্মলা পার্ব্বতীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন,—কখন কাছ-ছাড়া করিতেন না। আহারের সময় অগ্রে পার্ব্বতীকে আহার করাইয়া, পরে নিজে আহার করিতেন। তাহাকে এত যত্নে রাখিতেন। কিন্তু তবুও সকল সময় পার্ব্বতীকে পাওয়া যাইত না। তাহার নিজের প্রয়োজনেও সময়ে সময়ে তাহাকে ঘুরিতে হইত।

নির্ম্মলার হৃদয় নির্ম্মল, চিত্ত প্রফুল্ল এবং দেহ অপূর্ব্ব রূপ-রাশিতে প্রদীপ্ত। চিত্তের নৈর্ম্মল্য হইতে যে স্বর্গীয় প্রশান্ত রূপ জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সে সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মধুরকান্তি আরও শত গুণে বাড়িয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র আসিয়া যখন কোন কথা কহিতেন, নির্ম্মলা সুবিশাল স্নিগ্ধ আঁখি ভূমিপানে নত করিয়া, অতি ধীরে দুই চারিটি কথা কহিতেন। সে কথার ভঙ্গীতে, কথার প্রত্যেক বর্ণে, এত মাধুর্য্য বিকীর্ণ হইত যে, যে শুনিত সেই

মুগ্ধ হইত। প্রকাশের মনে হইত, নির্ম্মলার কণ্ঠস্বর যেন বীণার ঝঙ্কার! এ মধুর কণ্ঠস্বর শুনিলে কর্ণ-কুহর সুশীতল হয়। হৃদয়ে অমৃত-স্পর্শের ন্যায় অপূর্ব্ব স্পর্শ অনুভূত হয়। আর সে হাসি? সে মধুর অধরে মধুর হাসি যে দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারে না। সে ফুল্ল রক্তিম অধরে সে শুভ্র-হাসি দেখিয়া মনে হয়, বান্ধুলির উপর কে যেন শ্বেতপদ্ম বসাইয়া দিয়াছে! গঠনের সে সৌকুমার্য্য, প্রত্যেক অঙ্গ-বিক্ষেপের সে সৌকুমার্য্য, বচনরাশির সে সৌকুমার্য্য, হাস্যপ্রদীপ্ত অপূর্ব্ব মুখমণ্ডলের সে সৌকুমার্য্য,—রূপের উপাসক হইয়া যে দেখিয়াছে,—তাহার হৃদয়েই সে মূর্ত্তি-মধুরিমার ছায়াপাত হইয়াছে,—সে আর কখন তাহা ভুলিতে পারিবে না। প্রকাশচন্দ্র সেই রূপের প্রতিমা দেখিতেন,—দেখিতে দেখিতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া, নিভৃতে বসিয়া, সেই রূপের চিন্তা করিতেন। চিন্তামাত্র,—কিন্তু প্রকাশ বুঝিতেন যে, সেই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে এমন উন্মত্ততা আনিয়া দিবে, যাহার বেগ সংবরণ করা দেবতারও অসাধ্য! তবুও কি ছাই বুঝান যায়? নির্ম্মলার রূপ, নির্ম্মলার হৃদয়, নির্ম্মলার স্থৈর্য্য,—ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশের হৃদয় নির্ম্মলার রূপে ভরিয়া গেল। প্রকাশের অন্তর-বাহির নির্ম্মলাময় হইয়া গেল।

কিছুই বিস্ময়ের কথা নাই। হৃদয়ের এ ভাব একান্ত স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্যের প্রভাব,—কে কবে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে? জিহ্বা হয় তো মূক হইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু অন্তরের অন্তরে যে ভাষা ফুটিতেছে, সে ভাষায় কেবল সেই রূপের ধ্যান ও উপাসনা উচ্চারিত হইতেছে। চিন্তার জন্য এতটুকু অবসর দিতে নাই। চিন্তা না করিলে হয়ত হৃদয়ের এ দাবানল জলিয়া

উঠিতে পায় না। অনন্যেন্দ্রিয় হইয়া মনকে এমন একই ভাবে যে ডুবাইয়াছে, তাহার চিত্ত ভরিয়া, সে জ্বলন্ত রূপের শিখা যে, জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

তবু প্রকাশের ভাবা উচিত ছিল, নির্ম্মলা অনূঢ়া বালিকা নহে,—নির্ম্মলার চিন্তা তাঁহার ধ্যানপ্রাপ্য হওয়াও উচিত নয়। তার উপর সেই অকৃত্রিম সুহৃদ্ অমরের কথাও ভাবা উচিত ছিল। অমরের কি প্রবল বিশ্বাস, বন্ধুর উপর কতখানি নির্ভর! সে কথা ভাবিয়া, নির্ম্মলার ভাবনা তাঁহার মনে স্থান দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় নাই।

সে সকলই সত্য। কিন্তু উচিত বুঝিয়াও অনেক কাজ আমরা করি না, করিতে পারি না। মনকে সেদিকে পরিচালনা করা যেন একান্তই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। আর তা ছাড়া, প্রকাশ এখনও কোন পাপচিন্তা মনে স্থান দেন নাই;—রূপের ধ্যান যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাঁহার মনে এখন পর্য্যন্ত তাহাই বিদ্যমান। তবে এ কথা অবশ্যই বলা উচিত যে, ইহা করাও অধর্ম্ম, এবং ইহার পরিণাম ভাবিয়া প্রকাশের মনে এ চিন্তার অবসর না দেওয়াই উচিত ছিল।

প্রকাশ শেষে বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার বড় সামান্য নহে,—এ বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। তখন তাঁহার অমরকে মনে পড়িল, বাল্যের সেই সাহচর্য্য, সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা, কর্ণগড়ের ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সেই মধুর রাত্রে পরস্পরের সেই প্রতিজ্ঞা—আ ছি ছি! এই কি তাহার পরিণাম? অমরের সে অগাধ বিশ্বাস, বন্ধুর প্রতি সে অকৃত্রিম ভালবাসা,—এই কি তাহার প্রতিদান? প্রকাশ শিহরিলেন। তিনি আপনার

অবস্থা বুঝিলেন, নিজের হৃদয় দেখিলেন। দেখিলেন, হৃদয়ে একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে, কি একটা পঙ্কিল বাসনা-বহ্নির একটি ক্ষুদ্র কণাও জ্বলিয়াছে। প্রকাশ মরমে মরিয়া গেলেন। ভাবিলেন, "পলাইয়া যাই!—আমার মুখে হয়ত এ পাপ-হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে, এ মুখ আর দেখাইব না। অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া এ দেহ পাত করি।"

আবার নির্ম্মলার সে নির্ম্মল মুখমণ্ডল মনে জাগিল। রমণীমুখ-পদ্ম বিধাতা কি এতই সুন্দর করিয়া গড়িয়াছেন? তৃষাতুর আঁখিযুগল চির-জীবন কি অতৃপ্তই রহিয়া যাইবে? কেন এ মোহ? আর একবার—একবার দেখিবমাত্র, কেবল চোকের দেখা,—তারপর জন্মের মত বিদায় হইব!—নির্ব্বোধ প্রকাশ এইরূপ ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! ইহা কি কম বাতুলতা? আর একবার—একবারমাত্র দেখিবার লালসা কেন? আর একবার দেখিলেই কি পিপাসা মিটিবে? অনলে আহুতি কেন? এ কথা কে বুঝিবে? —পতঙ্গ অনলে পুড়িতে চলিল!

তখন সন্ধ্যাকাল। সন্ধ্যার আকাশে একটা খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়াছিল। সেই নক্ষত্র পানে চাহিয়া নির্ম্মলা যুক্তকরে মনে মনে কাহাকে কি জানাইতে ছিল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াটুকু সে সৌন্দর্য্য-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়া, একটু মধুর বিষাদ-রেখায় তাহা রঞ্জিত করিয়াছিল। প্রকাশ নীরবে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেও নির্ম্মলা দেখিতে পাইল না। প্রকাশ অনিমেষলোচনে সে মুখ-পানে চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইল।

আর একবার দেখিলেই না সাধপূর্ণ হইবে?

নির্ম্মলা যখন চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন, প্রকাশ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অমনি সচকিতে—সলজ্জ-অবস্থায় মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া, মুখখানি ভূমি পানে নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি কিছু বলিতে আসিয়াছেন?"

প্রকাশ কিছুই বলিতে পারিল না, নিতান্ত অপ্রতিভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সে ভাবের অর্থ কিছুই বুঝা গেল না। নির্ম্মলা কিছু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, প্রকাশের দৃষ্টি নিতান্ত অপরাধীর ন্যায়;—মুখ-খানাতেও সেই ভাবের ছায়া পড়িয়াছে। কৈ, এমন করিয়া তো প্রকাশ আর কখন চায় নাই? সে প্রতিভা-সমুজ্জল মুখ-মণ্ডলে এমন মলিন-ছায়া তো আর কখন পড়ে নাই?

নির্ম্মলা সহসা সব বুঝিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীজাতির পক্ষে এ ভাব বুঝিতে বড় বেশী সময় লাগে না। তখন তাঁহার মনে হইল, আজ দুই দিন হইতে প্রকাশ প্রায়ই বিনা-প্রয়োজনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া থাকে। প্রকাশের চক্ষু দুইটি চারি দিক্ ঘুরিয়া-ফিরিয়া যেন নির্জ্জন-স্থান খুঁজিবার অবসর দেখিত;—মুখখানা কি বলিব-বলিব করিয়া যেন বলিতে পারিত না।—এ সকল কেন? প্রকাশের মনে কি কোন কু-অভিসন্ধি আছে? তাহাও কি সম্ভব? তখন নির্ম্মলার বড় আতঙ্ক হইল। এ অসহায় অবস্থায় কি হইতে কি হয়, তাহা কে জানে? বড় একটা ভাবনা ও আতঙ্ক,—নির্ম্মলার বুকের মাঝে চাপিয়া বসিল। নির্ম্মলা কিছু বিরক্তির সহিত চলিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু উন্মত্ত প্রকাশ তখন পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নতজানু হইয়া

বসিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিল। তারপর—কি বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিল না, সাহস করিয়াও আর মুখপানে চাহিতে পারিল না।

নির্ম্মলা দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায়, প্রকাশের অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। সব বুঝিলেন। এখন ভয়ের সময় নহে,—সাহসের প্রয়োজন। অতি হিংস্রক জন্তু—ভীষণ ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও এ শ্রেণীর মানুষকে অধিক ভয় করিতে হইবে বটে, কিন্তু সাহসে বুক বাঁধিতেও হইবে। তখন সেই অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল; অনাথের নাথ দয়াময়ের নাম স্মরণ করিয়া,—সতীর সাহস বাড়িল। সেই অতি কোমল মূর্ত্তিতে সহসা কি কঠিন-ভীষণ এক মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। নয়নে যেন ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিল। সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু যেন অনলশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে দৃশ্যে মহাপাপী শিহরিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলা কাহাকে কিছুই বলিলেন না। পরিচারিকা পার্ব্বতীকেও কিছুই জানাইলেন না। কিন্তু এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকা আর উচিত নহে বিবেচনা করিয়া, স্বামীকে এক পত্র লিখিলেন ;—

"তুমি শীঘ্র আসিবে বলিয়া গিয়াছ, কিন্তু অনেক দিন হইল, আজিও তো ফিরিলে না! যদি আরও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে, আমাকে লইয়া যাও, কিংবা অনুমতি করিলে আমি পিত্রালয়েও যাইতে পারি।

"দুর্গ অসহায় অবস্থায় রাখিয়া দুর্গ-স্বামীর দূরে থাকা উচিত নহে। পদে পদে অজ্ঞাত-শত্রু-কর্ত্তৃক বিজিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

"সংসারের খ্যাতি ও যশ লোকের মুখে। মানুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না; মানুষের বাহির, বাহিরের কার্য্যাবলী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য্য হইতেই মানুষের নিন্দা ও সুখ্যাতির রচনা হয়। লোকের অতি সামান্য কথা হইতে যেমন প্রশংসা, তেমনি নিন্দারও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"তুমি যাহার অধীনে 'তোমার বলিবার' সকলই রাখিয়া গিয়াছ, তাঁহা হইতে তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে,—ইহাই আমার আশঙ্কা। দাসী ইহার অধিক বলিতে চাহে না। তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে বেশী বলিতেই বা হইবে কেন?"

যথাসময়ে অমরের নিকট এ পত্র পঁহুছিল। অমর বুঝিলেন, এবার তাঁহার বন্ধু যথার্থই তাঁহার কথা রাখিয়াছেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। অমর নির্ম্মলার পত্রের কোন উত্তর দিলেন না, বরং আনন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

এদিকে দুর্ভাগ্য প্রকাশ চিত্তস্থির করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ-তুফান উঠিয়াছিল, দেবতার সামর্থ্য পাইলেও, সে উদ্বেলিত উন্মত্ত হৃদয়কে শান্ত করা, তাহার দুঃসাধ্য হইত। হতভাগ্য সুবিধা ও অবসর বুঝিয়া, একদিন নির্ম্মলার কক্ষে প্রবিষ্ট হইল এবং আপনার হৃদয় গোপন করিয়া বলিল,— "তুমি সেদিন কেন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে, আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারি নাই, আমার অপরাধ কি? তুমি আমার বন্ধু-পত্নী, আমার সম্মান ও স্নেহের

পাত্রী তুমি। কখন কি তোমার প্রতি আমার সম্মানের কোন ত্রুটি হইয়াছে?"

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিলেন না।—নীরবে শুনিতে লাগিলেন। তখন প্রকাশ অল্পে অল্পে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল,—"যদি আমার অজ্ঞাতসারে আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আজীবন রূপের ভিখারী, রূপের ধ্যান আমার জীবনের ব্রত। তোমাতে যে অসীম রূপের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া থাকি, আমি তাহাতেই আত্মহারা হইয়াছি, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার রূপ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাই অহর্নিশ ঐ চির-শোভাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমি রূপোন্মত্ত হইয়াছি। আমার অপরাধ কি? পতঙ্গ অনলে ঝাঁপ দেয়—মরিবার জন্য, আমিও এই রূপের শিখায় মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি কে, আমি কে, তাহা জানি। কিন্তু যদি বুক দেখাইবার হইত,—দেখাইতাম, কি তুমুল সংগ্রামে আমি অনুক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছি!"

নির্ম্মলা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"আমি এক্ষণে একা আছি, পার্ব্বতীও এখানে নাই, এখানে আপনার এমনভাবে থাকা উচিত হইতেছে না। আপনি যাহা বলিলেন, এ সকল কি আমাকে আপনি বলিতে পারেন? আমার স্বামী না আপনাকে প্রাণের সমান ভাল বাসেন? তিনি না আপনাকে একান্ত বিশ্বাস করেন? এই কি তাহার পরিচয়?"

প্রকাশ। তুমি ও কথা আর বলিও না। আমি মরিতে বসিয়াছি,—মরিব। একবার শুনিয়া যাই, আমার এ হৃদয়াঞ্জলি, আমার আরাধ্য দেবতার চরণে স্থান পাইবে কি না?

নির্ম্মলা। আমার স্বামী এখানে উপস্থিত থাকিলে, এ কথা বলিতে আপনি কখনই সাহসী হইতেন না। আমাকে অসহায় পাইয়া আপনি এইরূপ বলিতেছেন। কিন্তু জানিবেন, ধর্ম্মই আমার সহায়,—ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিবেন!

প্রকাশ। আমার ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মকে আমি রক্ষা করি নাই, ধর্ম্মও আমাকে রক্ষা করিবে না—পশুর আবার ধর্ম্ম কি!

নির্ম্মলা। তবে, আপনি কি করিতে চান?

প্রকাশ। কি করিব,—বলিতে পারি না। আমি উন্মত্ত। হায়! কেন এ রূপের রাশি আমার চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য রূপ, ঐ লাবণ্যমণ্ডিত হাস্যপ্রদীপ্ত অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল,—আমাকে দেখাইয়াছিলে? কেন তুমি তোমার ঐ বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বরে, অপ্সরাগীতিবৎ সুধাবচনে,—আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে? তাহা না হইলে তো এ আগুন জ্বলিত না,—হৃদয়ে এ তুফান উঠিত না,—বন্ধুত্বের পবিত্র নামে এ মহাপাপের অনুষ্ঠান হইত না! যাহা হইবার হইয়াছে, আমি মরিতে বসিয়াছি;—একবার বলো—আমি দীন,—দীনের এ পূজা কি দেবতার অগ্রাহ্য হইবে?

উন্মত্ত যুবা সহসা নির্ম্মলার চরণ স্পর্শ করিল। নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "জানিলাম, তোমার মত মহাপাপী আর নাই। তুমি কোন্ সাহসে আমাকে স্পর্শ করিলে? তোমার স্পর্শে আমি কলঙ্কিত হইয়াছি।"

প্রকাশ। আর না, এই খানেই আমার পরীক্ষার সমাপ্তি।

নির্ম্মলা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। প্রকাশ বলিতে লাগিল,—

"তবে শুন ; তোমার স্বামী অমরই এই সর্ব্বনাশের মূল। তোমার প্রেমের পরীক্ষা গ্রহণই তাহার উদ্দেশ্য। প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও তোমার প্রেম অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থাকে কিনা, তাহাই সে দেখিতে চায়। সেই জন্যই এই অনুষ্ঠান। আমিও মূর্খ, নহিলে এ অনুষ্ঠানে ব্রতী হইব কেন? কিন্তু তোমার কাছে লুকাইব না,—আমি সত্য সত্যই মহাপাপী ; আমার চিত্ত অবশ, আমি কি করিতে বসিয়াছি, তাহা জানি ; শীঘ্রই এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তও আমি করিব। জানিলাম, তুমি মহা-মহিমময়ী, জগদ্ধাত্রিরূপিণী। তোমার প্রতাপ অসীম, তোমার গৌরবে—সতীর মাহাত্ম্যে, এ জগৎ পুণ্যতীর্থ। যাও সতি! সতীত্বের গৌরবে সংসার পুণ্যময় করো। যে চিতা আমি আপন বুকে সাজাইয়াছি, তাহাতেই আমি দগ্ধ হইব। এ মহাপাপীর নরকযন্ত্রণায় যদিও করুণ নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত হয়, তবে সে চিতার আগুন নির্ব্বাপিত হইবে। জন্মের মত বিদায় হই মা, সতীলক্ষ্মী!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলার চক্ষে অশ্রু বহিল। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রেমের পরীক্ষার জন্য এই হীনপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন! সহসা সে কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এত প্রেম, এত ভালবাসা,—ইহাতেও সন্দেহ! যে, স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না ; স্বামি-চিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা যাহার নাই ; তাহার

প্রেমের পরীক্ষা ! নির্ম্মলা এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অভিমানে ও দুঃখে মরমে মরিয়া গেলেন। তখন সেই প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে দারুণ অভিমান ও দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনে প্রাণ দ্রবীভূত হইল। নির্ম্মলা ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী আসিয়া সকল শুনিল। সে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু বুঝিয়াছিল। দুষ্টা রমণী প্রতিবাসীর গৃহে গৃহে গিয়া এই কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণন করিল। লোক-নিন্দায় চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। নির্ম্মলা সে সকল শুনিলেন। তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, যুক্তকরে দেবতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে ধর্ম্ম ! তুমি সাক্ষী ! আমি নিরপরাধ ! স্বামী ভিন্ন আমি কিছুই জানি না। স্বামি-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার মনে নিমেষের জন্যও স্থান পায় নাই। যদি একদিনের জন্যও আমার চিত্ত অবশ হইয়া থাকে,— তবে হে অন্তর্যামি ! এখনই আমার মস্তকে বজ্রপাত করো !— যেন জন্মজন্মান্তরেও আমি সুখী না হই ;—যেন নরকেও আমার স্থান না হয় !"

দুষ্টা পার্ব্বতী বলিল,—"তা মা ! কাঁদিয়া কি করিবে ? কাঁদিলেই কি লোক-নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ? এ সকলের মূলে বাবুর দোষ ;—তিনি এমন না করিলে তো কিছুই হইত না !"

নির্ম্মলা। না পার্ব্বতি ! দোষ তাঁহার নহে। তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। আমার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল। তাঁহার অত গুণ ; আমার অদৃষ্টদোষেই আমি এই মনস্তাপ পাইলাম। হায় ! কেন আমি ইহা পূর্ব্বে বুঝি নাই ? কেন আমি আপনা খাইয়া তাঁহাকে যাইতে দিলাম ?—হায় প্রভু, তুমি যদি একবার বলিতে,—'আমি তোমার প্রেমের পরীক্ষা চাই ;'—আমিই তোমাকে সে পরীক্ষা

দিতাম। কেন তুমি আমায় ভীষণ দারিদ্র্য ও শত অভাবের মাঝে ফেলিয়া দেখিলে না? কেন তুমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় দুর্ব্যবহার করিয়া দেখিলে না? কেন তুমি আমায় সঙ্গে করিয়া হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যে লইয়া গেলে না? ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া দেখিলে না কেন? আমার শত সাধ, শত আশায় ছাই দিয়া, কেন দেখিলে না? হায় প্রভু! আমি যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না! আমার এ ক্ষুদ্র বুকে যত প্রেম, সে সবই তো তোমায় দিয়াছি;—তাহাতেও কি তোমার মন উঠিল না? এখন একবার আসিয়া দেখিয়া যাও,—আমার অদৃষ্টে বিধাতা কি লিখিয়াছিলেন!

পার্ব্বতী। কিসের দুঃখ মা! তুমি কাঁদিও না। বাবু আসিলেই সব চুপ-চাপ হইয়া যাইবে।

নির্ম্মলা। পার্ব্বতি! আমার এ যে কি দুঃখ, তাহা তুই বুঝিবি না। পৃথিবীতে আমার যদি কিছু চিন্তা থাকে, তো সে স্বামী। যদি কিছু সুখ থাকে, তো সে স্বামী। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কি আছে? স্বামী-দেবতার চরণে এ দেহ-মন বিকাইয়াই আমি নারীজন্ম সার্থক করিয়াছি!—সে দেবতা আমায় চরণে ঠেলিলেন না,—অথচ আমার নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আমায় সে স্বর্গ হইতে স্থানভ্রষ্ট করিল!

পার্ব্বতী। কি জানি মা! কখন স্বামী জানি নাই, স্বামীর মর্ম্মও বুঝি নাই।

নির্ম্মলা। কি কলঙ্কের কথা! চারি দিকেই লোক-নিন্দা! হে নাথ! তুমি একবার এস, এ কলঙ্ক হইতে আমায় উদ্ধার করো। তুমি চরণে স্থান না দিলে, এ কলঙ্ক হইতে আমার উদ্ধার

নাই।—পার্ব্বতি! যখন তিনি আসিয়া এই সকল শুনিবেন,—কি মনে করিবেন! আমার কথায় কি তিনি বিশ্বাস করিবেন?

পার্ব্বতী। কি জানি মা! পুরুষের মন বুঝিবার যো নাই। গ্রামশুদ্ধ লোক যেরূপ হাসি-তামাসা করিতেছে, তাহাতে তিনি কি আর মুখ দেখাইতে পারিবেন? তবে তিনি তোমায় ভাল বাসেন,—লোকের কথায় কি আর তোমায় ত্যাগ করিবেন?

নির্ম্মলা। তুমি কি বলিতে চাও,—আমার জন্য তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না,—তবু আমি তাঁহার কণ্টক হইয়া থাকিব? না, তা হইবে না। পার্ব্বতি! সতীত্বের বাড়া, স্ত্রীলোকের আর ধর্ম্ম নাই। যে নারীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীরও অধমা। সতীত্বের গৌরবেই নারীর গৌরব। যে তাহাতে কলঙ্ক কিনিল, তাহার আর রহিল কি? ধর্ম্ম জানেন, আমি সতী কি কলঙ্কিনী! কিন্তু পার্ব্বতি! যখন এ কলঙ্ক রটিয়াছে,—আমার সতী-নাম ডুবিয়াছে,—তখন আমি এ কলঙ্কে আর আমার স্বামীকে স্পর্শ করিব না।

পার্ব্বতী। এত শত আমরা জানি না মা! পাপ পুণ্যি ও সব ভদ্রঘরের কথা—আমরা তার কি বুঝিব? যদি বাবুকে আর না চাও, তবে কোথায় যাইবে?

নির্ম্মলা। আর যাইব কোথায়? স্বামীই গতি, স্বামীই আশ্রয়;—সে আশ্রয় ছাড়িয়া আর যাইব কোথায়?

নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"শোন্ পার্ব্বতি! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আর বুঝি আমি বাঁচিব না। আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যদি তিনি আসিয়া লোকের কথায় বিশ্বাস করেন?"

পার্ব্বতী। সেটি হইবে না। আমি এমন মেয়ে আর কোথাও দেখি নাই! বাপ্‌রে, স্বামী ব'লে কি এত ভক্তি, এত ভালবাসা!—না বাপু, আমি এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। তোমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া লোকের কথায় বাবু বিশ্বাস করিবেন? বাবু আমার এমন পাষণ্ড নন!

নির্ম্মলা। পার্ব্বতি! তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি এ মুখ আর তাঁহাকে দেখাইব না। আমায় তিনি অবিশ্বাস করিয়াছেন, আমার প্রেমের পরীক্ষার জন্যই তিনি এই কলঙ্ক কিনিয়াছেন। আমি বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি আরও কলঙ্কী হইবেন,—লোকের কাছে তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আমি জানি, তিনি মহৎ;—সহস্রগুণে গুণবান্। আমায় তিনি চরণে ঠেলিবেন না, তাহাও জানি; তবু তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমার মরণই মঙ্গল।

পার্ব্বতী। ও কি কথা মা!—ছি! ও কথা বলিতে নাই। আত্মহত্যা মহাপাপ!

নির্ম্মলা। তা জানি মা! তবু এ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভালো। চির-জীবন লোকের উপহাসের সামগ্রী হ'য়ে থাকা কি ভালো? যদি আমার কন্যা হয়, অসতীর কন্যা বলিয়া তাহার বিবাহ হইবে না। বল্ মা, তাহাই দেখিতে কি বাঁচিব? যদি আমার পুত্র হয়, সকলে তাহার জন্মের কথা তুলিয়া উপহাস করিবে;—বাছা আমার তখন লজ্জায় মরিয়া যাইবে;—বল্ মা! তাহাই দেখিবার জন্য কি বাঁচিব?

পার্ব্বতী। তার চেয়ে মরা ভালো।

নির্ম্মলা। আরও দেখ্, যার জন্য সংসার, যার জন্য আমার

জীবন, যার জন্যই সব,—যদি তারই কলঙ্ক রটিল, বল্ মা! তবে আমার জীবন ধারণে কি ফল? আমি মরিলে আমার সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্ক বিলুপ্ত হইয়া যাইবে;—তিনি সুখী হইবেন।

পার্ব্বতীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। তাহার যৌবনের নদীতে ভাটা পড়িয়াছে, তবু এখনও তাহার নেশা ছুটে নাই। আজ নির্ম্মলার এই কথা গুলার মধ্যে কি ছিল কে জানে,—কথাগুলা তাহার বুকে বিধিল। সেও যেন তাহার জীবনে বড় কলঙ্কের ছায়া দেখিল। নির্ম্মলা সতী, কলঙ্ক তাহার লোক-রচনা মাত্র; কিন্তু পার্ব্বতী অসতী—সতী-বাক্যে সেই অসতীর প্রাণও আজ কাঁপিয়া উঠিল।

অসতীর সে হৃদয়ের অবস্থা আর বুঝাইয়া কাজ নাই। বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। একই পথে চিরপ্রবাহমানা স্রোতস্বতী এক-দিনেই তাহার গতি অন্যত্র ফিরাইতে পারে। পার্ব্বতী আপনার অবস্থা ভাবিয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—"এর চেয়ে মৃত্যু ভালো!"

উভয়েই স্ত্রীজাতি, উভয়ের সিদ্ধান্ত একইরূপ হইল।

নির্ম্মলার চক্ষের জল থামিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"মরিব পার্ব্বতি! কিন্তু একটিবার তাঁহাকে দেখিয়া মরিতে সাধ হয়। একবার তাঁহার কাছে শুনিয়া যাইতে সাধ হয়,—আমার এই প্রেমের পরীক্ষায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না! আর একটা কথা শুনিবার সাধ আছে। লোক-নিন্দা যেরূপ রটিয়াছে, তাহাতে তিনি অবিশ্বাস করিয়া হাসিমুখে আবার আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন,—তাহাই শুনিতে, ইচ্ছা করে। তোকে বলিতে কি পার্ব্বতি! আমার স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা। তুই নিন্দা করিস্ নে; এ আমার অদৃষ্টের ফল, পূর্ব্বজন্মের

দুষ্কৃতি,—তাঁহার কিছুই দোষ নাই। তবে এই আমার বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে, আমি সাধ পূরিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এখন এস, অমরচন্দ্র! তোমার প্রেমের পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। তোমার জীবনের এই পরিচ্ছেদ দেখিয়া আমিও আমার দুঃখময়ী লেখনীর অবসর আবার দেই।

অমর ইতিপূর্ব্বে মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রতিদিন বাটীর সংবাদ পাইবার জন্য, তিনি এক বিশ্বস্ত অনুচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই অনুচর গোপনে সকল সংবাদ লইয়া আসিত। এইরূপে প্রতিদিনের ঘটনা অমরের কর্ণগোচর হইত।

একদিনের ঘটনা অমর শুনিতে পাইলেন না, সে অনুচর সেদিন চম্পানগর হইতে ফিরিল না। অমরের মনে নানা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। বুকের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল। লোকে যে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বংশে কলঙ্ক তুলিয়া, তাঁহার সতী সাধ্বী ভার্য্যার নামে অখ্যাতি রচনা করিয়াছে,—সে সকলই তিনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার বোধ হইল, সে কলঙ্কভার অতি গুরুতর বুঝিয়া, তাঁহার জীবন-প্রতিমা তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর সেই গৃহ-লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে তাঁহার শূন্যমন্দির সহসা ভূমিসাৎ হইয়া লুপ্তচিহ্ন হইয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, অন্ধকারে জ্ঞান-হারা হইয়া তিনি যেন দেখিলেন, তাঁহার পদতলে গঙ্গা

বহিতেছে,—গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে নির্ম্মলার নির্ম্মল দেহ ভাসিতেছে,—ভাসিতে ভাসিতে নির্ম্মলা তাঁহার চরণস্পর্শের জন্য কোমল হাত বাড়াইতেছে।—হতভাগ্য অমর এবার শিহরিয়া উঠিল!

তারপর ভাবিতে লাগিল,—"একদিন সংবাদ না পাইয়া মনে কেন এত অশুভ-চিন্তা জাগিতেছে? যদি তাহাই হইয়া থাকে? না, তা কেন হইবে? নির্ম্মলা তো জানিয়াছে, ইহা আমার পরীক্ষা মাত্র।"

হায়, মূর্খ অমর! পুস্তক পড়িয়াছ, রমণীহৃদয়ের রহস্য বুঝ নাই!

অমর আর কালবিলম্ব না করিয়া দিবাবসানে গৃহে ফিরিলেন। লোকসমূহ কৌতুকে, বিস্ময়ে, দুঃখে,—তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তিনি সাহস করিয়া কাহারও পানে চাহিতেন পারিলেন না,—দ্রুতগতিতে গৃহে গেলেন।

কেহ কোথাও নাই।

চারি দিক্ খুঁজিয়াও কাহাকে পাইলেন না। তখন শিরে করাঘাত করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া বসিলেন। নিতান্ত নিকট-প্রতিবাসী একজন আসিয়া সংবাদ দিল,—"নির্ম্মলা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে।"

অমরের চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু ঝরিল না। সে মুখে একটিও কথা উচ্চারিত হইল না।

পার্ব্বতী কোথায় ছিল, সহসা আসিয়া আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল;—তবু অমর নিশ্চল পাষাণখণ্ডের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। পার্ব্বতী তারপর গালিবর্ষণ করিতে লাগিল,—

"মূর্খ তুমি,—পাষণ্ড পামর পিশাচ তুমি! হাতে করিয়া সোণার

প্রতিমা তুমিই ডুবাইয়া দিলে!—হতভাগ্য, আর কি দেখিতে আসিয়াছ? ফিরিয়া আসিলে কেন? শুনিলাম না কেন, পথেই তোমার মৃত্যু হইয়াছে? মা,—মা, আমার সোণার মা,—এমন লক্ষ্মী কি হয়? এমন সতী-সাধ্বী, বানরে চিনিবে কেন? মা লক্ষ্মী, তুই যে, ঘর আলো ক'রে ছিলি মা! কোথায় গেলি,—আমি আর চেয়ে দেখ্তে পাচ্চি না! মাগো, তোমা বিনে সব অন্ধকার! আয় মা, গঙ্গার গর্ভ থেকে উঠে আয়! মিথ্যা লোক-নিন্দা থামিয়াছে! আজ সকলেই তোর জন্য কাঁদিতেছে মা!—প্রভু! তুমি আমার মনিব, তোমায় আর কি বলিব,—তোমার সেই হতভাগ্য বন্ধু যেমন সতীর পবিত্র নামে কলঙ্কের কারণ হইয়া জ্বলিয়া মরিয়াছে, তুমিও তেমনি——না, মরিয়া কাজ নাই, মরিলেই তোমার সকল জ্বালা জুড়াইবে—না, মরিয়া কাজ নাই।—মরিব——আমিও মরিব মা! আমি অসতী, তোর্ পুণ্যে মা আমায় উদ্ধার করিস্!"

উন্মাদিনীবেশে পার্ব্বতী চলিয়া গেল। তবু অমর সেই খানে নিশ্চল স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। তাল বাঁধিয়া চতুর্দ্দশীর অন্ধকার নামিয়া আসিল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। এই সময় প্রতিবাসী দুই চারি জন আসিল। সান্ত্বনার কথা বলিল। হতভাগ্য অমর স্থির অসাড় প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

তারপর সহসা প্রবল ঝড় উঠিল। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা গৃহে ফিরিল, একজন অমরকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্ষুণ্ণমনে সে চলিয়া গেল।

প্রবল ঝড় আসিল, ঝড়ের স্কন্ধে চাপিয়া বৃষ্টি নামিল। সে ঘন নিবিড় অন্ধকারে, সে প্রবল ঝড়ে,—অমরের ভ্রূক্ষেপ নাই। দুর্ভাগ্য অমর সমান ভাবে বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে প্রতিবাসীগণ আবার আসিল। দেখিল, অমর যেখানে যেমন ভাবে বসিয়াছিল, সেইখানে ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছে। মাথার উপর দিয়া প্রবল ঝড় বৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে; তথাপি সেই একই ভাবে বসিয়া আছে। কেহ বুঝাইতে আসিল, কেহ উপদেশ দিতে লাগিল, কেহ ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বলিল;—অমর তথাপি নীরব, নিশ্চল, স্থির। সে করুণ দৃশ্যে এক জনের হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। সে অমরের নিকট গিয়া অমরকে তুলিবার জন্য অমরের করস্পর্শ করিল। দেখিল, অঙ্গ শীতল, দেহ অবশ,—অমরের মৃতদেহ বসিয়া আছে!

একটি চিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতালের সংসার। অতি কষ্টে দিন চলে। কোনদিন উপবাস, কোনদিন অর্দ্ধাশন। চারিটি অপোগণ্ড শিশু লইয়া, অভাগিনী অশোকা বড়ই বিপন্না। হতভাগ্য স্বামী দিনান্তেও তত্ত্ব লয় না। ভিক্ষান্নে আর কয়দিন চলে?—এক আধদিন নয়,—নিত্য। ভাবিয়া ভাবিয়া অশোকার সোণার বর্ণ কালি হইয়াছে। অভাগিনী, সোণার চাঁদ শিশুগুলির মুখপানে চায়, আর তাহাদের ক্ষুধাতুর কাতর ভাব দেখিয়া, শিরে করাঘাত করে। শতধারে অশোকার বুক ভাসিয়া যায়। হতভাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে,—"নারায়ণ! দাসীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অশোকার বড় ছেলেটির বয়স দশ বৎসর। নাম—অনিল। অনিল এই বয়সেই মায়ের দুঃখ বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অকূল পাথার। ছোট ভাই বোন্ গুলি ক্ষুধায়

কাঁদিলে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করে; নিজে না খাইয়া সঞ্চিত খাদ্য হইতে তাহাদিগকে খাইতে দেয়; কখন বা তাহাদিগকে কোলে-পিঠে করিয়া, এ-বাড়ী, ও-বাড়ী একটু খাবার মাগিয়া বেড়ায়। সে দৃশ্য দেখিয়া অশোকার চোকে জল পড়ে। অশোকা মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন,—"বাবা আমার! তোমা হ'তে যেন সুখী হই!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, অশোকার কোলের-মেয়েটি অবধি এক ঝিনুক দুধ পায় নাই। ক্ষুধায় সে, ধুকিয়া পড়িয়াছে। অনিলের-ছোট—ভাই বোন্ দুটিও অনাহারে ছটফট করিতেছে। আজ অশোকা, একবারে সম্পূর্ণ-রূপ নিরাশ হইয়াছেন। নিরাশ হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। পার্শ্বে অনিল উপবিষ্ট। অনিল, তাহার কোমল হাত খানি এক একবার মায়ের চোকে বুলাইতেছে ও অতি কষ্টে, রুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছে,—"কাঁদ কেন মা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে দ্বারদেশে আসিয়া এক ভিখারিণী ভিক্ষা মাগিল,—"মাগো! দুটি ভিক্ষা পাই!"

সে করুণস্বর, অশোকার কাণে বাজিল। শতগ্রন্থিময় ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া ভূমে শায়িতা ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু

দুইটি পরিষ্কার করিয়া গদ্গদ-কণ্ঠে, তদধিক করুণস্বরে কহিলেন, "মা! আজ এস,—চা'ল বাড়ন্ত।"

সবটা কথা মুখ হইতে বাহির হইতে-না-হইতে, টস্‌টস্ করিয়া দুই ফোঁটা চোকের জল পড়িল।

এ দৃশ্য দেখিয়া ভিখারিণীর হৃদয় দ্রব হইল। সে, আরও করুণস্বরে কহিল,—"কাঁদিতেছ কেন মা?"

অশোকা, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "না বাছা! ও কিছু নয়!"

ভিখারিণী কি ভাবিতেছিল; কি সন্দেহ করিতেছিল; তাহার সে সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিল, "না মা! আমাকে গোপন করিতেছ!—আজ বুঝি কাহারও আহারাদি হয় নাই?"

অশোকা মুখখানি নত করিলেন। চক্ষু হইতে আবার দুই ফোঁটা জল পড়িল। তখন ভিখারিণী, আপনা হইতে উত্তর পাইল। দুর্ভাগ্য পরিবারের সকল দুঃখ বুঝিল। মনে মনে কহিল,—"ভগবান্! আজ কি এতগুলি জীবের কপালে অনাহার লিখিয়াছ?"

ভিখারিণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে অশোকাকে কহিল, "মা! যদি অপরাধ না লও, তবে এই চা'ল ক'টিতে ছেলেদের এক মুঠা ভাত রেঁধে দাও। আমি বৈষ্ণব,—কোন অজাত নই মা!"

ভিখারিণী ভিক্ষার চা'ল ক'টি ভূমে রাখিল। অশোকা নিষেধ করিলেন। কহিলেন, "না মা! তোমার চা'ল তুমি নিয়ে যাও। আমাদের যা হয়—"

ভিখারিণী বাধা দিয়া কহিল, "যা হয় কেন মা? নিত্য তোমাদের নিয়ে খাই, আর একমুঠা একদিন রেখে যেতে পারি না? না হয়, আর একদিন এসে চা'ল ক'টি ফিরে নিয়ে যাব।"

ভিখারিণী, ত্বরিত-পদে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনিল এতক্ষণ অবধি চুপ করিয়া ছিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছল-ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিল,—"মা! ভিকিরী পাঁচ-দোরে ভিক্ষে কোরে খায়;—আজ সেই ভিকিরীর ভিক্ষের-ভাত আমাদের খেতে হবে?"

বালক, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যাই দেখি, বাবার কাছে;—তিনি কি বলেন!"

এবার অশোকাও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের মুখ-চুম্বন করিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন,—"বাপ আমার! কোথায় যাবি তুই? তিনি কি আর তাঁর আছেন? থাক্‌লে কি আজ তোদের এই দশা?"

"তা হোক্ মা,—একবার আমি যাই।"

"দুপুর গড়িয়ে গেছে;—এখনো অবধি, দুধের ছেলে তুই,—তোর পেটে এক ফোঁটা জল পড়েনি;—কেমন কো'রে অতটা পথ যাবি বাবা? বরং আমি রাঁধি,—দুটি খেয়ে যা।"

অশোকা, পুত্রের অঙ্গে পদ্মহস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনেক প্রবোধ দিলেন। অনিল, সে প্রবোধ মানিল না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া, সে, পিতার উদ্দেশে গমন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ একজন ঘোর সুরাপায়ী। বাপের অনেক ধন-সম্পত্তি ছিল, একে একে সব খোয়াইয়াছে। শেষে পরিবারদিগকে পথে বসাইয়াছে। পাড়ার জমিদার-বাবুর বৈঠক-খানায়, হতভাগা সুরাপানে উন্মত্ত;—এদিকে দুধের ছেলেগুলি অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। দিনান্তেও একবার তাহাদের খোঁজ লয় না। পতিব্রতা অশোকা, নিষ্ঠুর স্বামীর এ মর্ম্মান্তিক ব্যবহার, অম্লানবদনে সহ্য করেন; আর বিষাদে বিরলে ইষ্টদেবতার চরণে দিবানিশি কাঁদিতে থাকেন। তাহাতে মনের ভার অনেকটা লাঘব হয় বটে, কিন্তু অনাহার-ক্লিষ্ট শিশুগণের সে মলিন মুখ দেখিয়া, বুকটা এক একবার হু হু করিতে থাকে। তখন দেহ-ভার একান্ত অসহ্য হয়।

সুকুমার অনিল, ধুকিতে ধুকিতে, অতি কষ্টে পিতার সম্মুখীন হইল। হতভাগ্য পিতা, তখন জমিদার-বাবুর সহিত "দুনিয়া ফাঁক্" দেখিতেছিল। আরও দুই চারিজন পারিষদ চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, বাবুর মজ্‌লিস সরগরম করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনারও ত্রুটি ছিল না। বিলাস-মণ্ডপে রসের স্রোত বহিতেছিল।

এমন সুখের সময়ে, এমন রঙ্গ-রসের 'গররা'র মুহূর্ত্তে, ম্লানমুখে অনিল সহসা আবির্ভূত হইয়া, সে সভার শান্তিভঙ্গ করিল। পুত্রের এ বেয়াদবি, পিতার অসহ্য হইল। ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে, কর্কশ-কণ্ঠে পিতা কহিল,—"হতভাগা! এখানে এসেছিস কেন?"

নিষ্ঠুর পিতার কঠোর ভর্ৎসনা, ক্ষুধাতুর শিশুর বুকে বড়ই বাজিল। বালক জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, সভয়ে, সঙ্কুচিত-

ভাবে কহিল, "বাবা! এখনও অবধি আমরা কিছু খাই নাই। খুকিটি অবধি এক ঝিনুক—"

মুখের কথা মুখেই লীন হইল। পাপিষ্ঠ পিতা বাধা দিয়া আরও কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, "তা, এখানে ম'ত্তে এসেচিস্ কেন?—দূর হ।"

অনিল অতি কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া, মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া আবার কহিল, "বাবা! তবে কি আমরা না খেয়ে মর্‌বো?"

পাপিষ্ঠের আর সহ্য হইল না। পাঁচ ইয়ারে মজ্‌লিসে বসিয়াছে,—তাহাদেরই সম্মুখে ঘরের কথা বাহির হইল! পাষণ্ড অমনি টলিতে টলিতে উঠিয়া, সেই ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট, কচি-ছেলেটির বুকে মর্ম্মান্তিক পদাঘাত করিল।

"মাগো!" বলিয়া বালক ধরাশায়ী হইল। মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল।—ওকি, এক ঝলক রক্তও যে!

অমনি সপ্রভু পারিষদবর্গ ত্রস্তভাবে "কি করো,—কি করো" বলিয়া, মত্তপায়ী উন্মত্ত পিশাচকে ধরিয়া ফেলিল। পিশাচ, আরক্ত-লোচনে, জড়িতস্বরে কহিল, "দেখ দেখি, বেটার আস্পর্দ্ধা! পুটে-খানেক ছেলে,—বাড়ী ব'য়ে, এখানে এসে, আমায় দীক্ ক'চ্চে।"

অতঃপর পিশাচ, সরলা সহধর্ম্মিণীকে উদ্দেশ করিয়া, একটা অকথ্য কটু-বাক্য প্রয়োগ করিল। অমনি পিশাচ-মহলে, একটা "বাহবা"-রব পড়িয়া গেল।

জমিদার-বাবু কি ভাবিয়া, কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া, একটি টাকা আনাইলেন। পরে কহিলেন, "একটা চাকর দিয়ে এই টাকাটা অমরের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অতঃপর অনিলের প্রতি মুরুব্বিয়ানা-চালে কহিলেন, "যাও হে ছোঁক্‌রা!—বাড়ী যাও।—ওঠ।"

অনিল তখনও ধরাশায়ী; উত্থানশক্তিরহিত। অতি কষ্টে, "আঃ উঃ" করিতেছে। পিশাচ-পিতা আবার এক ধমক দিল। বালক, উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেই পারিল না। আঘাতটা সাংঘাতিক হইয়াছে। অগত্যা, বালককে কোলে করিয়া বাটী রাখিয়া আসিতে, জমিদার-বাবু, সেই ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্যও অতি সভয়ে, সন্তর্পণে, কোনও রকমে সেই মুমূর্ষু বালককে, তাহার মায়ের নিকট পঁহুছাইয়া দিল। বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া, অশোকা, প্রাণ-পুত্তলিকে কোলে লইয়া বসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরি হরি! মায়ের নিধি মায়ের কোলে শুইয়া, অতি কষ্টে দুই চারিবার "মা" নাম ডাকিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষুও স্থির হইল। অশোকা বুঝিলেন,—পুত্রের অন্তিমকাল উপস্থিত। তিনি একদৃষ্টে, পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সে চোকের পলক আর পড়ে না। এইবার চিরদিনের মত মাতা-পুত্রের চারি চক্ষুর মিলন হইল। সে চারিটিই ডাগর চক্ষু। যেমনি একজনের চক্ষু ফাটিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া, দুই চারি ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল,—হরি হরি হরি! অমনি আর এক জনও অনন্তকালের জন্য দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল! ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও সে চক্ষু আর খুলিবে না।

দুই ভাই

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সবিতা ও সুপ্রভাত দুই ভাই। দুই ভায়ে বড় ভাব, বড় ভালবাসা। কেহ কাহারও চ'খের অন্তরাল হয় না; নিমেষের বিচ্ছেদ উভয়কেই ব্যথিত করে। কৈশোরের সেই খেলা-ধূলা হইতে আরম্ভ করিয়া, এখন পঠদ্দশা অবধি, উভয়ের প্রণয়-স্রোত সমান টানে বহিতেছে। হিংসা, দ্বেষ বা কপটতা বিন্দুমাত্রও নাই;—উভয়েই সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি।

সবিতা জ্যেষ্ঠ, সুপ্রভাত কনিষ্ঠ। সবিতার বয়স একাদশ, সুপ্রভাতের দশ। দুটি 'পিটোপিটি' ভাই;—বাপ-মায়ের বড় আদরের। সাত নয়, পাঁচ নয়,—এই দুটি মাত্র ছেলে;—ছেলে দুটি আবার অধিক বয়সের;—সুতরাং বাপ-মায়ের আর আনন্দের অবধি নাই। দুটিতে দেখিতেও বেশ শ্রীমান্;—গৌরকান্তি, চাঁদ-পানা মুখ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল চক্ষু; তদুপরি সুকুঞ্চিত কেশ-রাশিতে বালক দুটিকে বস্তুতই লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। জনক জননী সুকুমার শিশুদ্বয়ের অতুল রূপরাশি দেখিয়া, সংসার ভুলিয়া যাইতেন।

ইহা তো গেল বাহ্য-সৌন্দর্য্যের কথা ; বালকদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য আরও মনোহর, আরও প্রীতিপ্রদ। ধর্ম্মে বিশ্বাস, গুরু-জনে ভক্তি, বালক-বালিকায় স্নেহ, দীন-আতুরে দয়া ; ব্যথিতে সহানুভূতি,—বালকদ্বয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত। পরের মর্ম্ম-কথা বুঝিতে, পরের মর্ম্মব্যথা বুঝাইতে, দুটি ভায়ে বিশেষ অভ্যস্থ। রূপেগুণে সবিতা ও সুপ্রভাত,—সকলেরই স্নেহের পাত্র। প্রতিবাসী আত্মীয়-কুটুম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, পথের পথিক অবধি, ছেলে দুটিকে ভালবাসে। ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিয়া, ছেলে দুটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়। এ দৃশ্য দেখিয়া, জনক-জননীর চক্ষে, অজ্ঞাতে, দুই এক বিন্দু জল পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বেশ্বর বসু একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি ছিল ; তাহারই উপস্বত্ব হইতে তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করেন। তাহা ব্যতীত পূর্ব্বতন চাকরীর আয়ও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে। তাঁহার পত্নী সত্যবতী বড় সুগৃহিণী ; তাই আয় অল্প হইলেও, সাংসারিক ব্যয়,—বেশ সুশৃঙ্খলে সমাধা হইত। বিশেষ, বসুজ-মহাশয়ের পরিবারও কম। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ, আর ঐ ছেলে দুটি। সত্যবতী সুমাতা ; তাই, অতিরিক্ত স্নেহ করেন বলিয়া, প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের প্রতি, মায়ের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। এই শৈশবেই পুত্রদ্বয়ের লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। সবিতা ও সুপ্রভাত, গ্রামস্থ রামনগর বিদ্যালয়ে পাঠ করি-

সোণার চাঁদ বালক দুটি, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

দুই ভায়ে এক শ্রেণীতেই পড়ে। তাহাদের দুজনকে দেখিলে 'যমজ' বলিয়া বোধ হয়। দুটিতে একত্র বসিত, এক সঙ্গে বেড়াইত। দুজনের বেশ-ভূষাও একরূপ। দুই ভায়ের প্রকৃতি বুঝিয়া এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির আধিক্য দেখিয়া, বসুজ-মহাশয় ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে ঠিক একইরূপ পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিতেন। সবিতা ও সুপ্রভাত, সুকুমার অঙ্গে সেই একই রকমের কাপড় চাদর, জামা জুতা পরিধান করিয়া, প্রীতমনে বেড়াইত; সেই একই রূপ বেশে পরস্পর পরস্পরকে বড় সুন্দর দেখিত।

সবিতা দেখিত, সুপ্রভাত,—তাহার প্রাণের ভাই সুপ্রভাতই বটে। প্রাতঃকালের স্থায় নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, প্রশান্ত, শান্তিপূর্ণ তাহার মুখখানি। সে অনির্ব্বচনীয়, সরল মুখারবিন্দে, সুপ্রভাতের সমগ্র প্রকৃতিখানি খুলিয়া রাখিয়াছে। সবিতা ভাবিত,—"এমন প্রেমময় মুখ বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। সুপ্রভাতের জন্ম কি না করা যায়?" আর সুপ্রভাত দেখিত,—সবিতা,—তাহার জ্যেষ্ঠ,—তাহার জীবনসর্ব্বস্ব সহোদর,—জগতে অতুলনীয়। বুঝি, সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও, সে, সবিতাকে ছাড়িতে পারে না। সবিতার সে উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃ,—প্রতিভার সে মোহন মূর্ত্তি;—পক্ষান্তরে তাহার সে অকৃত্রিম ভালবাসা, সে প্রগাঢ় প্রেম, সে মধুর মিলন, সে প্রাণে-প্রাণে বন্ধন,—বালক সুপ্রভাত মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিত না; জ্যেষ্ঠের রূপ-গুণ অহর্নিশ তাহার অন্তরে জাগরূক থাকিত।

"অনেকের অনেক ভাই দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভাই,—এমন টিতে এক,—আর কোথাও দেখি নাই!" এ কথা, যে সে, যখন-যখন বলিত। কথা, পিতা-মাতার কাণে উঠিত; তাহাতে তাঁহাদের যে কি সুখ, কেবল তাঁহারাই বুঝিতেন।

আর সেই বালকদ্বয়?—তাহারা এ কথা শুনিয়া, অবাক্ হইয়া, মনে মনে হাসিত; পরস্পর পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য্যভাবে চাহিয়া থাকিত। বুঝি মনে মনে বলিত,—"ভাইকে ভাই ভাল-বাসে, স্নেহ করে, এ আর একটা বেশী কথা কি? যাহার প্রাণ-বিনিময়ে প্রাণ বলি দেওয়া যায়; যাহাদের দুই প্রাণ এক, অভেদ আত্মা; তাহাদের এ সামান্য একটু ভালবাসা দেখিয়া, লোকে এত ভালো বলে কেন? ইহা ছাড়া ভাইকে অন্যরূপে দেখা যায় নাকি?"

দুটি ভায়েরই মনোভাব এইরূপ। প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের এ মধুর-মিলন দেখিয়া জনক-জননী পরমানন্দ ভোগ করিতেন। সর্ব্বেশ্বর ভাবিতেন,—"স্বর্গ আর কোথায়? সবিতা-সুপ্রভাতকে লইয়া সংসার করিতেছি,—এই আমার স্বর্গ। এইভাবে চিরদিন যাক, আমি আর অন্য স্বর্গ চাহি না।"

সত্যবতী ভাবিতেন,—"আমার সোণার চাঁদ সবিতা-সুপ্রভাত বাঁচিয়া থাক্, দুটি চাঁদপানা বউ ঘরে আনি; আমার স্বর্গবাস এই খানেই হইবে।—নারায়ণ কি আমার এ সাধ পূরাইবেন না"?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বেশ্বর বসুর বাটীর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল। লোকে তাহাকে "বোসের গঙ্গা" বলিত। সবিতা ও সুপ্রভাত এক একদিন সেই গঙ্গার তীরে বসিয়া সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিত, এবং মধ্যে মধ্যে আপনাদের মনের কথা, মন-খুলিয়া কহিত। পাড়ার অন্য বালকদলে, তাহারা বড় একটা মিশিত না,—মিশিবার আবশ্যকও হইত না। দুজনে মিলিয়া খেলা করিত, আমোদ করিত, গল্প করিত। এইরূপ সখ্য-ভাবে, সদানন্দ-চিত্তে, বালক দুইটির প্রণয়-স্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছুদিন এইরূপে গেল; বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। এখন উভয়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। যথাসময়ে প্রশংসার সহিত উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমেই উভয়ের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংসার কি, সংসারের সুখ-দুঃখ কি, ক্রমেই উভয়ে একটু একটু বুঝিতে পারিল।

একদিন পরম্পরায় সবিতা শুনিল,—"পাড়ার অমুক ব্যক্তি সহোদরের সহিত পৃথক্ হইয়াছে। পৃথক্ হইয়াই পরস্পরের এত-দূর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে যে, পরস্পরের মুখ-দেখাদেখি অবধি নাই। ইহা ব্যতীত পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত ও প্রবঞ্চিত করিতেও চেষ্টা পাইতেছে—ইত্যাদি।"

কথাটা শুনিয়া, সবিতার বুকে বড় আঘাত লাগিল। সবিতা মনে মনে ভাবিল, "মায়-পেটের ভাই হইয়া, একজন আরজনকে

এতদূর নির্য্যাতন করিতেছে? মানুষ কি স্বার্থের মোহে এতদূর অন্ধ হয়? অন্য কেহ নয়—সহোদর; এক মায়ের পেটে জন্মিয়া, এক মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া, শেষে এ দৈত্য-নীতি কোথা হইতে শিক্ষা করে?"

সবিতা যথাসময়ে, প্রাণাধিক সুপ্রভাতকে এ কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "ভাই! ভায়ে ভায়ে এতদূর মনোমালিন্য ঘটিতে পারে,—আমি বিশ্বাস করিতাম না। প্রাণে প্রাণে, রক্তে মাংসে যাহার সহিত সম্বন্ধ; একের বিচ্ছেদে, অন্যের জীবনধারণ যাহার পক্ষে কঠিন; সে, কেমন করিয়া, কোন্ প্রাণে, তাহাকে 'পর' করে? স্নেহপ্রেম করা দূরের কথা,—হৃদয় হইতে তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া অপসারিত করিয়া দেয়? ভাই! ইহারই নাম কি সংসার? তবে মানুষে ও পশুতে প্রভেদ কি? সুপ্রভাত, ভাই আমার!——"

সবিতা আর কথা কহিতে পারিল না,—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সেই রুদ্ধ-কণ্ঠে, ভগ্নস্বরে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আবার কহিল, "সুপ্রভাত, ভাই আমার! তুমি আমিও তো ভাই; তুমি আমিও এক মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া মানুষ হইয়াছি;—বলো দেখি, কোন দিন, ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও, এরূপ পাপচিন্তা আমাদের মনে——"

বলিতে বলিতে সবিতা, কনিষ্ঠের হাত ধরিল। অমনি, কোথা হইতে দুই বিন্দু মন্দাকিনীধারা, তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া সুপ্রভাতের হাতে পড়িল। সে উত্তপ্ত অশ্রুস্পর্শে, সুপ্রভাতের হৃদয়ও দ্রব হইল। সুপ্রভাতও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দাদা! ইহারই নাম সাংসার! ঈশ্বরের নিকট,——"

সবিতা বাধা দিয়া কহিল,"ইহারই নাম সংসার কেন ভাই ? সংসারে কি তবে দেবতা নাই ? মানুষ কি এতই নিকৃষ্ট জীব ? স্নেহধর্ম্ম কি তাহার হৃদয় হইতে এককালে লোপ পাইয়াছে ?"

সুধীর সুপ্রভাত আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,

"দাদা ! তোমার মন নাকি নিতান্ত কোমল, তাই তুমি এমন কথা বলিতেছ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমার প্রতি তোমার এই রকম ভালবাসা যেন চিরদিন সমভাবে থাকে। আর আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমিও তোমার পদানুসরণ করিতে সক্ষম হই। ভগবান্ কি আমাদের এ সাধ পূর্ণ করিবেন না ?"

সুপ্রভাতও নীরবে এক বিন্দু চক্ষের জল মুছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সবিতা ও সুপ্রভাত কলিকাতায় কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতে আসিল। যথাসময়ে কলেজে নিযুক্ত হইয়া, উভয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল।

একদিন সুপ্রভাতের একটু জ্বর হইয়াছিল। সবিতা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, অহর্নিশ রোগীর শিয়রে উপস্থিত রহিল। সুপ্রভাতের প্রতি নিশ্বাসে, যাতনাজড়িত প্রতি-কথাহীন-ব্যথায়,— সবিতা দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, "কেন, আমি পীড়িত হইলাম না ? তাহা হইলে সুপ্রভাতের তো কোন কষ্ট হইত না। ভাই আমার তো সুখে থাকিত। ভগবান্, সুপ্রভাতকে ভালো করিয়া দাও ;—বরং আমি পীড়িত হই।"

আর একদিন কলেজ হইতে বাসায় আসিবার পথে, সবিতা ট্রামগাড়ী হইতে নামিবার সময় পড়িয়া যায়। তাহাতে গায়ে একটু বেদনা হইয়াছিল। কনিষ্ঠ সুপ্রভাতও সে সময় প্রাণান্ত-পণে অগ্রজের সেবা করিয়াছিল। মনে মনে কহিয়াছিল,—"আহা! আমি কেন সেখানে বুক পাতিয়া দিই নাই? তাহা হইলে তো পড়িয়া গিয়া, দাদার শরীরে এত বেদনা হইত না! জগদীশ্বর, দাদাকে- আমার শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দাও।"

দুই ভায়ের মনোভাব এইরূপ। দু'টিতে যেন একাত্মা—এক প্রাণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন গেল। এল, এ পরীক্ষায়ও সবিতা-সুপ্রভাত প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। যথাসময়ে উভয়ে বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিল।

পিতামাতার আর আনন্দের সীমা নাই। পুত্রদ্বয় 'উচ্চ-শিক্ষায়' শিক্ষিত হইতেছে দেখিয়া, কোন্ পিতামাতা না আনন্দিত হন? চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। অনেকেই বসুজ-মহাশয়ের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

একদিন সত্যবতী কহিলেন, "সবিতা-সুপ্রভাত আমার বড় হইয়াছে; মা-মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়, বাছা-দুটি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে;—বিবাহ দিতে হানি কি? আহা! চাঁদপানা বউ-দুটি ঘরে আনি,—আমার ঘর আরও আলো হোক্!"

সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "তা' তোমার যদি সাধ হয়, তো হোক ;— শুভকর্ম্মে আমারও আপত্তি তাই।"

তাহাই স্থির হইল। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল বসুজ-মহাশয় নিজের পছন্দমত কন্যা দেখিতে লাগিলেন। কুলে শীলে, ধনে মানে, রূপে গুণে—সর্ব্বাংশেই করণীয়,—অবশ্য এমন স্থানেই সম্বন্ধ হইতে লাগিল। শেষে দুইটি কন্যা-রত্ন মনোনীত হইল। সকল কথা স্থির হইয়া গেল।

এদিকে সবিতা ও সুপ্রভাত,—বি, এ, পরীক্ষায়ও প্রশংসা সহিত উত্তীর্ণ হইল। সবিতার বয়স এক্ষণে উনিশ, সুপ্রভাতে আঠারো। যৌবনের এই প্রারম্ভে, উভয়ের সে স্বাভাবিক রূপরাশি আরও সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উভয়পক্ষের পাকা দেখা-শুনা হইয়া গেল; লগ্ন-পত্রও স্থির হইল। পর-পর দুই দিন, দুই তারিখে, দুই ভায়ের বিবাহ।

পুত্রের বিবাহে মায়ের আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। সত্যবতী আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

বিবাহের আর এক সপ্তাহ কাল আছে।

ফাল্গুন মাস; মধুময় বসন্তকাল সমুপস্থিত। প্রকৃতি-দূতী নব-সাজে সজ্জিতা হইয়া জীবজগৎকে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উপহার দিতেছেন। মলয়-মারুত মৃদুমন্দ হিল্লোলে সকলকেই উৎফুল্ল করিতেছে। নব-মুঞ্জরিত ফলেফুলে তৃণে পত্রে চারিদিক্ সুশোভিত।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, সবিতা ও সুপ্রভাত, আপনাদের বাটীর সম্মুখে, 'সেই বোসের গঙ্গার' তীরে বেড়াইতে লাগিল। দু'জনের মনই খুব প্রফুল্ল। একে মাধুর্য্যময় মধুর বসন্তের সমাগম; তাহার উপর সম্মুখ-শুভবিবাহের সুমধুর কল্পনা;—অভিন্ন-হৃদয়, সুখ-দুঃখে সমভাগী, একাত্মা, দুই ভায়ের,—সবিতা-সুপ্রভাতের মত দুই ভায়ের শুভ-বিবাহের সুমধুর-কল্পনা;—মণি-কাঞ্চন-যোগ হইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। জ্যোৎস্না রাত্রি। চাঁদ উঠিল। চকোর-চকোরী চাঁদের সুধা পান করিতে লাগিল। চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দিক্ আলোকিত হইল। মৃদু-মন্দ মলয়-হিল্লোল সঞ্চালিত হইতে লাগিল। অদূরপ্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইল। সম্মুখে দীর্ঘিকা, সময় সন্ধ্যা, উপরে চাঁদ, চারিদিকে জ্যোৎস্নালোক, তাহার উপর মধুময় বসন্ত-সমাগম!—এই মনোরম কবিতা-রাজ্যে, পরম প্রীতিপ্রদ সময়ে, তদধিক প্রীতিপ্রদ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে, উভয়ে দীর্ঘিকার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আজ আর কাহারও মুখে বড়-একটা অধিক কথা নাই। প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হইয়া, ভাবী সুখের কল্পনায় মত্ত থাকিয়া, উভয়েই স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সবিতা আকাশপানে চাহিয়া কহিল, "ভাই! প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা! আজ যেন আমার প্রাণে শান্তির প্রস্রবণ বহিতেছে! সুপ্রভাত, তোমার মনও কিরূপ হইতেছে, বলো দেখি?"

বলিয়া, সবিতা প্রীতিভরে কনিষ্ঠের গায়ে হাত বুলাইল। সুপ্রভাতও প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "দাদা! আমারও বোধ হইতেছে, যেন কোন অভিনব-রাজ্যে আসিয়াছি। আহা! মন-প্রাণ স্নিগ্ধ

হইয়া আসিয়াছে। কে বলে, সংসার দুঃখময়? মানাইয়া চলিতে পারিলে,—এমন সুখের স্থান কি আর আছে?"

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইল। মলয়-সমীরণ সমভাবে বহিতে লাগিল।

সবিতা কহিল, "ভাই সুপ্রভাত! আর সপ্তাহ-পরে তোমার ও আমার বিবাহ হইবে। বিধাতা আমাদের প্রতি নূতন দায়িত্ব-ভার দিতেছেন। এখন হইতে প্রতিপদে, আমাদিগকে সাবধান হইয়া চলা উচিত। বিবাহ বড় পবিত্র বন্ধন; যাহাতে সেই বন্ধন ধর্ম্মভাবে বদ্ধমূল হয়, আমাদের তাহাও করিতে হইবে। ভাই! কি বলো তুমি?"

সুপ্রভাত কহিল, "দাদা! ও সকল শাস্ত্রের কথা আমি কিছু বুঝি না। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করো, যেন আমাদের মতি-গতি চিরদিন এই ভাবেই থাকে। আর আমাকে এই আশী-র্ব্বাদ করো, যেদিন তোমার সহিত মনান্তর ঘটিবে, সেই দিন যেন আমার আয়ুঃশেষ হয়!"

সবিতা একটু আবেগভরে কহিল, "ভাই! ওরূপ অমঙ্গল কথা মুখে আনিও না। তোমায় আমায় মনান্তর ঘটিবে? ইহা কি সম্ভব? স্বভাবেরও গতিরোধ হইতে পারে, তথাপি তোমার আমার ভাবান্তর ঘটিবে না। এ কথা, তুমি প্রস্তরে, লৌহফলকে লিখিয়া রাখ।"

"কিন্তু দাদা কাল বড়ই কুটিল। মানুষের পদস্খলন পদে পদে। তাই ভয় হয়, পাছে ভবিষ্যতে, কোন্ দিন, তোমার আমার এ পবিত্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিবাহ পবিত্র বন্ধন বটে; কিন্তু এ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ আত্মহারা হয়; অনেক সময় মনুষ্যত্বও নষ্ট করে।—সংসারে এ দৃশ্য বিরল নহে।"

"সংসারে বিরল না হইতে পারে; কিন্তু তোমার আমার সে ভয় নাই।"

তারপর আর একটু অধিক ক্ষুণ্ণভাবে সবিতা কহিল, "সুপ্রভাত! আজ তুমি এমন সন্দেহসূচক কথা কহিতেছ কেন?"

সবিতার কথায়, সুপ্রভাত কিছু অপ্রতিভ হইল। মনে মনে কহিল, "আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি। এরূপ কথায় দাদার মনে কষ্ট দিয়াছি। আহা, দাদা আমার সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি!"

প্রকাশ্যে কহিল, "না দাদা! তুমি কিছু মনে করিও না,—মনের আবেগে আমি এরূপ কথা বলিলাম মাত্র।"

সবিতাও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিল, "উপরে দেবতা আছেন; অন্তর্যামী তিনি,—আমার অন্তর দেখিতেছেন;—সুপ্রভাত! তোমায় সত্য বলিতেছি, সমস্ত পৃথিবী একদিকে হইলেও, তোমার আমার এ ভ্রাতৃপ্রেমে কেহ বাদ সাধিতে পারিবে না!"

এবার সুপ্রভাতও পুলকিত হৃদয়ে কহিল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!—দাদা! তোমার কথাই যেন সার্থক হয়।"

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, গৃহে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল।

সত্যবতী প্রীতি-প্রসন্ন-মনে, হাসি-মুখে পুত্রবধূদ্বয়কে গৃহে তুলিলেন। বধূদ্বয়ের চাঁদপানা মুখ, সুধামাখা হাসি দেখিয়া, ইহসংসার ভুলিয়া গেলেন।

কিছুদিন খুব সুখ-শান্তিতে কাটিয়া গেল। বউ-দুটিও মানুষ হইয়া উঠিল। সবিতা ও সুপ্রভাত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধি লাভ করিল। এইবার তাহারা কার্য্যক্ষম হইল। দুই ভায়ে বিস্তর অর্থও উপার্জ্জন করিল। সর্ব্বেশ্বর বসুর অবস্থা ফিরিয়া গেল। তিনি এক্ষণে একজন ধনবান্ ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হইলেন।

আরও চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। সবিতা ও সুপ্রভাত যথাক্রমে ঊনত্রিংশ ও অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সময়ে বৃদ্ধ জনক-জননীও একে একে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইবার "কালের স্ব-ধর্ম্ম" ফলিতে চলিল।

* * * * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ জনক-জননীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, সবিতা ও সুপ্রভাতের সুখ-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম কেহ বুঝিতে পারিল না,—কোথা হইতে, বিষ, কিরূপে একটু একটু ধরিতেছে। ধিকি ধিকি বিষও ধরিতে লাগিল, আবার তাহার উপর, অল্পে অল্পে, ইন্ধনও পড়িতে লাগিল। কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—কালমাহাত্ম্যে প্রায় সকলেরই যাহা হয়,—সবিতা-সুপ্রভাতের ভাগ্যেও তাহাই হইল।

ভক্ত-কবি তুলসীদাস সত্যই বলিয়াছেন,—

"দিন কা মোহিনী, রাত কা বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া লোক সব বাউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

হে মোহিনি, হে বাঘিনি, হে বঙ্গ-গৃহ-ধ্বংসকারিণি, অশান্তি-ময়ি, অলক্ষ্মি! তোমাকে নমস্কার! তুমি কত সোণার-সংসার ছারখার করিতেছ; কত রেষারিষী-দ্বেষাদ্বেষী, কলহ-কুবাক্যে বিষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছ; কত পিতা-মাতা ভাই-ভগিনী আত্মীয়-স্বজনের বুকে ছুরি মারিতেছে; কত লোককে কত-রকমে চক্ষুঃশূল করিয়া নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছ; কত শান্তি-ময় সমাজকে শ্মশানে পরিণত করিতেছ;—তাহার ইয়ত্তা নাই। ধন্য তোমার প্রভাব,—ধন্য তোমার মোহিনীশক্তি! তোমার প্রভাবে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে, পুত্র পিতাকে, বংশধর জ্ঞাতিবন্ধুকে পায়ে ঠেলিতেছ! প্রবলে! আবার কতদিনে তুমি এ বঙ্গভূমে দেবীমূর্ত্তিতে দেখা দিবে?

এই যে দেব-চরিত্র সবিতা-সুপ্রভাত সহোদর দুটি;—আহা, 'ভাই' বলিতে যাহারা অজ্ঞান; এতদিন—জীবনের এতখানি পথ অগ্রসর হইয়াও যাহারা পরস্পরকে অভিন্ন-হৃদয় বলিয়া জানিত; মুহূর্ত্তের বিরহ যাহাদের অসহ্যবোধ হইত; পরস্পর পরস্পরকে প্রাণান্তপণে ভাল বাসিয়া,—হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দিয়াও যাহারা পরিতৃপ্ত হয় নাই,—বলো দেখি, আজ কাহার ছলনায়, কাহার উত্তেজনায়, কাহার যাদুমন্ত্রে, তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্য হইল? মায়াবিনি, অন্তর্দ্ধান হও! তোমার অন্তর্দ্ধানে ত্রিভুবন শীতল হউক;—নরকের আগুন নিবিয়া যাক্।—দেবীর আগ-মনে, হিন্দুর সংসার, আবার দেবতার সংসার হউক।

বড়বউ ঠাকুরুণটি এই অনর্থের মূল। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, দুই 'জায়ে' মিলে-মিশে সংসার করেন।—"কেন, রামেরা দু'ভাই পৃথক্ হ'য়েছে; মধু যদুও আলাহিদা হাঁড়ী কেড়েছে; আর

তোমার বেলায় যত 'মহাভারত অশুদ্ধ'! বিষয় আশয়, বাড়ী-ঘর-দ্বার সব ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নাও; নিজের 'এক্তার' মত পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সো; দশের একজন হও;—তবে তো সকলে মানিবে, গণিবে! তা নয় কি,—এক ভাই, ভাই, ভাই! অমন গুণের-ভাই হয় অনেকে! আহা, রামের লক্ষ্মণ আর কি!"

এইরূপ দিনরাত ফোঁস-ফোঁস শব্দ, হাঁড়ীমত মুখখানা, আর এটা সেটা 'অছিলা' ধরিয়া কান্-ফুস্লানি! সে কুঞ্চিত নাসিকা, বক্র দৃষ্টি, আর হাত-মুখ-নাড়ার ভঙ্গী,—একরূপ অদ্ভুত! স্ত্রী-রত্নের প্রতিনিশ্বাসে, বিষ-বহ্নি-উদ্গিরণ হইতেছে; সে রতনমণি "পলক পলক" রুধির-লোলুপা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিতা হইতে-ছেন।—সবিতা-বেচারী আর কতক্ষণ তাল ঠিক রাখিতে পারে? প্রথমে একটু কম-মেশামেশী, একটু কম-কথাবার্ত্তা, একটু উপেক্ষা-ভাব প্রদর্শন, একটু বেজার-বেজার-ভাব প্রকাশ, একটু খিট্-খিটে-মেজাজী হওয়া,—এইরূপ একটুর পর একটু করিয়া, সবিতা, সুপ্রভাতকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুন্দরী ঠাকরুণ (সবিতার সহধর্ম্মিণী) ছোট বধূকে বিধিমতে বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। সুরবালা (সুপ্রভাতের সহধর্ম্মিণী) অমানুষী সহিষ্ণুতা-গুণে, দুষ্টা জায়ের সে অত্যাচার সকল অম্লানবদনে সহ্য করিতে লাগিলেন। মুখের কথাটিও বাহির না করিয়া, বোবার মতো নিস্তব্ধভাবে, খলের ষড়যন্ত্র গুলা দেখিতে লাগিলেন।

সুপ্রভাত কিন্তু এসব কিছু দেখিয়াও দেখেন না; কিছু শুনিয়াও শুনেন না। তাঁহার মনে হয়,—"ইহাও কি হইতে পারে, যে, দাদা আমাকে পায়ে ঠেলিবেন? আমি কি চিরদিনের

মতো তাঁর স্নেহে বঞ্চিত হইব? না, না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে! এ অলীক-চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও পাপ!"

নবম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু "কালের স্বধর্ম্ম" কোথায় যাইবে? পতিপ্রাণা সুন্দরী ঠাকুরুণ, পতির কর্ণকুহরে অবিশ্রান্ত ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সেই জপের গুণে, সবিতার চৈতন্য হইল। সবিতা বুঝিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য :— "দুই ভায়ে এক-অন্নে থাকাটা কিছু নয়। ইহা, একালের সভ্যতা-বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে এ নিয়মটা বেশ। উন্নতিও তাই তাদের পদে পদে। বিশেষ, সুপ্রভাতের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে হইতে চলিল;—পরিবার তাহারই অধিক; খরচও অধিক। মিথ্যা নয়,—কেন আমি 'পর'কে জড়াইতে গিয়া নিজে মারা পড়ি? বড়বউ-এর কথাই ঠিক,—কলিতে আবার ভাই ভাই এক থাকে কোথায়? বিশেষ ভাই তো আর রামের অনুজ লক্ষ্মণ নয়!"

আগুনে বিজলী খেলিল। সবিতা নিবিষ্ট মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ছেলেদের খাবার-দুধ লইয়া, সুরবালার পরিচারিকার সহিত সুন্দরী ঠাকুরুণের কি-একটু বচসা হইল। সুন্দরী ঠাকরুণ এইবার মতলব হাসিল্ করিবার সম্পূর্ণ অবসর বুঝিলেন। স্বামি-সোহাগিনী তখনি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া, কান্নার সুরে অভিমানভরে কহিলেন, "তুমি আজই এর একটা বিহিত করো। দাসী-বাঁদীতেও আমায় দশকথা শুনাইবে?—কেন?"

কান্নার বেগ বাড়িল। ঠাকুরুণ কহিলেন, "কেন, দুধ তো

সরকারী ;—এর আবার খোকা-খুকীর কি? নিজে ব'লে আশ্ মিটে না, আবার দাসীকে দিয়ে অপমান!"

সবিতা মনে মনে ছোট্ট একটি 'হুঁ' বলিয়া, প্রকাশ্যে গম্ভীর-ভাবে কহিলেন, "কি হ'য়েছে?"

"হবে আর কি? তোমার গুণের ভাই আর বউ-মার জ্বালায় আমায় আত্মঘাতিনী হ'তে হ'বে দেখছি!"

কান্নার বেগ আবার বাড়িল। স্বামি-সোহাগিনী হাত-মুখ নাড়িয়া, গা-মোড়া দিয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, আবদারভরে কহিলেন, "কি, ওরকম ক'রে ব'সে ভাবছ কি? আজই যা হয় একটা শেষ করো। নিজে না মুখ-ফুটে বল্‌তে পারো,—বলো, আমি আছি।"

সবিতা একটু ঢোক গিলিয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,

"হাঁ, আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। সুপ্রভাতকে আমি নিজে একথা বলিতে পারিব না। তুমি, ছোট বউমাকে গিয়া, সব কথা খুলিয়া বলো।—কেমন?"

"আ—চ্ছা, তা—ই।"

স্বামি-সোহাগিনী সুন্দরী, আহ্লাদে ডগমগ হইয়া, অতঃপর আবেগ-ভরে কহিল, "তবে আজ হইতে? কেমন, কি বলো?"

সবিতা আর একবার ঢোক গিলিল। কি ভাবিল। শেষে বলিল,—"তাই।"

সতী-প্রতিমা সুরবালা এই সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে গৃহে উঠিতে-ছিলেন। কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে ছিল। হঠাৎ একখানি সুদৃঢ় কাষ্ঠফলক ঠিক্‌রিয়া, সজোরে সুরবালার কপালে লাগিল। সে আঘাতে একটু রক্তপাতও হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃবৎসল সুপ্রভাত অতি উদারপ্রকৃতি। মুহূর্ত্তের জন্যও জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হয় নাই। তিনি স্ব-উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ অগ্রজের হাতে দিতেন। কি হইতেছে বা কি হইল, একদিনের জন্যও এ প্রশ্ন করেন নাই। 'দাদা' বলিতে তিনি অজ্ঞান হইতেন।

এদিকে যথাসময়ে, সয়তানী সুন্দরী, সয়তান-ধর্ম্ম পালন করিল। সরলা সুরবালাকে নিকটে ডাকিয়া কহিল,—"আজ হইতে আমরা পৃথক্ হইলাম। তোমার স্বামীকে কহিও, তাঁর দাদার আদেশ যে, পৈতৃক যা কিছু আছে, সমস্ত ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নিন। বিলম্বে তাঁরই ক্ষতি। তাঁহার দাদা ভালমানুষ,—চক্ষু-লজ্জাটা তাঁর নাকি বড় বেশী,—তাই তিনি নিজে এ কথা বলিতে না পারিয়া, আমাকে দিয়ে বলাইলেন। তা' বোন্, কিন্তু মনে ক'রো না। পৃথক্ হলেম ব'লে যে, তোমাদের উপর আমাদের মায়া-মমতা থাকিবে না, এমন কখনো মনে ক'রো না। আর, আমরাই বা কোন্ তোমাদের 'পর' হবো? আসল, মনের ভালবাসা নিয়ে কথা!"

গুণধরী জায়ের এই বক্তৃতা শুনিয়া, সুশীলা সুরবালা কোন উত্তর করিলেন না; মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সঙ্গে খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুন্দরী আবার কহিল, "তবে ব'লো, বোন্।—তাঁকে বার-বাড়ী থেকে ডাকিয়ে এনে, না হয়, এখনি বলো।"

এই কথা বলিয়া, পাপিষ্ঠা তথা হইতে চলিয়া গেল; এবং কোন

একটা কৌশলে, সুপ্রভাতকে তখনই বাটীর ভিতর আনাইল। বিলম্বে, পাছে মতলবসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

সুশীল সুপ্রভাত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, সরলা সুরবালা বিষণ্ণমুখে, সকল কথা কহিল। শুনিয়া, সুপ্রভাত সর্পদষ্ট পথিকের ন্যায় চমকিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"না, না, ইহা কি সম্ভব?—দাদা আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন?"

সরলা সহধর্ম্মিণী মুখখানি নত করিয়া, মৃদুস্বরে বিনীতভাবে কহিলেন, "স্বামিন্, সম্ভব অসম্ভব আমি জানি না; যেমন শুনিলাম, বলিতেছি।"

সুপ্রভাত গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিক্ষণে তাঁহার মুখে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া স্মৃতিপথে উদিত হইল। অমনি শত সহস্র বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, উদ্ভ্রান্ত ভাবে—বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"না, না, ইহা কি সম্ভব? দাদা আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? দাদা, দাদা,——"

সুপ্রভাত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন। আবেগভরে আবার কহিলেন,—"না, না, ইহা কি সম্ভব? আমাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়াও যাঁর আশ্ মিটিত না; যিনি আমাকে প্রাণাধিক প্রিয়তম ভাবিতেন; আমার জন্য যিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না;—সেই দাদা,—আমার মার-পেটের-ভাই, আমার হৃদয়ের দেবতা,—বিনাদোষে আমাকে পায়ে ঠেলিলেন? না, না, ইহা কি সম্ভব?"

সুপ্রভাতের মুখ হইতে কথাগুলি অতি উচ্চৈঃস্বরে বাহির

হইতেছিল। সবিতা সহজেই তাহা শুনিতে পাইলেন। পাপিষ্ঠা পত্নীর উত্তেজনায় ও তাহার শিক্ষামত, সবিতা সুপ্রভাতের গৃহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুপ্রভাত অস্থির-চিত্তে কি ভাবিতে-ছিলেন; এই সময়ে, আবার যাতনা-জড়িত বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "না, না, ইহা কি সম্ভব?"

সবিতাও অমনি প্রত্যুত্তরের অবসর বুঝিলেন। কিন্তু সে প্রত্যু-ত্তরও তাঁহার নিজের ইচ্ছায় নয়,—পাপিষ্ঠা পত্নীর উত্তেজনায়। কম্পিতকণ্ঠে সবিতা কহিলেন, "কি সম্ভব, সুপ্রভাত?"

অগ্রজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সুপ্রভাত দ্রুতপদে অগ্রজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে, বুক চাপিয়া ধরিয়া, অতি কষ্টে কহিলেন, "দাদা, দাদা! তুমি নাকি আজ হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছ?"

সবিতা অধোবদনে নীরব রহিলেন। মুখে একটিও কথা বাহির হইল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এই সময়ে পাপিষ্ঠা সুন্দরী, পার্শ্বের ঘর হইতে, বিরক্তিভাবে সুপ্রভাতকে শুনাইয়া কহিল, "তা ঝি, তুই বল্ না,—বাবু চক্ষু-লজ্জায় কিছু বল্‌তে পাচ্ছেন না ব'লে, এত পীড়াপীড়ি করা কেন?—ওঁর হ'য়ে আমিই বল্‌চি,—হাঁ, আজ হইতে উনি তোমাদিগকে পৃথক্ ক'রে দিলেন!"

কথাগুলা বিষাক্ত শরের ন্যায় সুপ্রভাতের বুকে বিঁধিল। সবিতা তখনও নিরুত্তর। সেই নিরুত্তর অবস্থায়, সুযোগ বুঝিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরম ভ্রাতৃবৎসল, কোমলহৃদয়, সুপ্রভাতের সে নির্ম্মমদৃশ্য

আর সহ্য হইল না,—তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

'অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইলাম' ভাবিয়া, সহৃদয় সুপ্রভাত হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন! অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা, একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। সেই শৈশব কাল, শৈশবকালের সেই খেলা-ধূলা, সেই বিদ্যালয়ে একত্র পাঠাভ্যাস, একত্র শয়ন ভোজন ও বিহার,—একে একে সকল কথাই মনে উঠিতে লাগিল। সেই পীড়াকালে সবিতার সেই কাতরভাব, সেই স্বার্থ-মলিনতা-শূন্য স্বাভাবিক ভালবাসা, সেই অকৃত্রিম স্নেহ,—এক এক করিয়া সকল চিন্তা,—সুপ্রভাতকে বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় অধীর করিয়া তুলিল। তারপর,—সেই দীর্ঘিকার তীরে উভয়ের সেই কথোপকথন, সবিতার সেই সত্যনিষ্ঠা, স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক বাক্য, ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দামভাবপূর্ণ সরল উপদেশ, উভয়ের বিবাহ,—ভাবিতে ভাবিতে সুপ্রভাতের হৃদয়ে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে, মর্ম্মান্তিক যাতনায় তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এইক্ষণ হইতে তাঁহার মূর্চ্ছা রোগ দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বরও আসিল। দেখিতে দেখিতে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন; রোগ সাংঘাতিক হইল।

চিকিৎসক আসিল। রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল।

কিন্তু রোগের কোনরূপ উপশম হইল না। রোগীর অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, সুপ্রভাত এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না।

* * * *

সুবর্ণ-দীপ হাসিয়া উঠিল। আজ যে দীপ নির্ব্বাণ হইবে;—হায়! তাই এ হাসি।

সবিতার চৈতন্য হইয়াছিল,—কিন্তু অনেক বিলম্বে। ফলে কিছুই হইল না। সবিতা বুঝিলেন, তিনিই সুপ্রভাতের এই অকাল-মৃত্যুর কারণ। ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। তাই আজ অতি কষ্টে, হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়া, তিনি অনুজের সেই অন্তিম-শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিলেন। অতি কষ্টে কণ্ঠরোধও করিলেন। কিন্তু চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া, কয় ফোঁটা গরম জল,—অনুজের সেই পাংশুময় মুখের উপর পড়িল।

প্রভাতী-চাঁদের মতো, সুপ্রভাত একটু ম্লান হাসি হাসিল। অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে কহিল, "দাদা, কাঁদ কেন? তোমার দোষ নাই,—দোষ আমার অদৃষ্টের;—দোষ এই কাল-যুগের!"

সবিতা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সুবর্ণ-দীপ আর একবার হাসিয়া উঠিল। যেন ছিন্ন মেঘের কোলে ক্ষীণ সৌদামিনীর বিকাশ! তাহা আভাহীন, প্রভাহীন, শোভাহীন, প্রাণহীন। কিন্তু সে হাসি,—পরম ভ্রাতৃবৎসল, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, দেব-চরিত্র সুপ্রভাতের সেই ম্লানহাসি,—আজ সবিতার বক্ষে, বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিল।

সুপ্রভাত অতি কষ্টে, অন্তিম নিশ্বাস টানিতে টানিতে কহিলেন,

"দাদা, মনে হয় কি,—আমাদের বিবাহের সাতদিন আগে দীঘীর পাড়ের সেই কথা? আমি ব'লেছিলাম না,—"দাদা, আশীর্ব্বাদ করো, যে দিন তোমার সহিত মনান্তর ঘটিবে, সেইদিন যেন আমার আয়ুঃশেষ হয়!" আঃ! আজ আমার সেই কথা সার্থক হইল। এখন আমি সুখে মরিতে পারিব। দাদা, আমি চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করো, যেন জন্ম জন্ম তোমাকেই ভাই পাই!"

সুপ্রভাতের চক্ষে জলধারা দেখা দিল; কিন্তু তাহা আর বহিতে পারিল না;—যেথানকার বস্তু, সেই খানেই মিশিয়া রহিল।

কথা শুনিয়া সবিতার প্রাণ ফাটিয়া গেল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথাও তিনি কহিতে পারিলেন না। সহসা, বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অমনি এককালে সহস্র সহস্র বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, অরুন্তুদ যন্ত্রনায়, বিকলকণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—

"সুপ্রভাত, ভাই আমার,—আমিই তোমার জীবনহন্তা! বুঝিলাম, নরকেও এ ভ্রাতৃঘাতীর স্থান নাই!"

সবিতা কাঁদিয়া উঠিলেন। সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

পতিপ্রাণা সুরবালা এই সময়ে সোণারচাঁদ শিশু তিনটিকে লইয়া, স্বামীকে শেষ-দেখা দেখিলেন। সাধ্বী-সতী পতির পায়ে মাথা লুটাইতে-লুটাইতে কাঁদিতে লাগিলেন। অবোধ শিশু তিনটিও কাঁদিয়া উঠিল। হরি হরি হরি!—এদিকেও অমনি নিঃশব্দে, নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি সুপ্রভাত অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

দীপ নির্ব্বাণ হইল।

প্রতিমা

শরতের এই জ্যোৎস্না রাত্রি বড় সুন্দর। বাতায়নগুলি খুলিয়া দাও,—আমি এই জ্যোৎস্না দেখিতে বড় ভালবাসি। তোমাদের এই মাধবী-জড়িত উন্নত তরু দেখিয়া আমার মনে এক অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠে। এই শরৎকাল, এমনই জ্যোৎস্নারাত্রি, এমনই মাধবীজড়িত উন্নত তরু, এমনই অস্পষ্ট ছায়া,—আজিকার এই মধুর রাত্রে সেই সব মনে পড়িতেছে। তোমরা পূজার দিনে গল্প শুনিতে চাহিতেছ, গল্প আর বড় মনে নাই। যে কাহিনী আমার হৃদয়ে জাগিতেছে, তাহাই বলিতে পারি।

কাহিনী ক্ষুদ্র। উপন্যাসের কথা কিছুই নাই। যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, অনেক চেষ্টা করিয়াও, এ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচয় পাই নাই। মালাবার পাহাড়ের উপর বসিয়া তিনি এই কাহিনী বলিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে, কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, এক একটি কথা বলিতে বলিতে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সহসা তিনি নীরব হইয়া ভূমিপানে চাহিয়া থাকিতেন। নিম্নে ভারত-মহাসাগর ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গে মালাবারের চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িত, তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি

উঠিত। অনেক সময় দেখিয়াছি, যে প্রবল সিন্ধুর উচ্ছ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর উথলিয়া উঠিত, তাহা নয়নপ্রান্ত পূর্ণ করিয়া, মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া, ভারত-মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গে মিশিয়া যাইত। হয়ত তোমরা বুঝিবে না,—মানুষ এতও কাঁদিতে পারে! হয়ত বুঝিবে না, একজনের চক্ষুজলে এক দিন এক নদী প্রবাহিতা হইয়াছিল! বধূমতী নামে সে নদী ভারতের মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। কান্না ভালো, দুর্ব্বলতা বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিও না। জীবনের বড় গুরুভার কান্নায় প্রশমিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গোপসাগরের ধারে এক প্রকাণ্ড ভীষণ অরণ্য ছিল। ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তু ব্যতীত কোন মানুষ যে, সেখানে থাকিত, এমন বোধ হইত না। তবে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভীষণ একদল দস্যু সেখানে বাস করিত বটে। সেই নিবিড় অরণ্যের মাঝে,—যেখানে অত্যুন্নত তরুশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ, তৃণ গুল্মে চারি দিক্ এমনই আচ্ছাদিত যে, ভিতর দেখিবার এতটুকুও সুবিধা হইত না,—সেই অরণ্যের মাঝে অতি প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় এক অট্টালিকা ছিল। তাহার চারিদিকে ভগ্নস্তূপ বিরাজিত; দস্যুগণ তাহারই উপর বসিয়া আনন্দ-উৎসবাদি সম্পন্ন করিত।

একদিন,—সেও এমনই শরৎকাল, এমনই জ্যোৎস্না-রাত্রি,—দস্যুগণের এক আনন্দ-উৎসব চলিতেছিল। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্যভাগে, সেই ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে, যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ,—সুশীতল শরতের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সে স্থান বড় সুন্দর দেখিতে

হইয়াছিল। একটিও প্রদীপের আলোক-রেখা কোথাও ছিল না,—শুভ্র স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে সে স্থান উজ্জ্বলীকৃত। সেই ভীষণ আকৃতি দস্যুগণের ভীষণ আনন্দ-কোলাহলে সে কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাহাদের কোলাহলে, ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রাণভয়ে একই পথে পাশাপাশি ছুটিতে লাগিল। বনের পাখীগুলা কুলায় ছাড়িয়া ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল।—একটা বিকট আনন্দ-কোলাহলে বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতার দৃশ্য প্রকটিত হইল। তবু সেই বিকট দৃশ্যের মাঝে মধুর রাত্রির সে মধুর জ্যোৎস্নাটুকু বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

দস্যুর দলপতি প্রাঙ্গণের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। ইঙ্গিত করিয়া সকলকে নিঃস্তব্ধ হইতে বলিল। সকল দস্যু অমনি এক সময়ে সহসা নিঃস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণের মাঝে এক বেদিকার উপর একখানি প্রতিমা, কে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। দস্যুদলপতি ধীরে ধীরে বেদিকার উপর উঠিল, প্রতিমার সেই সর্ব্বাঙ্গে আবৃত বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিয়া একবার আকাশপানে চাহিল। দেখিল, অনন্ত সুনীল আকাশে শরতের চাঁদ হাসিতেছে; সেই হাসিতে, ভীষণ অরণ্যেও যেন একটু মধুর লাবণ্য ফুটিয়াছে; যেন সেই ভীষণ আকৃতি দস্যুগণের সে ভীষণতায়ও একটু মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছে; আর, সেই দলপতি তাহার নিজের অন্তরে চাহিয়া দেখিল, যেন তাহার অন্তর আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দস্যুর হৃদয়ে আলো? তা তোমরা বিশ্বাস না করো,—আমার বোধ হয়, দস্যু আজ যে প্রতিমাস্পর্শ করিয়াছিল, সেই প্রতিমাতেই কি ছিল;—সেই জন্যই তাহার হৃদয়ে আলো। প্রতিমাতে কি ছিল, তাহা আর কেহ কিছু বুঝিল না, বুঝিতে চাহিলও না, বুঝিবার আবশ্যক বোধও করিল না।

দস্যু-দলপতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—

"বন্ধুগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ করো। আমি জন্মের মত তোমাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতেছি। আমার পরিচয় ইতি-পূর্ব্বেই তোমরা কেহ কেহ পাইয়াছ। আমি দস্যুর গৃহে জন্মগ্রহণ করি নাই এবং দস্যুর হৃদয় লইয়াও এ সংসারে আসি নাই। কিন্তু সে সকল পূর্ব্বকথা তুলিব না, কেননা, তাহাতে কোন ফল নাই। আমি দশ বৎসর তোমাদের সহবাসে ছিলাম, দশ বৎসর তোমরা আমাকে দেখিয়াছ,—আমি দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়াছি, প্রবলকে বিনাশ করিয়া, দুর্ব্বলের হিতসাধন করিয়াছি। আমার জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না; কি ভাবে আমি তোমাদের দলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে আনিতে পারি না।"

সেই জ্যোৎস্নালোকে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল,—দলপতির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে। তাহারা এ দশ বৎসর সে চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখে নাই।

দলপতি বলিতে লাগিল,—

"ভাই সকল! আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। যতদিন বাঁচিব, তোমাদের কথা মনে থাকিবে। এই দশ বৎসর অনেক নিষ্ঠুরের কাজও করিয়াছি, একদিনও সে জন্য কিছু ভাবি নাই। অনেক করুণদৃশ্য চক্ষে পড়িয়াছে, গ্রাহ্য করি নাই। এই অরণ্যের প্রান্তভাগে কা'ল এক দেবীপ্রতিমা দেখিতে পাইয়াছিলাম। একবার মাত্র সে প্রতিমা দেখিয়াই আমার মনে হইল, যেন আমার অন্তরের উপর কি একটা আবরণ পড়িয়াছে; কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। তখন

যেন আমি আপনাকে কোথায় হারাইয়াছিলাম, সহসা কুড়াইয়া পাইলাম। আমার সকল কথা স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল,—কি জানি, সহসা প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। এ ভীষণ দস্যু-হৃদয় সহসা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে প্রতিমা দেখিতে দেখিতে—পাষাণ ফাটিয়া যেমন উৎস ছুটিতে থাকে,—আমার এ কঠিন হৃদয় ফাটিয়াও তেমনি অশ্রু বহিল। এই প্রতিমা আমি গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। পূজা সাঙ্গ না হইতেই কেন যে, এ প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু এ মলিনমূর্ত্তি, এ শ্রান্ত দেহ দেখিয়া বোধ হয়, কিছুদিন ধরিয়া এ মূর্ত্তি আমারই অনুসরণ করিয়াছে। আমি দেখিতে পাইয়া আমাদের এই আনন্দকাননে আনিয়াছি। তোমরা প্রতিমা দেখিতে উৎসুক হইয়াছ, তাই আজি এ প্রতিমা তোমাদের সম্মুখে আনিয়াছি। আমার এ আনন্দময় চির-বিদায়ের দিনে তোমাদের আনন্দ দেখিব বলিয়া, আজি এই আনন্দ-উৎসব আহ্বান করিয়াছি। তোমরা তবে প্রতিমা দেখ।”

তখন দলপতি ধীরে ধীরে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করিল। অমনি সকলের চক্ষু অতি বিশাল বিস্ফারিত হইল। সেই চক্ষুতে তাহারা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ—যেন শ্রাবণের গঙ্গা, কূলে কূলে জল, রূপ আর ধরিতেছে না,—সেই শুভ্র জ্যোৎস্নারাশিও যেন সে রূপ-জ্যোতিতে ম্লান হইয়া গেল। প্রশান্ত প্রতিমার সেই স্থির আঁখিযুগল আপন চরণ প্রতি বিন্যস্ত; প্রতিমা নিশ্চল, নিঃস্পন্দ, নীরব। দস্যুদল সেই শুভ্র চন্দ্রালোকে, সেই শুভ্র কৌমুদীবিধৌত বেদিকার উপর, সেই জ্যোৎস্না-নিন্দিত দেবী-প্রতিমা দেখিয়া,—

কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, কেহ বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দস্যুদল কেহ কোন রহস্য বুঝিল না, কেবল একজন, আনুপূর্ব্বিক বুঝিয়াছিল। সে অনিমেষনয়নে প্রতিমাপানে চাহিয়াছিল। প্রতিমা দেখিয়া সকলে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, দলপতির বিদায়ের কথা কাহারও মনে নাই। তারপর দলপতি যখন আবার সেই আবরণ লইয়া প্রতিমা ঢাকিয়া ফেলিল, তখন সকলের বোধ হইল, যেন সহসা কে তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখ হইতে, পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ কাড়িয়া লইল।

শরতের সেই অপূর্ব্ব শুভ্র জ্যোৎস্না, সেই প্রাঙ্গণের উপর তেমনি মাধুর্য্য ছড়াইতেছিল; কিন্তু সে মোহিনী প্রতিমার সে মোহিনী শোভা আর কেহ দেখিতে পাইল না।

পরদিন প্রভাতে দস্যুদল দেখিল যে, তাহাদের দলপতি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে সেই প্রতিমাও চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি সকল কথা পরিষ্কাররূপে শুনি নাই, পরিষ্কার করিয়াও সকল কথা বুঝাইতেও পারিব না। কাহিনীর মধ্যে কোন ঘটনাবৈচিত্র্য নাই। অপিচ, দস্যুর হৃদয় যদি দস্যুর ন্যায়ই থাকিত, তবে হয়ত বা কিছু পাওয়া যাইত। কিন্তু সেই বনবিহারিণী মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমাতে যে, কি অসাধারণ কি-একটু নিহিত ছিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই প্রশান্ত আঁখি যুগলের

স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, সেই সুকুমার পরিপূর্ণ অঙ্গ-সৌষ্ঠবে, সেই ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুমিষ্ট বচনসুধাতে যে, কি অমৃত এবং কি মাধুরী নিহিত ছিল, তাহা বলিতে পারি না।—যাহার সংস্পর্শে দশ বৎসরের দস্যুহৃদয়ও আর এক দিকে স্রোত ফিরাইল!

মালাবার পাহাড়ের কিছুদূরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। দস্যুদলপতি সেই দেবী-প্রতিমাকে লইয়া, সেই কুটীরে বাস করিতেছিলেন। আজি এই সন্ধ্যার আকাশে ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটা যেমন এই পৃথিবী পানে চাহিয়া জ্বলিতেছে, সেই প্রতিমাখানিও তেমনি দিবানিশি স্বামীর মুখপানে চাহিয়া জ্বলিত। সে নীরব দৃষ্টিতে যে ভাষা প্রকাশিত হইত,—আকুল প্রাণের যে ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইত, তাহা হয়ত অন্যের বুদ্ধির অগম্য; কিন্তু চির-অপরাধী স্বামী তাহা সমস্তই বুঝিতে পারিত।

বহুমূল্য রত্ন হারাইয়া যে বড় ব্যথা পাইয়াছে, কালে সে রত্ন মিলিলে, তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। এই দম্পতিও দশ বৎসরের পর পুনর্মিলিত হইয়া, সেইরূপ অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গোপসাগরের মৃদুগম্ভীর গর্জ্জন, যাহার কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিত; নিবিড় অরণ্যের ভীষণতা যাহার চক্ষে অসীম সুন্দর বলিয়া অনুভূত হইত; পরস্বাপহরণ যাহার চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিত এবং ভীষণ দস্যুদিগের সাহচর্য্য যাহার ভালো লাগিত, আজি সহ-ধর্ম্মিণীর প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া সে দেখিল, তাহার সেই দশ বৎসরের জীবন যেন একটা মহাশূন্য!

উভয়ের হৃদয় উভয়ের অজ্ঞাত ছিল না। একজন আপনাকে চির-অপরাধী জানিয়া, প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া, আপনার অপ-

রাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিত; আর একজন ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর যে অসীম প্রেম জাগাইয়া রাখিয়াছিল, সেই প্রেমময়ী ক্ষুদ্র বালিকা,—বালিকা বলিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সে সাধ করিয়াও তাহার দেবতার চরণে উপহার দিতে পারে নাই,—আজি সে, নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমের সুদৃঢ় নিগড়ে তাহার নিত্য আরাধ্য দেবতাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতেছে। দুইদিকেই প্রেমের উচ্ছ্বাস, দুইদিকেই প্রেমের আকর্ষণ,—সে এক অপূর্ব্ব মহাযোগ!

প্রেমই এই বিশ্বের মেরুদণ্ড। হৃদয় যে হৃদয়ান্তরে মিশিতে একান্ত ব্যাকুল, তাহার মূলে প্রেম। দশ বৎসরের দস্যুতায় যাহার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত হইয়াছে, আজ সহসা যেন তাহার হৃদয়ে এক পারিজাত ফুটিয়া উঠিয়াছে!—সৌরভে ও শোভায় পৃথিবী হাস্যময়ী, হৃদয়ও উজ্জ্বল।

দলপতির দস্যুতায় উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই সেই গভীর অরণ্যবাসী,—সেই সহচরগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। নূতন আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, নূতন গৃহ বাঁধিয়া, নূতন জীবন ধারণ করিয়া,—দলপতি অনেক দিন অতিবাহিত করিল। সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্য হইতে নিত্য এক অপরিসীম স্নেহধারা প্রবাহিত হইত; তাহাতে দীন দুঃখী আশ্রয় পাইত, চির-অনাথ সে স্নেহ পাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইত।

দুই বৎসরের মধ্যে একটি স্বর্গভ্রষ্ট শিশু আসিয়া সেই কুটীর উজ্জ্বল করিল। প্রেমের আলোকে সে কুটীর তো উজ্জ্বল ছিলই; এখন এই নবশিশুর অস্ফুট হাসিতে উজ্জ্বলে মধুর মিশিল।

'জীবন এত মধুর, সংসার এত সুখের, সৃষ্টি এত করুণাময়ী,—হায়! দশ বৎসর সেই নিবিড় অরণ্যে বাস, সেই বঙ্গোপসাগরের

গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে দশ বৎসর সেই দস্যুদলের সাহ-চর্য্য, সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রাণিহত্যা'—দলপতি আর ভাবিতে পারিত না, ভাবিতে ভাবিতে বালকের ন্যায় কাঁদিত, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুতাপদগ্ধ প্রাণ জুড়াইত। তখন প্রেমময়ী প্রতিমা বস্ত্রাঞ্চলে সে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, নব-শিশু ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইত,—সে মূর্ত্তিমধুরিমা দেখিতে দেখিতে, অনুতাপীর সে উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইত,—কে যেন দগ্ধবুকে শান্তিজল ঢালিয়া দিত।

যেদিন বঙ্গোপসাগরের ধারে সেই নিবিড় অরণ্যের মাঝে, সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, জ্যোৎস্না-বিধৌত বেদিকার উপর একখানি সজীব প্রতিমা দেখিয়া দস্যুদল ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিল, সেইদিন একজন দস্যু বিশেষভাবে সেই প্রতিমাপানে চাহিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য কি, কে বুঝিবে? সে ব্যক্তি চাহিয়া চাহিয়া বড় কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিল। বোধ হয় সে ইতিপূর্ব্বে এ রমণীকে দেখিয়াছিল। বোধ হয়, কোনকালে সে, এ রমণীর প্রণয়লাভেও যত্নবান্ ছিল। বোধ হয়, তাহার সে আকাঙ্ক্ষার ঘোর এখনও কাটে নাই।

যেদিন প্রভাতে দস্যুদল দেখিল, তাহাদের দলপতি তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেই দিন তাহারা সেই প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া আর একজনকে দলপতি করিতে মনস্থ করিল। সেই আর একজন অতি অল্পদিন তাহাদের দলে মিশিয়াছিল। সে বলবান্, সাহসী, নির্ভীক,—দস্যুকার্য্যে সুদক্ষ ;—সমবেত দস্যুমণ্ডলী তাহা-কেই দলপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু একি! সমস্ত অরণ্য খুঁজিয়াও যে, সে ব্যক্তিকে পাওয়া গেল না। কারণ কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না।

এই ব্যক্তি দলপতির সহিত একই মুহূর্ত্তে সে অরণ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। অন্তরের অন্তরে কি একটা উত্তপ্ত বাসনা-বহ্নি চাপিয়া রাখিয়া, সে দলপতির অনুগ্রহলাভে যত্নবান্ হইয়াছিল। দশ বৎসরের দস্যুতায় যাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়াছিল, শুভক্ষণে সে পাষাণ ফাটিয়া করুণার উৎস ছুটিয়াছে;—তাই দলপতির সে নবজীবনের নবপ্রেমলাভে কেহ বঞ্চিত হইল না;—এই ব্যক্তি তাহার স্নেহে, তাহারই প্রতিবাসীস্বরূপ হইয়া, মালাবার পাহাড়ের পদপ্রান্তে এক অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল।

রাশীকৃত তূলার মধ্যে কণামাত্র অগ্নি রাখিয়া দাও, কিছুকাল পরেই তুলা রাশি পুড়িতে পুড়িতে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করাইবে। এই ব্যক্তি অন্তরের অন্তরে যে পাপ-বাসনা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, দিনে দিনে তাহা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

বন্ধুর ক্ষুদ্র কুটীরে, অপরিসীম স্নেহে, তাহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা ছিল। বন্ধুপত্নীও তাহাকে সমাদর করিতে কখন একটুও ত্রুটি করিতেন না। মহাপাপ সয়তান কিন্তু সে প্রেমমুখ দেখিয়া ইহ-সংসার ভুলিয়া যাইত। সেই পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে তাহার মাথা ঘুরিত, মনে হইত, তাহার চক্ষে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ঘুরিতেছে! যেমন উজ্জ্বল আলোকের মাঝে ক্ষুদ্র মসীবিন্দু সুস্পষ্টরূপে আপনার কালিমত্ব প্রকাশ করে, এই পুণ্যের সংস্পর্শে আসিয়া, এই মহাপাপও তেমনি আপনার হৃদয়ের কালি উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইত। সাহস করিয়া সে, সেই পুণ্য প্রতিমার মুখের পানে চাহিতে পারিত না,—সে পুণ্যহাসির সহিত সাহস করিয়া তেমন হাসিতেও পারিত না, তাহার প্রাণের

ভিতর কেমন ভীতিসঞ্চার হইত। তথাপি হতভাগ্য, সে পঙ্কিল বাসনার হাত এড়াইতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে সে উন্মত্তপ্রায় হইল। জগতের শোভা, জগতের আভা, হৃদয়ের আলো—সয়তানের চক্ষে আগুন জ্বালিয়া দেয়। সে সয়তান বুঝিল, তাহার বাসনা মিটিবে না। যে মূর্ত্তি নয়নে প্রকাশিত হইলে, নয়ন অবনত হইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত অবনত করে,—তাহাকে পাপে প্রলোভিত করা কি সহজ? কিন্তু প্রমত্ত মন নিষেধ মানে না। তখন সেই মহাপাপী, বন্ধুর শান্তিকুটীরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য শ্রীহীন ও একেবারে বিনষ্ট করিতে যত্নবান্ হইল। পাপেই যাহার আনন্দ, পাপেই তাহার সার্থকতা। ইহাতে নিরর্থকতা সে দেখিতে চাহে না।

আবার বন্ধুত্বের সে নির্ম্মল প্রেম মনে জাগিল। সঙ্কল্প-সাধন বুঝি হইল না। অমনি ঈর্ষ্যা জ্বলিয়া উঠিল, জগতের বৈষম্য মহাপাপীর চক্ষে প্রকাশিত হইল। সে কেন এ পঙ্কিলবাসনা লইয়া এখানে আসিল? কেন তাহার ভাগ্যে সুখ মিলিল না? পাপিষ্ঠ আবার প্রতিজ্ঞা করিল,—এ শোভা শ্রীহীনা করিবে।

তখন হৃদয়টা খুব কঠিন করিয়া বাঁধিল। আবার সেই স্বর্গীয় মুখমণ্ডল দেখিল। হায়, সে মুখে এত শোভা কেন হইল?

সে পূর্ণ-পবিত্রতাময় মুখমণ্ডলে সে পুণ্যহাসি দেখিয়া, সয়তান বুঝিল না যে, এ হাসি তাহার প্রতি নহে;—সে প্রেম-উদ্বেলিত বক্ষঃস্থল তাহাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই,—দূরে শিশু ক্রীড়া করিতে করিতে জননীকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসিতেছে, আর জননী হাস্য-মধুরিমা মুখে, স্নেহদৃষ্টিতে তাহাকে

ডাকিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের সেই মধুর হাসিতে জননীর হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহু প্রসারণ করিয়া, হে মহাপাপ সয়তান! সে পুণ্যমূর্ত্তি তোমায় আলিঙ্গন করিতে যায় নাই;—সন্তান কোলে লইতে জননীর ব্যাকুলতা ঐ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল!

কিন্তু নির্ব্বুদ্ধি কামাতুর বাহু প্রসারণ করিয়া সে মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহিল।

যে ভাবিয়াছিল, জীবন বড় মধুময়,—সংসার সুখের,—সৃষ্টি করুণাময়ী, তাহার চর্ম্মচক্ষে এই মহাপাপ-ছবি পড়িল না। সে ইহাও দেখিতে পাইল না যে, তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যার এই প্রেমমূর্ত্তি সহসা কি ভীষণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল!

সে দৃশ্যে কাম-কুক্কুর শিহরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলে, স্ত্রী সকল কথা স্বামীকে জানাইলেন। খুব পরিষ্কার, একখানা আরসিতে একটু খানি হাই দিলে যেমন একটা মলিন ছায়া পড়ে, স্বামীর হৃদয়েও সহসা তেমনি একটা ছায়া পড়িল। তিনি কিছুই বলিলেন না।

সেই দিন রাত্রেও,—সেও এমনি শরতের জ্যোৎস্না-রাত্রি,—সেই দিন রাত্রে শিশুকে কোলে লইয়া, রমণী এক বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিশু মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অস্ফুট মধুর-ভাষায় হৃদয়ের কত ভাব ব্যক্ত করিতেছে,—জননী হাসিমুখে তাহার চুখচুম্বন করিতেছেন। আর তাহার পিতা অন্য গৃহে

থাকিয়া, দূর হইতে অনিমেষ নয়নে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া সেই বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, এবং পূর্ণ আবেগে শিশুর হাসিমুখ শতচুম্বনে ঢাকিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিলেন, সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখের সামগ্রী আর নাই। এমন মায়ার বন্ধনও বুঝি জগতে আর কিছুই নাই! দশ বৎসরের সে ঘৃণিত জীবন যে, এত সুখের অধিকারী হইবে, স্বপ্নেও সে কথা তাঁহার মনে হয় নাই। হৃদয় তখন পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বাস হৃদয় ছাপাইয়া পড়িতেছে;—তেমনি পূর্ণ আবেগে প্রেম-প্রতিমা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া, তিনি শিশুকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সে আনন্দের ভাষা নাই,—স্বামী স্ত্রী উভয়ের চক্ষে জল। কাহার মনে কি ভাব জাগিতেছিল, কেহ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিল না, কেবল উভয়ের অধরে অধর মিলিয়া, ভাবরূপ অব্যক্ত নীরব ভাষা,—পরস্পরের প্রাণে প্রাণে অনন্ত সুখের কাহিনী ব্যক্ত করিতে লাগিল।

তখন শরতের সুনীল আকাশে চন্দ্র হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না-ধারায় পৃথিবী স্নাত হইতেছিল। সহসা সেই বাতায়নের নিম্নে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। বাহিরে কতকগুলি তরুলতার ঘন-সন্নিবেশে ক্ষুদ্র একটু বনের মত দেখিতে হইয়াছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই বনের মধ্যে যে মাধবী-জড়িত উন্নত এক বন্যবৃক্ষ দাঁড়াইয়াছিল, কে একজন যেন তাহার তলদেশে দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রালোকে বাতায়ন-সম্মুখে তাহার ছায়া পড়িয়াছে।

উভয়ে বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অন্য কেহ নহে,—সেই মহাপাপ!

তাঁহাদের অনুমান মিথ্যা নহে। বিবিধ হীনকৌশল অবলম্বন করিয়াও এই পুণ্য-প্রতিমা যখন হস্তগত করিবার আর আশা রহিল না, তখন সেই হতভাগ্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল,—তাহার বন্ধুকে হত্যা করিয়া এই স্বর্ণ-প্রতিমা অধিকার করিবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিবিড় মেঘ উঠিয়া নির্ম্মল আকাশ যেমন ছাইয়া ফেলে, তেমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বামীর হৃদয়ে ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সেই বঙ্গোপসাগরের ধারে, সেই অরণ্যে, দশ বৎসর অতি-বাহিত করিয়া, দলপতির যে কিছু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, সে সকলই দস্যুগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। কেবল অতি সুন্দর এক ধনুর্ব্বাণ অতি যত্নে এই গৃহে রক্ষিত হইতেছিল। সেই একমাত্র ধনুর্ব্বাণই দস্যুজীবনের দশ বৎসরের সাক্ষী-স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। আজি তাহার প্রয়োজন হইল।

তখন সেই ধনুর্ব্বাণ লইয়া, স্বামী অতি শীঘ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু গৃহের চারিদিক্ খুঁজিয়া কোথাও আর সে পাপমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে না পাইয়াও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, রাজপথে আসিয়া চারিদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, সেই সময় যখন রোরুদ্যমান শিশুর কান্না থামাইতে আসিয়া, জননী শিশুকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন, কে এক ব্যক্তি আসিয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইল। সহসা চমকিত হইয়া, শিশুমাতা দেখিলেন, আগন্তুকের সর্ব্বশরীর আবৃত রহিয়াছে;—সুতরাং আগন্তুককে তিনি চিনিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন আগন্তুক শরীর হইতে আবরণ উন্মোচন করিয়া, হাসিমুখে শিশু-মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে উভয়কে চিনিলেন,—ভয় বা কোন উদ্বেগ রহিল না।

আগন্তুক বলিলেন, "এখানে নহে, এখনই সে ফিরিয়া আসিবে, আমি সহসা তাহাকে দেখা দিব না। তুমি শিশুকে লইয়া ঐ বনটার ভিতর এস।"

শিশুকে বক্ষে লইয়া তাহার জননী সেই বনের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল।

যদি পারো, তোমরা ঐ চন্দ্রের আলোক নিবাইয়া দাও! ঐ মাধবীজড়িত উন্নত তরু এ চন্দ্রালোকে যেন আমার সমক্ষে প্রকাশিত না হয়! হায়, আমি কেমন করিয়া সেই শেষকথা বলিব,—তাহাই ভাবিতেছি।

সেই ক্ষুদ্র বনটার ভিতর যে একটা বন্যবৃক্ষ ছিল, তাহা খুব উন্নত, তাহার শাখা প্রশাখায় মাধবী আপনার শাখা প্রশাখা জড়াইয়া-জড়াইয়া সে স্থানটুকু একটু আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল। তেমন যে শরতের জ্যোৎস্না, তাহাও সেখানে বড় পঁহুছিতে পারে নাই। সেই শুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রিতে, চন্দ্রকরোজ্জ্বল সেই মাধবীজড়িত উন্নত পাদপমূলে, সেই অস্পষ্ট ছায়ায় দাঁড়াইয়া যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল——কিন্তু সে কথা বলিবার আগে আর একটা কথা বলি।

হিংসারূপী সেই মহাপাপ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সে ধরা পড়িল। তখন আপনার সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া, সে বলিল, "আমাকে মারিতে হয়, মারো; তুমি নিজে না মারিলেও আমি আপনি মরিব। কিন্তু তোমার স্ত্রী যে অসতী, তাহার প্রমাণ দেখাইব। ঐ দেখ, ঐ বনের মধ্যে কাহারা দাঁড়াইয়া আছে! ঐ শুন, তোমার শিশু, অচেনা লোককে দেখিয়া কাঁদিতেছে কি না!"

হিংসারূপী সয়তানের পাপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কালসর্প এই-রূপে দংশন করিয়া সহসা কোথায় সরিয়া পড়িল।

সত্য কি মিথ্যা, এ চিন্তার এতটুকুও তরঙ্গ উঠিল না। সেই মর্ম্মচ্ছেদী কথা শুনিয়া,—হতভাগ্য স্বামীর সেই দশ বৎসরের দস্যু-জীবন যেন সহসা ফিরিয়া আসিল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"এ বনের মধ্যে তোমরা কে?"

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু শুনা গেল, রমণী চলিয়া আসিতে চাহিতেছেন। তখন আবার তেমনি বজ্রগম্ভীর কঠোর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"তোমাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না,—ঐ খানেই থাকো।"

বিলম্ব সহিল না,—সুতীক্ষ্ণ বাণ তৎক্ষণাৎ ধনুশ্চ্যুত হইয়া সেই ক্ষুদ্র বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সে লক্ষ্য অব্যর্থ হইল।—হায়! চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে সে প্রতিমা, বক্ষে সন্তানসহ ভূমিসাৎ হইল। পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি "পাষণ্ড! কি করিলি" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তখন সেই স্ত্রী-পুত্র-হন্তা মহাপাতকী সেই বনের মধ্যে বৃক্ষান্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, সুতীক্ষ্ণ বাণ কোমলশিশুর কোমল পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া শিশুমাতার বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে।

তখন হতভাগ্য স্বামী সেই স্থানে বসিল। মূর্চ্ছিত বক্তিকে চিনিতে পারিল। মুমূর্ষু সহধর্ম্মিণী কাতরকণ্ঠে বলিলেন,

"স্বামিন্! আমি চলিলাম, আজিও আমার পূজা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে লোকে যাইতেছি, সেই থান হইতেই তোমার পূজা করিব। এই বনের মধ্যে যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলাম, দেখ, বোধ হয়, এই মূর্চ্ছাতেই তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। উহাঁকে দেখিলে চিনিতে পারিবে,—উনি আমার পিতা! কা'ল এই দেশে আসিয়াছেন। দশ বৎসর বনে বনে ঘুরিয়া তুমি কি হইয়াছিলে, তাই রাগ করিয়া, তোমাকে দেখিতে চান নাই। আমি অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিয়াছিলাম। আজ তিনি তোমার সহিত দেখা করিতেন। আমি চলিলাম, কিন্তু এই শিশুটিকে যদি তোমার চরণে রাখিয়া যাইতে পারিতাম, তবে বুঝিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী কে! মায়ের এ স্নেহ-বুক হইতে বাছাকে টানিয়া লইও না; দেখ, এখনও মা বলিয়া ডাকিবার জন্য সে আমার পানে চাহিয়া আছে! তবে যাই প্রভু, আমার জন্য শোক করিও না।"

তার পর?—আর কি বলিব?

মালাবার পাহাড়ের উপর বসিয়া যিনি এই কাহিনী বলিতে বলিতে আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়াছিলেন, সেই ভীষণ রজনীতে তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও অশ্রু নির্গত হয় নাই! মৃত স্ত্রী পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া, একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন, চক্ষে আর পলক পড়ে নাই।

সে রজনীও প্রভাত হইল। রবি-কিরণ সে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিল,—কিন্তু সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আধার একখানি প্রেমমুখ সে গৃহের কোথাও দেখিতে পাইল না! প্রভাতের ছোট ছোট পাখীগুলি বাতায়নে বসিয়া কাহাকে

ডাকিতে লাগিল,—বাতায়ন আলো করিয়া যে বসিয়া থাকিত, পাখীর সুধাকণ্ঠের সহিত যে অস্ফুট কথায় অস্ফুট কণ্ঠ মিলাইত,—আকুলপ্রাণ পক্ষীর দল সে শিশুটিকে কোথাও আর দেখিল না! ভিখারী ভিক্ষা পাইল না। সুখপূর্ণ সে গৃহমাঝে তাহারা দেখিল,—মূর্ত্তিমান্ শোক বিরাজ করিতেছে।

মালাবার হইতে কিছু দূরে সেই যে কুটীর ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। সে স্থানটুকু জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, কুটীর ভূমিসাৎ হইয়া লুপ্তচিহ্নে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সেই মাধবীজড়িত উন্নত তরু আজিও তথায় বিদ্যমান। সেই তরুমূলে দাঁড়াইয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন চিহ্ন পাই নাই। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, বাণবিদ্ধা হইয়া যে স্থানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সে স্থানটুকু আজিও তেমনি পরিষ্কার আছে, তাহার উপর একটিও তৃণ জন্মিতে পায় নাই। কিন্তু সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি,—হায়! চিরদিনের মত মুছিয়া গিয়াছে!

আমার এ কাহিনীর এই খানেই সমাপ্তি। এই পূজার আনন্দ-দিনে এ দুঃখ-কাহিনী না শুনাই ভালো ছিল। কিন্তু শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, আর চন্দ্রকরোজ্জ্বল মাধবীবেষ্টিত এই উন্নত তরু, এবং তরুতলে এই অস্পষ্ট ছায়া,—ইহা দেখিলেই সে কাহিনী আমার মনে পড়ে। পূজার দিনে তোমরা আনন্দ করো, কিন্তু এ আনন্দের দিনে যদি পারো, তবে এস, সেই স্ত্রী-পুত্রহন্তা মহা-দুঃখীর জন্য একটু কাঁদি। যে শাস্তি ভগবান্ তাহাকে দিয়াছেন, যদি তাহাতে তাহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে এস একবার একটু কাঁদি।

উদ্বোধন

"——. We are ancients of the earth,
And in the morning of the times."
——Tennyson.

আভাষ।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ পরিষ্কৃত, নীল। নীলাকাশে চন্দ্র হাসিতেছে। গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে বড় শোভা। আকাশে নক্ষত্র-ফুল, কাননে এই বেলা, মল্লিকা,—মাঝে তুমি প্রেমময়ি! আজি যেন পূর্ণ হৃদয়ে, তোমার পূর্ণ-সৌন্দর্য্য দেখিতেছি! পূর্ণিমানিশীথে, পূর্ণচন্দ্রপানে, ঊর্দ্ধমুখে চকোর যেমন চাহিয়া থাকে, আজ আমিও তেমনি হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষা লইয়া, ঐ মুখপানে চাহিয়া আছি। এই মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া, এই কৌমুদী-বিধৌত নিস্তব্ধ নিশীথে আজি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি।

কি সুন্দর তুমি!—বস্ত্রাঞ্চলে ও মুখখানি ঢাকিও না। সরোবর হৃদয়ে, কমলিনী যেমন প্রভাত-অরুণ-কিরণে ঈষৎ প্রোদ্ভিন্ন হইয়া, অল্পে অল্পে ফুটিতে থাকে, ঐ মুখখানিও তেমনি এই

রক্তিম আভাতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! যদি দেখিলাম, তবে প্রাণ ভরিয়া দেখি, দিবালোকে ও শোভা দেখি নাই। এমন হৃদয়ের কাছে ধরিয়া, এমন লাজমুক্ত,—উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই!—আজ একবার দেখিব।

আবেগ-বিহ্বল ঐ আঁখি ছুটি পানে চাহিয়া, আজি যেন জাগ্রতেও স্বপ্ন দেখিতেছি! কি অমৃত-মাখা মধুর হাসি! এই জ্যোৎস্নার উপর যেন একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। লাজময়ি! কেহ কোথাও নাই, তবু এত সঙ্কুচিতা কেন? এ বুকের ভিতর ও মুখখানি লুকাইলে কেন? এমন চাঁদনী রজনী, এমন মধুর নীরবতা, এমন নিভৃত নির্জ্জনস্থান,—প্রাণের কথা বলিতে এমন অবসর আর কৈ?

আজি যখন তুমি আপন মনে বসিয়া, বিবিধ কুসুমে মালা গাঁথিতেছিলে, দূরে—তোমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া, আমি তাহা দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম, এই কুসুমাধিক কোমল অঙ্গুলিতে, পুষ্পগুলি সূচী-বিদ্ধ হইয়া, কেমন মালাকারে পরিণত হইতেছিল! দেখিতেছিলাম, ঐ মধুর আঁখি ছুটি যেন ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, কি-এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! রক্তিম ওষ্ঠাধর কি মাধুরী-মণ্ডিত!—যেন পূর্ণ বিকসিত শতদলের উপর বান্ধুলির সমাবেশ!

দেখিতে দেখিতে আমি আত্মহারা হইতেছিলাম। কত ভাবে তখন হৃদয় ভরিয়া গেল!—অর্দ্ধ জাগরণ, অর্দ্ধ তন্দ্রা, অর্দ্ধ চেতন, অর্দ্ধ অচেতন! তখন বহুদিনের এক অস্পষ্ট-কাহিনী স্মৃতিমাঝে অস্পষ্টরূপে জাগিতে লাগিল। ক্রমে সে অস্পষ্ট-ছায়া, পূর্ণ-অবয়বে জাগিয়া উঠিল। আজি সেই কাহিনী তোমাকে শুনাইব। এমন

মধুর নীরবতা, এমন নিভৃত নির্জ্জন স্থান,—প্রাণের কথা বলিতে, এমন অবসর আর কৈ? তবে শুনিয়া যাও, আমি অতি ধীরে ধীরে, অতি চুপি চুপি তাহা বলিয়া যাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, নানা আকারে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পুরাতন হইতেছে, পুরাতন আবার নূতনত্বে পরিণত হইতেছে। বসন্ত আসিয়া, নব পত্রপুষ্পে নব ফল-ফুলে বৃক্ষ-লতা সাজাইয়া দিতেছে। নিদাঘে তরুরাজি মৃতপ্রায়, হিমানীতে অর্দ্ধমৃত;—আবার সেই মধুমাসে, চারিদিকে আবার সেই শ্যাম-শোভা,—সেই প্রীতিপ্রফুল্লশ্রী!

তেমনি আবার জীবন ও মৃত্যু, উভয়ের প্রবাহ একই পথে পাশাপাশি ছুটিয়াছে! জীবন চলিয়াছে, মৃত্যু আসিতেছে; মৃত্যু চলিয়াছে, জীবন আসিতেছে;—জীবন ও মৃত্যু, উভয়েই চলিয়াছে, উভয়েই আসিতেছে—গতি অবিরাম!

কবি-কল্পনা,—এই স্থূল, নিয়মাধীন সত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। এই দু'য়ের মাঝে নূতন সৃষ্টি করিতে চায়। কল্পনা একটি প্রাসাদের চিত্র দেখাইল। সেখানে পরিবর্ত্তনের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। শতবর্ষব্যাপিনী মোহ-নিদ্রায় সে প্রাসাদ নিদ্রিত। নূতন ও পুরাতন, জীবন ও মৃত্যু,—সেখানে কিছুই নাই।

কি জানি, কাহার কুহকে, সে প্রাসাদ,—সকল নরনারী, সকল বৃক্ষবল্লরী এবং গৃহপালিত পশু পক্ষী লইয়া, গভীর নিদ্রায়

অভিভূত! বৃক্ষলতায় আর পুষ্প ফুটিতেছে না, নূতন পত্রোদ্গমও হইতেছে না; যেমনি আয়তন, ঠিক তেমনি রহিয়াছে,—হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই নাই। যে রস-সঞ্চালনে বৃক্ষের সজীবতা ও স্ফূর্ত্তি, সে রস শুকাইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ বাঁচিয়া আছে মাত্র, কিন্তু বাঁচিয়াও মৃতের ন্যায় অবস্থিত। পিঞ্জরের শুক, অর্দ্ধতান ধরিয়া, নীরব হইয়াছে; সেও সেই গভীরনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন;—এখনও তাহার ওষ্ঠদ্বয় তেমনি ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কুসুম-কুঞ্জ নিদ্রা-নিমগ্ন। শেফালিকা-শাখায় মধুরকণ্ঠ বিহগ মধুর গানে প্রাসাদ পূর্ণ করিতেছিল, সেও নিদ্রাভিভূত হইয়াছে। আধমুকুলিত যূথিকা-কুঁড়িগুলি ফুটিতে ফুটিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর ফুটিতে পায় নাই। শ্যামদূর্ব্বাদলে শয়ন করিয়া, গাভী রোমন্থন করিতেছিল, সেও সেই অবস্থায় নিদ্রাভিভূতা;—এখনও তাহার মুখে সেই শুভ্র ফেনপুঞ্জ লাগিয়া রহিয়াছে! চঞ্চল হরিণ-শিশুটি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এখনও তাহার ঘুমন্ত-দেহে সে চাঞ্চল্যের ভাব বিদ্যমান।

এমনি নিদ্রায় সকলেই অভিভূত।—কিন্তু নিদ্রা হইলেও কাহাতেও নিশ্বাস বহিতেছে না; অথচ কেহই মৃতও নহে। জীবন আছে, কিন্তু জীবনস্রোত নিস্তব্ধ! প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ।—এমন নিদ্রা, কোন যাদুকরের মায়াবিদ্যা বলিয়াই অনুভূত হয়!

সেই প্রাসাদ-শিখরে, পতাকা নিদ্রাবনত। বায়ু গতিহীন, শ্বাসহীন, তরঙ্গহীন। উন্মুখ উৎস,—হ্রদগর্ভে নিমজ্জিত। গৃহ-প্রাঙ্গণে স্তরে স্তরে সজ্জিত দীপমালা;—তাহা আভাহীন, শোভাহীন, প্রভাহীন, দীপ্তিহীন,—বৃষ্টির পর, ছিন্ন-মেঘের কোলে

বিজলী-বিকাশের ন্যায় অপরিস্ফুট ও ম্লান! গৃহমধ্যে ঘটিকাগুলিও নিশ্চল। একটিও মক্ষিকা উড়িতেছে না। একটিও পিপীলিকা চলিতেছে না। বৃক্ষপত্রের একটুকুও মর্ম্মরশব্দ হইতেছে না। সকলই নীরব, নিঃস্পন্দ, নিদ্রাচ্ছন্ন।

গৃহে মহোৎসব হইতেছিল। সে আনন্দ উল্লাস, সে নৃত্য-গীত,—সকলই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভাণ্ডারপূর্ণ খাদ্য-সামগ্রী তেমনি অবস্থায় বিদ্যমান। ভাণ্ডার-স্বামী ভোজন করিতে করিতে নিদ্রা-ভিভূত,—হস্তে এখনও সেই অর্দ্ধভুক্ত খাদ্য-দ্রব্যটি রহিয়াছে! কাছারীতে বাজার-সরকার হিসাব দেখিতে দেখিতে নিদ্রাচ্ছন্ন;—হস্তে এখনও হিসাবপত্র বিদ্যমান। যুবতী পরিচারিকা—গোপনে, নিভৃতে কোন যুবকের সহিত প্রণয়ালাপ করিতে করিতে ঘুমা-ইয়া পড়িয়াছে, উভয়ের হস্ত উভয়ের হস্তে এখনও সম্বদ্ধ; যুবক মুখচুম্বন করিতে উদ্যত, যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে রক্তিম মুখখানি লুকাই-তেছে;—এখনও সে ভাব নিদ্রায়ও পরিস্ফুট!

রাজাও আপন পারিষদ এবং আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপ নিদ্রায় অভিভূত। জীবনের একটুকুও চিহ্ন কোথাও বিদ্য-মান নাই, অথচ কেহই মৃতও নহে। দূরাগত কোন শব্দ সেখানে পঁহুছিতেছে না। গর্ভস্থ শিশুর কর্ণে, সংসারের কোলাহল যেমন অস্ফুট, এই নিদ্রিত প্রাসাদের নিদ্রিত জনমানবের কর্ণেও, সকল শব্দই তেমনি অস্ফুট।

শত বর্ষ ব্যাপিয়া, এমনি নিদ্রায় সে প্রাসাদ নিদ্রিত। এই শত বৎসরে কোন পরিবর্ত্তন নাই। যেখানে যেমনটি ছিল, সেখানে সেটি ঠিক তেমনি অবস্থায় রহিয়াছে; যে যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক তেমনি অবস্থায় নিদ্রিত।

প্রভাতের রবিকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সে কিরণে সে দীপ্তি নাই। নিশীথের চন্দ্রকিরণে প্রাসাদ স্নাত হইতে থাকে, কিন্তু সে চন্দ্র-কিরণ ম্লান ও অবসন্ন।

প্রাসাদের বহির্ভাগ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হইবে, যেন একটি ক্ষুদ্র বন, আর সেই প্রাসাদ-চূড়া ;—যেন কেহ বনরাজি দেখিবার জন্য মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান।

শতবর্ষব্যাপিনী সে নিদ্রায়, সে প্রাসাদ এমনই নিদ্রিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই নিদ্রিত প্রাসাদের একটি কক্ষে একটি বালিকাও তেমনি নিদ্রায় অভিভূতা। শত বৎসরের নিদ্রা!

বালিকার অতুল রূপরাশি ঘুমাইয়া পড়িয়াও, অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সে গৃহ আলো করিয়া রাখিয়াছে। সেই স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে, সে কুসুম-সুকুমার দেহে লাবণ্য যেন আর ধরিতেছে না! রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। জ্যোৎস্না-স্নাতা নিদ্রালসা লহরীমালা সাগরবুকে যেমন ঘুমাইয়া পড়ে, আর তাহার সেই ঘুমন্ত লাবণ্য-টুকু তবুও যেমন জাগিয়া থাকে, বালিকার সেই অসীম রূপরাশিও তেমনি সে গৃহ আলো করিয়া আছে। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলরাজি আগুল্ফ-লম্বিত ;—ললাটে, চিবুকে, কণ্ঠে, চক্ষে, সেই ঈষৎ-কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ইতস্ততঃ যে যেমন ভাবে পড়িয়াছিল, ঠিক তেমনি আছে। বালিকার সেই কুসুম-কোমল বাহুযুগল অলস-ভাবে পড়িয়া আছে। বসনখানি আলু-থালু হইয়া, সেই শোভা-ময়ীর দেহখানি ঢাকিয়া আছে। সেই কক্ষমধ্যে যে রত্নদীপ

জ্বলিতেছিল, তাহা পরিম্লান ও জ্যোতিহীন। বালিকার সেই নিমীলিত আঁখি দুটি অপূর্ব্ব শোভার আধার। কিন্তু হায়, সকলই স্তব্ধ! একটুকুও শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না, বক্ষঃস্থল একটুকুও স্ফীত হইতেছে না; বক্ষের উপর যে কেশগুচ্ছ পড়িয়াছিল, তাহাও একটুকু নড়িতেছে-চড়িতেছে না! আধ-ঢাকা, আধ-খোলা, সৌন্দর্য্যের এই জীবন্ত চিত্রখানি শতবর্ষ এমনি নিদ্রায় অভিভূত! জড়দেহে যেমন চৈতন্তের প্রকাশ, বালিকার সেই রূপও তেমনি,—সেই নিস্তব্ধ প্রাসাদের অশরীরী নিস্তব্ধতায় প্রেম মিশাইয়া দিয়াছে;— রবিকিরণেও আলোকের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করিয়াছে! সে মোহিনী মূর্ত্তি এমনি উপাদানে গঠিত। বালিকা ঘুমাইতেছে; শতবর্ষ ধরিয়া সেই শতবর্ষ-নিদ্রিত প্রাসাদের মধ্যে এমনি ভাবে ঘুমাইতেছে,—একটি স্বপ্ন আসিয়াও সে নিষ্কলঙ্ক চাঁদমুখখানির রূপান্তর করিতে পারিতেছে না। বোধ হইতেছে, যেন বিধাতার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি এই বালিকা-মূর্ত্তি, পূর্ণ শান্তিপ্রবাহে নিমজ্জিতা! *

এইরূপে সকলকে লইয়া, সে প্রাসাদ, শতবর্ষ-ব্যাপিনী নিদ্রায় অভিভূত।

শতবর্ষ কবে পূর্ণ হইবে? কবে আবার এই নিদ্রিতগণের এই মন্ত্রমোহের অবসান হইবে? কবে আবার ইহাদের কাল ও সময়ের জ্ঞান হইবে? দর্শন বিজ্ঞান, কাব্য ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজ প্রভৃতির জ্ঞানে পৃথিবী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে,—এই নবীনা পৃথিবী কবে আবার তাহারা দেখিবে? পৃথিবীকে যেমনটি দেখিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তেমনটি তো আর নাই,—এই

* "A perfect form in perfect rest!"

শতবর্ষে পৃথিবী আবার নূতন সৌন্দর্য্যে শোভাময়ী হইয়াছে;— কবে আবার এই নিদ্রিতগণ এই নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত,—নূতন জ্ঞানে উদ্বোধিত হইবে!

সুখ এস, দুঃখ এস; আশা এস, নিরাশা এস; মঙ্গল এস, অমঙ্গল এস;—এই নিদ্রিত প্রাসাদের সকল জ্ঞান তিরোহিত!

আর, দেবতার প্রিয়সন্তান,—অপূর্ব্ব পুরুষ তুমি! তুমিও এস! এই যাদুমন্ত্র ভেদ করিয়া, এই নিদ্রিত প্রাসাদ উদ্বোধন করো!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শতবর্ষ পূর্ণ হইল। কোন্ অজ্ঞাত সুদূর প্রদেশ হইতে, অজ্ঞাত এক অপূর্ব্ব পুরুষ সেখানে উপস্থিত হইলেন। রূপ-জ্যোতিতে তাঁহার মধুর অবয়ব প্রদীপ্ত, যৌবনের অমিতবিক্রমে ও অতুল উৎসাহে, সে অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। নানা দেশ, পাহাড়পর্ব্বত, নদনদী অতিক্রম করিয়া, সেই অজ্ঞাত পুরুষ,—সেই প্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইলেন।

ভাগ্য প্রতিকূল থাকিলে, কে কবে প্রেমের পথে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? অদৃষ্ট শুভ না হইলে, প্রেমের জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, সাধ পূর্ণ হয় না, আশা ফলবতী হয় না। কোথায়, কতদূরে, কোন্ হৃদয়ের সহিত এ হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধা আছে, কে জানে! কে জানে; কত দিনে, কি উপায়ে, সে জীবনাধিক সর্ব্বস্বধন হৃদয়ের নিকট আসিবে! প্রেম অদৃষ্টের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুধাবন করিতে থাকে। * কিছুই বুঝা যায় না, সকলই অস্পষ্ট।

---

* "Love is sequel works with fate."

যুবক কেন সেখানে আসিলেন, কিছুই জানেন না। তাঁহার মনে হইত, নিয়তই কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে,—"ঐ খানে চল; অমূল্যরত্ন লাভ হইবে!" কি সে রত্ন, তাহা জানেন না, তবু চলিলেন। অন্তরের অতি নিভৃত প্রদেশে কে যেন নিয়তই উত্তেজনা করিত; তাই সুদূর প্রদেশ হইতে অগণ্য নদনদী, পাহাড়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দেবপ্রেরিত সেই অজ্ঞাত পুরুষ,—সেই নিদ্রিত প্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন, তাঁহারই মত শত শত লোক এই প্রাসাদ হইতে সে অমূল্য রত্ন লইতে আসিয়া, বিফলমনোরথ হইয়া, প্রাণ হারাইয়াছে। শত শত বীরের মৃতদেহে ও অস্থিকঙ্কালে সে প্রাসাদের পথ আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া, এই দেব-প্রেরিত অজ্ঞাত-বীরপুরুষের বীর-হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি সেই নিদ্রিত নিস্তব্ধ প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,— "দেখিতেছি, এই দুঃসাধ্য কার্য্যে অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছে; কিন্তু আমি ফিরিব না। অনেকেই মাটি খনন করিয়া মরে, কোহিনূর-লাভ একজনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে!"

যুবক, বাহিরের সে ক্ষুদ্র বন ভেদ করিয়া, প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ ও উৎসাহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল; মুখমণ্ডল রক্তিম আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন, হৃদয়ের ভিতর দুপ্-দুপ্ শব্দ হইতে লাগিল। অভীষ্ট-বস্তু নিকটে পাইলে, প্রাণের ভিতর যে ভাব হয়, ইহাও তদ্রূপ।

যুবক একেবারে সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। শয্যায় সেই নিদ্রিতা বালিকার অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিয়া চরিতার্থ হইলেন!— "এই কি সে অমূল্যরত্ন? হৃদয় শান্ত হও!"—তবু যুবকের বুকের

ভিতর সেই দুপ্‌দুপ্‌ শব্দ।—প্রতি শিরায়-শিরায় তড়িৎ ছুটিতে লাগিল, হৃদয়ে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইল।

যুবক নতজানু হইয়া, বালিকাকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন,—"আহা কি সুন্দর তুমি! উঠ প্রেমময়ি! আর ঘুমাইও না।" যুবক পূর্ণ-আবেগে বালিকার মুখচুম্বন করিলেন।

একটুকু স্পর্শ, একটিমাত্র চুম্বন! অমনি শতবর্ষের সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। যুবকের সেই স্পর্শে ও সেই চুম্বনে কি সঞ্জীবনী-সুধা মিশ্রিত ছিল, কে জানে! রবিকরসংস্পর্শে নীহারবিন্দু যেমন অদৃশ্য হয়, সেই মধুর চুম্বনেও তেমনি সে মায়া তিরোহিত হইল।

সেই চুম্বনের গুণে তখন সে নিদ্রিত প্রাসাদও জাগ্রত হইল। নিস্তব্ধ ও অচল ঘটিকাগুলি একেবারে সব বাজিয়া উঠিল। দাস-দাসী ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পিঞ্জরের শুক অর্দ্ধতান সম্পূর্ণ করিল; দীপমালা উজ্জ্বল হইয়া প্রদীপ্ত হইল; বায়ু সঞ্চালিত হইতে লাগিল; হ্রদগর্ভে নিমজ্জিত উৎস আবার ঊর্দ্ধমুখ হইল;—চারিদিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

প্রাসাদ-শিখরে আবার সেই পতাকা পতপত উড়িতে লাগিল। কুসুমকুঞ্জ মধুর সৌরভে পূর্ণ হইল। স্তবকে স্তবকে বেলা, মল্লিকা, অপরাজিতা ফুটিতে লাগিল। আধ-ফোটা যূথিকা-কুঁড়িগুলি প্রস্ফুটিত হইল; বৃক্ষবল্লরী আবার নূতন জীবন পাইয়া শ্যাম-শোভায় সজ্জিত হইল। ভ্রমর গুঞ্জরিল, সেফালিকা-শাখায় পিক কুহরিল, সুশোভনা হরিণী চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, গাভী রোম-ন্থনে প্রবৃত্ত হইল,—চারিদিকের সেই রুদ্ধ-জীবন-স্রোত আবার প্রবাহিত হইল!

ভাণ্ডার-স্বামী অর্দ্ধভুক্ত খাদ্যদ্রব্য আবার ভক্ষণ করিতে আরম্ভ

করিলেন। বাজার-সরকার হিসাবপত্র দেখিতে লাগিল; যুবতী পরিচারিকা আবার সেই যুবকের সহিত প্রণয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইল; প্রাসাদের সর্ব্বত্রই আবার নূতন দৃশ্য প্রকটিত হইল।

রাজা পারিষদবর্গের সহিত জাগ্রত হইলেন। কেহ বলিলেন, "আহারের পর অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র নিদ্রা গিয়াছি।" রাজার নিকট ইতিপূর্ব্বে কেহ একটা বিল পাস্ করিতে আনিয়াছিল, সে এখন বলিল,—"মহারাজ, বিলখানা এইবার পাস করিয়া দিন। আমি অর্দ্ধঘণ্টাকাল ইহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।"

কেহ বুঝিল না যে, শতবর্ষব্যাপিনী সে নিদ্রায়, সকলে অচেতন ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রতনে রতন মিলিল। প্রকৃত বীর বিনা এ অমূল্য রত্ন আর কাহার ভাগ্যে মিলিয়া থাকে! বীর-অঙ্কেই রমণীরত্ন শোভা পায়।

বালিকা, যুবকের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিল। যুবক স্নেহ-আলিঙ্গনে বালিকাকে বদ্ধ করিলেন। উভয়েই উভয়ের হাতে হাত দিয়া, বাহুতে বাহুতে প্রেমবন্ধন বাঁধিয়া, সুদূর প্রদেশে চলিয়া গেলেন।

তখন সেই পুরাতন জগৎ, বালিকার চক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নবীন প্রাণে, নবীন জ্ঞানে জগৎ আবার নূতন হইয়াছে,—সে পুরাতনের চিহ্নমাত্রও তখন বিদ্যমান নাই। তাই বালিকা কিছুই চিনিতে পারিল না।

উভয়ে চলিতে লাগিল। পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, বন উপবন, —নানা স্থান অতিক্রম করিয়া উভয়ে অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। যুবক, এক হস্তে বালিকার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া, অন্য হস্তে দেখাইতে লাগিলেন,—কোথাও রবিকর-উদ্ভাসিত শ্রুতি-মধুর গিরিনির্ঝর; কোথাও অরণ্যানীর ঘনচ্ছায়া; কোথাও নয়নমুগ্ধকর তুঙ্গশৃঙ্গ, কোথাও "তমালতালে-বনরাজী-নীল" সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ,—প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব ছবি চারিদিকে দেদীপ্যমান।

তেমনই আবার মনুষ্যের অপূর্ব্ব-প্রতিভা-সৃজিত, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সকল,—যুবক বালিকাকে দেখাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয়ে অবিরাম গতিতে চলিলেন।

কোথায়,—কতদূরে, কতদিনে সে গতির শেষ, কে জানে,—কে বলিতে পারে!

বালিকা সোহাগভরে বলিল, "প্রিয়তম! কি মধুর তোমার সে প্রেমচুম্বন! তেমনি চুম্বনের জন্য আবার শতবর্ষ ঘুমাইতে সাধ হয়।"

"আর ঘুমাইও না, প্রেমময়ি! এমনই সে চুম্বন!"

যুবক, আবার—আবার শতচুম্বনে সে মুখখানি রক্তিমাভ করিলেন।

আবার চলিলেন। কত দূর-দূরান্তরে চলিতে লাগিলেন। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে। তরঙ্গায়িত মেঘের উপর চন্দ্র ভাসিয়া-ভাসিয়া চলিয়াছে। নিদ্রাহীন, শ্রান্তিহীন সপ্তঋষি জাগ্রতনয়নে জগতের পানে চাহিয়া আছেন। জাগ্রত নয়নে যেন জগতের ইতিহাস-পর্য্যালোচনায় নিবিষ্টচিত্ত!—সে আধ-আলো, আধ-আঁধার ঘুচিয়া ক্রমে সুপ্রভাত হইল।

যুবক বলিলেন, "কি মধুর নিদ্রায় তোমার এই আঁখি দুটি ঘুমাইয়া ছিল!"

বালিকা। কেমন মধুর ভাবেই বা সে সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল!

"কি ভাগ্যবান্ আমি,—আমার সে চুম্বনে তোমার মোহ-নিদ্রা অপসারিত হইয়াছে!"

"প্রিয়তম! সে মধুর চুম্বনে মৃতদেহেও জীবনীসঞ্চার হয়!"

উভয়ে আবার চলিল। পূর্ব্বের রবি পশ্চিম-আকাশে ঢলিয়া পড়িল। সন্ধ্যার আধ-আলো, আধ-ছায়া, ক্রমে ঘনীভূত অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।

এমনই কতদিন, কতরাত্রি চলিয়া গেল,—তথাপি উভয়ে চলিয়াছে; সে গতির বিরাম নাই।

"প্রিয়তম! আর কতদুর যাইব? তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?"

"চল প্রাণাধিকে, আমার পিতৃ-ভবনে! তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। এই নূতন জগৎ দেখিয়া তুমি এত বিস্মিত হই-তেছ?—সেখানে আরও কত দেখিবে! তখন না জানি, এই বিশাল আঁখি দুটি বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া আরও কি মধুর শোভা ধারণ করিবে!"

আবার সেই মধুর চুম্বন,—সেই সস্নেহ আলিঙ্গন! শ্রান্তিহীন, নিদ্রাহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন,—উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি যায়, দিন আসে; দিন যায়, রাত্রি আসে—বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ,—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দুইটি প্রাণ এক হইয়া, অনন্ত কালের জন্য, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পথে চলিতে লাগিল।

কে জানে, এ গতির সীমা কোথায়? অসীম-ব্রহ্মাণ্ড-পথে, কে সে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্র অস্ত যায়, ম্লান-জ্যোৎস্না-আবরণে পৃথিবী ঢাকিয়াছে। কি নীরব নিথর যামিনী! কি নিস্তব্ধ নিদ্রিত এ সংসার! কি সুন্দর তুমি প্রিয়তমে! এমনি নিশীথে, এমনি নিভৃতে, এমনি নিস্তব্ধতায়, সেই স্বপ্ন-বালার মত, যদি তোমাকেও নিদ্রিতা দেখিতাম, তবে না জানি, কত সুখে, কি সুধা-চুম্বনে, ঐ নিদ্রিত আঁখি দুটি জাগাইয়া তুলিতাম! তেমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে? জীবনের সর্ব্বস্ব তুমি,—হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, হাতে হাত দিয়া, তোমাতে আমাতে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পথে চলিতে থাকিতাম! জীবন অনন্ত, কালও অনন্ত, এ ব্রহ্মাণ্ডের পথও অনন্ত! —অনন্ত কালের জন্য দুটি প্রাণে মিলিয়া, এক মহাপ্রাণ হইয়া, অনন্ত পথের যাত্রী হইতাম! ক্ষুদ্র এ সংসার-জ্ঞানে, আকাঙ্ক্ষা-বিহঙ্গ যেন চিরবদ্ধ রহিয়াছে! অনন্ত এ বিরাট-বিশ্বে, অনন্ত সে জ্ঞানজ্যোতি কিছুই দেখিলাম না, কিছুই জানিলাম না! পুরাতনের মধ্যে অন্ধ হইয়া, কেবল বাঁচিয়া আছি মাত্র। কৈ, সে নবীন প্রাণ, নবীন আকাঙ্ক্ষা, নবীন জ্ঞান, নবীন জগৎ?—কৈ, কোথায় সে সব?

কিছুই নাই! দিনের সমষ্টি মাত্র যেন এ দুর্লভ মানব-জীবন! আত্মা নিদ্রিত;—হায়! এ নিদ্রিত আত্মার তেমন উদ্বোধন কবে হইবে?

কিন্তু প্রাণাধিকে! বলো দেখি, তেমনি উদ্বোধের জন্য, তেমনি নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

"শতবর্ষব্যাপিনী সে নিদ্রা!"

তা হোক্। সংসারের কোলাহল হইতে আপনার প্রাণাধিক সাথীগুলিকে লইয়া, সকল আত্মীয়-স্বজনে মিলিয়া, তেমন নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয় নহে? শতবর্ষ ব্যাপিয়া নিদ্রায় অচেতন থাকিব! আবার যখন জাগিব, দেখিব,—জগৎ নূতন! সে নূতন জগৎ, নূতন রবির—নূতন কিরণে উদ্ভাসিত! নূতন লোক, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাবা, নূতন উন্নতি,—সকলই নূতন! সেই নূতন দেখিয়া আবার ঘুমাইব। আবার জাগিব; জাগিয়া দেখিব, নূতন জগৎ আরও নূতন, নূতন জ্ঞান আরও নূতন, নূতন প্রাণ আরও নূতন! আবার ঘুমাইব! যখন দেখিব, মানবে মানবে শক্রতা বাধিয়াছে, কাহারও জন্য কাহারও হৃদয়ে প্রীতি নাই, স্নেহ নাই, দয়া নাই,—চারিদিকে হিংসার অনল, পাপের প্রবাহ, দারুণ রক্তপাত,—তখন ঘুমাইব! যখন দেখিব, মানুষ পশুর অধম, দেবতার আসনে পিশাচের অধিষ্ঠান, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, পুণ্যের পরাজয় ও পাপের জয়,—তখন ঘুমাইব! যখন জাগিব, কি দেখিব?—দেখিব, জগৎ দেবতার লীলাভূমি!—সংগ্রাম নাই, বিদ্রোহ নাই, হিংসা নাই, পাপ নাই! নবীন আলোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত; নবীন প্রাণে জগৎ অনুপ্রাণিত; নূতন জ্ঞানে জগৎ উদ্বোধিত;—মানবে মানবে প্রীতি, স্নেহ, সখ্য,—মহান্ ভ্রাতৃভাবে সকল মানুষ এক মহাজাতিতে পরিণত! দুর্জ্জয় শক্তিতে দেবতার সন্তান মানুষ,—অমিত-তেজা, অমিত বিক্রমশালী! আর দেখিব কি? দেখিব,—নূতন দর্শন, নূতন বিজ্ঞান, নূতন কাব্য, নূতন ইতিহাস, নূতন সাহিত্য, নূতন সমাজ, নূতন প্রাণ, নূতন সভ্যতা!—পুরাতনের উপর নূতনত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ!—মানবের সর্ব্বভেদিনী

প্রতিভা, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত মহা তত্ত্বের আলোচনায় ধ্যান-নিমগ্ন! মানবের জ্ঞান, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত অনন্ত রহস্য-উদ্ঘাটনে নিযুক্ত ;—সৃষ্টির মুখাবরণ খুলিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে তন্ময়-চিত্ত! মানবের চিন্তা,—সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অগম্য, স্বপ্রকাশেও অপ্রকাশ, অপ্রকাশেও স্বপ্রকাশ—সেই অনাদি অনন্তের জ্ঞানে আত্মহারা—তখন জাগিব! শতবর্ষ নিদ্রায় থাকিয়া, এইরূপ নূতন জগৎ দেখিতে আবার জাগিব! জাগিয়া আবার দেখিব, সেই নূতন জগৎও আবার পুরাতন হইয়া আরও নূতন হইয়াছে! যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চির-উন্নতির পথে জগৎ এমনই চলিতে থাকিবে। আমরা একবার করিয়া উঠিব,—সেই নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইব বলিয়া। আজি তো নূতনত্বের এই প্রভাতকাল। কিন্তু যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তখন যে নূতন মানবে এই জগৎ পূর্ণ হইবে, তাহারা আবার আমাদের পানে চাহিয়া ভাবিবে,—ইহারা কত পুরাতন!

এই সুপ্ত-আত্মা উদ্বোধন করিতে, তেমন মহাশক্তি কি আসিবে না?
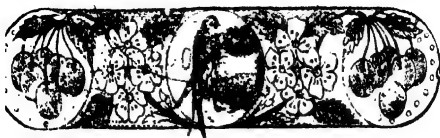
সংসার

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ছুটিতেছে। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। গঙ্গাবক্ষ ভয়ানক আলোড়িত হইতেছে।

অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ভীষণ ছায়া,—সেই প্রবল বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে।

একখানি ক্ষুদ্র তরণী। সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, ভীষণ গঙ্গাবক্ষে একটিমাত্র আরোহী এই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া ভাসিতেছিল। নৌকার পাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দাঁড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দু'এক স্থানের কাঠও সরিয়া পড়িয়াছে। নৌকা তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার ভাসিয়া যাইতেছে। ভাসিয়া ভাসিয়া কোন আবর্ত্তের মাঝে ঘুরিতেছে, আবার অনেক দূর সরিয়া পড়িতেছে। আরোহী উর্দ্ধনেত্র হইয়া, আকাশ পানে কি দেখিতেছে।

আকাশ অন্ধকার। চারিদিকের তরঙ্গ আসিয়া নৌকা ঘিরিল।

একটা অত্যুচ্চ তরঙ্গ আসিয়া নৌকার উপর পড়িল, তার পর আর একটা, তার পর আর একটা। নৌকা হেলিয়া পড়িল। আরোহী একবার চারিদিক চাহিল,——সীমা নাই—কূল নাই—শেষ নাই! এ ভীষণ দুর্য্যোগে, গঙ্গা কূল-সীমা-বিবর্জ্জিতা।

নৌকা ডুবিল। ধূ-ধূ-ধূ হু-হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে, ফেনরাশি মাথায় লইয়া তরঙ্গ ছুটিয়াছে।—আরোহী কোথায়?

মুহূর্ত্তের জন্য একবার ভাসিয়া উঠিল। হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে একবার কাহাকে ডাকিল, হস্ত বদ্ধাঞ্জলি হইল। আকাশ অন্ধকার, বাতাসে ও তরঙ্গে ভীষণ রব।

কেহ দেখিল না, কেহ শুনিল না।

গভীর অন্ধকার। আকাশ মেঘপূর্ণ। গঙ্গা তরঙ্গালোড়িতা। কোথাও কিছু নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই ভীষণ অন্ধকারে, সেই ভয়ানক গঙ্গাকূলে, একজন নির্নিমেষ নয়নে আকাশপানে চাহিয়া বসিয়াছিল। চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে কথা নাই, হৃদয়েও ভাষা নাই! তাহার ক্রোড়দেশে একটি মায়াপুত্তলি,—শিশুকন্যা সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

* * * * *

নির্ম্মল প্রভাত। নির্ম্মল আকাশে রবির স্নিগ্ধ কিরণ। মৃদুর বাতাস। মধুর বিহগ-সঙ্গীত। গঙ্গার জল স্বচ্ছ, স্থির, তরঙ্গ ভ্রূকুটী-বিহীন।

সে ভীষণ অন্ধকার কৈ? সে ভীষণ জলোচ্ছ্বাস কৈ? সে ভীষণ তরঙ্গ কৈ? সে উর্দ্ধনেত্র, বদ্ধাঞ্জলি নৌকারোহীই বা কৈ?

কোথাও কিছু নাই!

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই গভীর অন্ধকারে, সেই ভয়ানক গঙ্গাকূলে,—মায়ার পুত্তলি, অচেতন শিশুকন্যা ক্রোড়ে লইয়া উর্দ্ধনেত্রা হইয়া যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ, এখন একবার তাহার বুকের ভিতরটা দেখ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, তরুণ রবি-কিরণে দিক্ সকল মুখরিত হইয়াছে। দুঃখিনী গঙ্গাপানে, নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া আছে; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। দুঃখিনীর সে চক্ষের পলক বুঝি পড়িতেছে না, নিশ্বাস বুঝি বহিতেছে না, শোণিতও বুঝি চলিতেছে না,—সব স্থির, সব নিশ্চল।

দুঃখিনী সেই এক ভাবেই বসিয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। বাতাসের বেগ কমিল। গঙ্গাবক্ষ স্থির হইল। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ উঠিল। চাঁদের কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল হইল;—যুবতী তথাপি গঙ্গাপানে চাহিয়া আছে। কিন্তু হায়, কোথাও তো কিছুই নাই! সেই নির্ম্মল নীলাকাশ তলে, চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গাবক্ষে,—কোথাও তো কিছুই নাই! একটি ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড ও একটি দাঁড়, গঙ্গায় ভাসিতেছে; আর একটি দেহ,—গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়াছে।—তথাপি সে বিষাদ-প্রতিমার অনিমেষ-আঁখি গঙ্গাপানে চাহিয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে প্রাণের সকল যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া, যুবতীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া, একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল।

তখন শিশু কন্যাটিকে বুকের ভিতর লইয়া, দুঃখিনী উঠিল। শতগ্রন্থিময় মলিন বস্ত্রখণ্ডে কুসুম-সুকুমার দেহ ঢাকিয়া,—আলু-লায়িত কুন্তলা সে মলিনমূর্ত্তি,—কৌমুদী-বিধৌত সেই গঙ্গাসৈকতে ঘুরিতে লাগিল। যাহা খুঁজিতে লাগিল, তাহা পাইল না,—তবু চলিল। তটস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছগুলি চরণের গতিরোধ করিতেছে, কণ্টকবৃক্ষের সংঘর্ষণে চরণ হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে,—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। দুঃখিনী শূন্যমনে চলিয়াছে।

সেই নির্ম্মল নীলাকাশতলে, সেই চন্দ্রকিরণ-বিধৌত গঙ্গা-সৈকতে,—শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া, মলিন-বসনা, রক্ত-প্লাবিত-চরণা,—দুঃখিনী শূন্যমনে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া, গঙ্গার পানে দেখিতে লাগিল। চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল অগাধ জলরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—কিন্তু হায়! আর তো কোথাও কিছু নাই!

দুঃখিনী বিধবা গৃহে ফিরিল। তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব,—[illegible]গাগর্ভে চিরনিদ্রিত!—সেই নিদ্রিতের পার্শ্বে আপনার হৃদয় [illegible]াহিয়া [illegible]—সেই ম্লান-ছায়া গৃহে ফিরিল!—ব[illegible] ভিতর সেই মায়া-রাখিয়া,[illegible] জন্য। কন্[illegible]দেশে [illegible] পুত্তলি শিশু-ক[illegible] [illegible]টির এখন চৈতন্য হইয়াছে।

মাতাকে গৃহাভিমুখী দেখিয়া, কন্যা আধস্বরে জিজ্ঞাসিল, "মা, বাবা কৈ?"

মায়ের মুখে তো কথা নাই! অবোধ শিশু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবা কৈ?"

জননী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গঙ্গাপানে দেখাইয়া দিলেন। কন্যা

সেইদিকে চাহিল। কিন্তু কিছু দেখিতে না পাইয়া, আপন মনে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। তারপর কি মনে করিয়া, মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অবোধ শিশু কি তবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, গঙ্গা-গর্ভে তাহার পিতা চির-নিদ্রিত?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই দুর্য্যোগের দিন বেশী বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু বড় ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছোট বড় অনেক বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বৃক্ষসমূহ একরূপ পত্রশূন্য হইয়াছে। পথ ঘাট,—বৃক্ষপত্রে ও নানা প্রকার তৃণ-গুল্মে ভরিয়া গিয়াছে। ধনীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়াছে, ভিখারীর জীর্ণ-কুটীরও পড়িয়াছে।

এই সকল দেখিতে দেখিতে সেই দুঃখিনী বিধবার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তখন তিনি অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। হায়! তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীর খানির মধ্যে যে, তাঁহার অষ্টম বৎসরের পীড়িত পুত্রটি ঘুমাইয়া আছে!

একস্থানে সারি সারি কতকগুলি নারিকেল ও আম্রবৃক্ষ। তাহারই মাঝখানে এই ক্ষুদ্র কুটীর খানি ছিল। কুটীরের পশ্চাতে সুন্দর মাঠ। মাঠ হইতে দুঃখিনী দেখিলেন, তাঁহার সে কুটীর নাই,—দুই চারিটা গাছ তাহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কুটীর নাই,—কুটীরের তৃণাচ্ছাদিত সেই চালাখানি ভূমিসাৎ হইয়াছে;—মৃত্তিকা-প্রাচীরেরও সেই দশা হইয়াছে। তখন সে ম্লান-ছায়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। বক্ষস্থিত সেই শিশু-কন্যা কাঁদিয়া

উঠিল ;—তবুও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। দুঃখিনীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল ; অধরোষ্ঠ কাঁপিল ; হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল ; মুক্ত কেশরাশি বায়ু-ভরে উড়িতে লাগিল ; অঞ্চল ভূমিতে লুটাইল ;—হায়, তাঁহার সে কুটীর নাই!

কুটীর নাই,—তবে কি কুটীরমধ্যস্থ সেই অষ্টম বৎসরের সে পীড়িত পুত্রটিও নাই ?

অনাথিনী শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কন্যাকে উঠানে বসাইয়া, ভূপতিত গৃহ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই তো দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সে প্রাণাধিক, পীড়িত শিশুটি তবে কোথায় গেল ?

কম্পিতকণ্ঠে জননী ডাকিলেন,—"বাবা আমার, কোথায় তুই ?"

কেহ উত্তর দিল না। চাহিয়া চাহিয়া জননী দেখিলেন, সেই ভূপতিত তৃণাচ্ছাদিত চালাখানির ভিতর,—একখানি ক্ষুদ্র হাত ঈষৎ দেখা যাইতেছে। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে সে চালাখানি একটু উঁচু করিয়া, জননী দেখিলেন, এক বংশখণ্ড তাঁহার প্রাণ-পুত্তলির পৃষ্ঠভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল দিয়া বহির্গত হইয়াছে! আর মৃৎপ্রাচীরের একটা ধ্বস্ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বালকের ললাট চূর্ণীকৃত করিয়াছে!

তখন সেই সদ্যো-স্বামিবিয়োগ-বিধুরা অনাথিনীর দশা কি হইল, পাঠক আপন মন দিয়া বুঝুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঝড় থামিয়াছে, দরিয়ায় কিন্তু তুফানের বিরতি নাই!

*   *   *   *

দুঃখিনী বিধবার বুক ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আবার সেই ভাঙ্গাবুক জোড়া দিতে হইল। দুধের শিশু সেই মায়া-পুত্তলি কন্যাটির মুখের পানে চাহিয়া, তাঁহাকে আবার এই সংসার-ঝড়ে যুঝিতে হইল!

এক দয়ার্দ্র জমিদার কৃপা-চক্ষে দুঃখিনীকে দেখিলেন। দয়া করিয়া আপন উদ্যানবাটীতে বিধবাকে আশ্রয় দিলেন। দুঃখিনীর ক্ষুদ্র জীবনের শেষকথা এইখানেই শেষ করিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানা বৃক্ষরাজিপূর্ণ ক্ষুদ্র বাগান। যেথানে সারি সারি কতকগুলি আম্র-বৃক্ষ নানাবিধ পক্ষীর কুলায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নিকট একথানি জীর্ণ কুটীর। কুটীরের চালাথানির দুই এক স্থান তৃণশূন্য; তাহাতে মধ্যাহ্নে রবিকিরণ প্রবেশ করে; বর্ষায় তাহার মধ্যে জল পড়ে। চালাথানির উপর লাউ-কুমড়ার গাছ উঠিয়া সে তৃণ-শূন্য-স্থান কতকটা ঢাকিয়া রাথিয়াছে। সেই শিশু কন্যাটিকে লইয়া দুঃখিনী বিধবা এই কুটীরে রহিলেন। বিধবার নাম গৌরী; কন্যার নাম কমলা।

গৌরী কুটীরবাসিনী হইলেও তাহার রূপের অভাব ছিল না। তাহার রূপের আলোকে কুটীর আলোকিত হইত। সেই নির্ম্মল মুখমণ্ডলে একটু বিষাদচ্ছায়া সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত,—ক্ষণেকের

জন্যও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, দুঃখিনীর সে রূপের আলো যেন আরও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌরীর সে প্রশান্ত আঁখি যুগলে যে পবিত্রতা ছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রতি অঙ্গসৌষ্ঠবে, প্রতি কটাক্ষে, যে সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্য ছিল, তাহা এ কুহকছুরিতপূর্ণ সংসারে বড় বিরল। সমস্ত দিনে একবার মাত্র আহার,—তাহাও অতি সামান্য, তাও আবার সকল দিন জুটিয়া উঠে না;—তবু এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য! ভোগ-বিলাসের উপর যে সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, এ তাহা নহে। পরন্তু চিত্তের পবিত্রতা হইতে যে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হয়, এ সেই সৌন্দর্য্য।

গৌরী,—বিংশতি বর্ষ বয়স্কা। এক বৎসর হইল, তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়াছে; তাহার সহিত তাহার সকল সৌভাগ্যও জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। কন্যাকে অবলম্বন করিয়া, দুঃখিনী কষ্টে জীবনধারণ করিতে লাগিল।

'বিধবার জীবনধারণ কি বিড়ম্বনা!'—গৌরী অনেককে সে কথা বলিতে শুনিয়াছে; কিন্তু তাহার বিশ্বাস অন্যরূপ।—"হিন্দু-বিধবার জীবনের লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। কার্য্যশূন্য হইয়া কেহ জন্ম-পরিগ্রহ করে নাই। এ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই কার্য্য আছে। ছোট বড় সকলকেই সাধ্যানুসারে কিছু করিতে হইবে। আমার স্বামী—তিনি আমার পরম গুরু, পরম দেবতা, আমি তাঁহার দাসী, তাঁহার চরণ-সেবাই আমার ধর্ম্ম। আজ তিনি স্বর্গবাসী। স্বর্গে গিয়াছেন, এখন আরও উজ্জলরূপে তিনি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ধ্যানই এখন আমার একমাত্র ব্রত। গোপাল আমার গিয়াছে,—কিন্তু বাছার সে চাঁদ মুখখানি আমি ভুলি নাই। আর এই শিশু কন্যাটি রহিয়াছে,—

আমারই উপর ইহার জীবন নির্ভর করিতেছে ;—সুতরাং ইহার প্রতি আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে। কন্যা যদি না হইত, হইয়া যদি না থাকিত, তাহা হইলেও কি আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনা ?—না।"

এইরূপ অনেক কথাই গৌরী ভাবিতেন। আপনার দারিদ্র্য-দুঃখ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পাইত না। ধনীর কন্যা ছিলেন, বড় ঘরের বধূ হইতেও পারিয়াছিলেন, কিন্তু কাল-প্রভাবে পিতা ও স্বামীর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইল, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত হইয়া, স্বামী উদরান্ন সংস্থান করিতে বিদেশবাসী হইলেন। শেষে বিধাতার অমোঘ অভি-সম্পাতে পতিপুত্র তাঁহাকে ফেলিয়া গেল।

স্বামী বর্ত্তমানে তিনি যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা অতি কষ্টকর হইলেও পবিত্রতাপূর্ণ ছিল। পবিত্রতাপূর্ণ ছিল বলিয়াই, অশেষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাহিয়া সমস্ত ভুলিতেন। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর দুই মুঠা অন্ন জুটিত। এমন দিনও গিয়াছে, যে দিন তাহাও জুটে নাই ;—তাহাও সহ্য হইত। কিন্তু তিন বৎসরের শিশুকন্যাটি একটুকু খাদ্য অভাবে,—প্রকৃতিদত্ত মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ অভাবে, জলপূর্ণ মৃৎভাণ্ড হইতে জল পান করিতেছে,—এমন দিনও গিয়াছে,—তাহা আর সহ্য হইত না! তখন বালকের ন্যায় স্বামীর চোকে জল পড়িত। আকুলপ্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তিনি ডাকিতেন,—"প্রভু, অনাথনাথ, কোথায় তুমি?" আর তখন স্ত্রী করিতেন কি?—স্নেহময়ী মা যেমন সন্তানের চক্ষে জলধারা দেখিয়া, মমতা-আর্দ্র-প্রাণে, বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দেন, স্ত্রীও তেমনি

সেই শতগ্রন্থিময় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া স্বামীর চক্ষু মুছাইতেন, সান্ত্বনার কথা বলিতেন। বলিতে বলিতে সে ডাগর চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিত;—উভয়ের চক্ষেই জল দেখা দিত। তখন উভয়ে উভয়ের গলা-জড়াজড়ি করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিত। স্ত্রীর চক্ষে জল,—দুঃখের জন্য নহে;—স্বামীর চক্ষে জল দেখিয়া! এইরূপ, যখন দুইজনের চক্ষুজলে দুইজনের বক্ষ ভাসিতে থাকিত, তখন সেই অবোধ শিশুটি অমনি তাহার সেই দুই খানি কচি-হাতে পিতা-মাতার চক্ষু চাপিয়া ধরিত,—আর অশ্রু বহিতে দিবে না!

তেমন করিয়া কান্নাতে যে সুখ, তেমন সুখ যে আর কিসে হয়, তা আমি জানি না। যে দুঃখে এমন কান্না আসে, সে দুঃখ নয়,—সুখ। গৌরী তাহা বুঝিতেন; তাই বড় দুঃখেও তিনি কাতর হইতেন না। কেবল মনে মনে এই কথা বলিতেন, "সংসারে এমন কি দুঃখ-কষ্ট আছে, যাহা স্বামীর মুখ চাহিয়া সহ্য করা না যায়? তবে স্বামীর চক্ষে যদি কখন জল দেখি, কেবল তাহাই সহ্য করিতে পারি নাই।"

স্বামীর মৃত্যু হইতেই গৌরীকে সম্পূর্ণরূপে পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। ভিক্ষাবৃত্তিই তাঁহার অবলম্বন ছিল। সাধ্বীর মনে সেজন্য এতটুকুও ক্ষোভ ছিল না।—"হায়, তবু যদি স্বামী জীবিত থাকিতেন! না হয়, এইরূপ ভিক্ষা করিয়াই তাঁহাকে খাওয়াইতাম!—কিন্তু আমাদের আহারের চেষ্টা করিতে গিয়া, গঙ্গাগর্ভে তিনি প্রাণ দিলেন!—দুঃখিনীর জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি এক দিনও আমাকে কুটীরের বাহির হইতে দাও নাই, আর আজ আমি সারাদিন ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করি! তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি আমাদের জন্যে প্রাণ দিলে,—আর আমি বাঁচিয়া রহিলাম!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি বলিয়াছি, যেখানে সারি সারি কতকগুলি আম্রবৃক্ষ নানাবিধ পক্ষীর কুলায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা-ই নিকট গৌরীর সেই জীর্ণ কুটীর। যে প্রকার চিন্তায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত, তাহাও কতক কতক বলিয়াছি।

প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, দুইখানি অর্দ্ধখণ্ড শতগ্রন্থিময় মলিন বস্ত্রে সেই সুন্দর তনু আবৃত করিয়া, গৌরী ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন। বস্ত্রখণ্ডে দেহ সম্পূর্ণ ঢাকিত না। দুঃখিনী সে বিশ্ববিজয়ী রূপ ঢাকিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু পাপ চক্ষুর কুটিল-দৃষ্টি হইতে, সে অতুল লাবণ্যরাশি লুকাইতে পারিতেন না।

একদিন,—অহো! সে দিন কি সর্ব্বনাশের,—একদিন,—যে রক্ষক, সেই-ই ভক্ষক হইল! সেই জমিদার,—যে খেয়ালবশে এক-দিন এই দুঃখিনীকে আশ্রয় দিয়াছিল, সেই পাপিষ্ঠই,—একদিন রাত্রে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া, দুঃখিনীর কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইল।

সেদিন ঘোর দুর্য্যোগ। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। কোলের মানুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। হু হু বাতাস বহিতেছে।

তখন, বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ছুটিয়াছে। বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ বড়ই ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ধরা-বক্ষে যেন পিশাচ-যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সেই একদিন,—আর এই এক দিন। পাঠক সেই দিন স্মরণ করো;—যে দিন, যে দুর্দ্দিনে, দুঃখিনী গৌরীর জীবন-সর্ব্বস্ব পতি-পুত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে;—আর আজ এ দিনের কথাও একবার মনে ভাবো!

পিশাচ জমিদার,—সতীর সম্মুখীন হইল। সতী আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

উদ্যানের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ভাগীরথী তর তর বেগে ছুটিয়াছে। ঝড়, বৃষ্টি, তুফানে বেগবতী স্রোতস্বতী অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুঃখিনী গৌরী সংসার-দরিয়ায় স্থান না পাইয়া, এই বিশাল গঙ্গা-গর্ভে আশ্রয় লইতে চলিলেন। তখন তাঁহার কোন দিকে—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই,—দ্রুতপদে গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইলেন। কম্পিতকণ্ঠে গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা দয়াময়ি, পরমেশ্বরি! তোর কোলে এ অভাগীকে স্থান দে! বুঝিলাম, মা, তোরই বিধানে, এ বিশাল সংসারে আমার স্থান নাই!"

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত;—কাল রজনী;—সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার;—অতি ভয়ঙ্কর সময়! হঠাৎ ঝুপ করিয়া গঙ্গাগর্ভে কি একটা শব্দ হইল;—নর-পিশাচ জমিদার,—সচকিত-ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল,—সেই পুণ্য-প্রতিমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অতল জলে ভাসিয়া যাইতেছে!

হঠাৎ পাপিষ্ঠের প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। এই সময় একবার দিক্‌দিগন্ত চমকিত করিয়া বিজলীবিকাশ হইল।—সেই সঙ্গে কড়্ কড়্ শব্দে, মহারোলে, বজ্রপাত হইল।—সেই বজ্র, সেই কাম-বিহ্বল মূঢ়ের মাথায় পড়িল। আর এদিকে হায়,—সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরে, দুঃখিনী গৌরীর সেই কচি-মেয়েটিও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চির-নিদ্রিত হইল!

কেন, কি জন্য, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে,—কে বলিবে? ইহারই নাম অদৃষ্ট, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, বা বিধির বিধান।

মহাশ্বেতা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অচ্ছোদ-সরোবর!—মনে পড়িলে, অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর নির্ম্মল আনন্দ উছলিয়া পড়ে। সেই সুন্দর রাত্রি, বিমল জ্যোৎস্না, নির্ম্মল আকাশ, স্বচ্ছ-সরোবর-বক্ষে কৌমুদী-স্নাত ঈষচ্চঞ্চল লহরীগুলি, তটস্থিত চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশ্চল বৃক্ষরাজি, কৌমুদীবসনা প্রকৃতি,——একে একে সকলই স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠে। জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিকে নীরবতা। ঈষৎ সমীরণ-সঞ্চালনে গাছের পাতাগুলি কাঁপিতেছে, তাহা চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল; সরোবর-বক্ষে দুই একটা অলস-লহরী ভাসিতেছে, তাহাও চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল। কোন্ অজানা দেশ হইতে কাহার যেন হাসিরেখা পৃথিবীর উপর তরঙ্গায়িত হইতেছে,

---

• বাণভট্ট-বিরচিত "কাদম্বরী",—সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দর গ্রন্থ। যাঁহারা "কাদম্বরী" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মহাশ্বেতাকে বিশেষরূপে জানেন। মহাশ্বেতা,—কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের একটু আলোচনা,—পাঠককে উপহার দিলাম।

তাহারই গুণে প্রকৃতি হাস্যময়ী!—এমনই সময়ে একবার অচ্ছোদ-সরোবর মনে করো। সেই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে একখানি পবিত্র মূর্ত্তি মনে পড়ে,—না? সৌন্দর্য্য, যৌবন, পবিত্রতা,—একাধারে তিন মিশিয়া, সে মোহিনী মূর্ত্তি কি সুন্দর! সে শোভাময়ী প্রতিমার হৃদয়ে যে প্রগাঢ় প্রেম, যে অচলা ভক্তি, তাহাও যেন অচ্ছোদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। একটি মনে করো,—অপরিহার্য্যরূপে, হৃদয় আলো করিয়া, অন্যের ছায়া পড়িবে।

কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

অচ্ছোদ-সরোবর। মধুমাস-সমাগমে সরোবরের সুন্দর ও মধুর শোভা। অচ্ছোদের স্বচ্ছহৃদয়ে কমলবন বিকসিত, সুনীল আকাশের স্নিগ্ধচ্ছায়া প্রতিভাত, মৃদু-মন্দ মধুপবন সঞ্চারিত। তীরে নানা বৃক্ষরাজি বিরাজিত। কুসুমিত বৃক্ষরাজির কি সুন্দর শোভা! পুষ্পিত ব্রততী বাহুবেষ্টনে,—সহকার আলিঙ্গন করিয়া আছে; নিবিড় শ্যামল পত্ররাশিতে তাহার অঙ্গ ঢাকিয়াছে; শাখায় শাখায় কুহু-স্বরে কোকিল গায়িতেছে; সেই পঞ্চমতানের সহিত ভ্রমর-ঝঙ্কার মিশিতেছে!

সংসার পিছনে রাখিয়া, একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াও! জ্বালা-যন্ত্রণা নিবিয়া যাইবে, প্রাণে সুনির্ম্মলা শান্তি পাইবে।

একদিন, এমনই সময়ে, এই সরোবরে, একটি কিশোরী, তাহার মাতার সহিত স্নান করিতে আসিয়াছিল। কিশোরীর রূপরাশি উছলিয়া পড়িতেছিল; প্রতি পাদক্ষেপে, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে, যে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহার প্রভায় সে সরোবর, সরোবর-তট, তটস্থিত বৃক্ষবল্লরী,—সকলই যেন আলোকিত হইল! কোকিলের সে পঞ্চমতানে, ভ্রমরের সে মধুর ঝঙ্কারে,

র কিশোরীর সেই সৌন্দর্য্যরাশিতে, কি সম্বন্ধ ছিল জানি না, ন্তু সে সবই বুঝি মিশিয়া গেল। এত রূপ বাহিরে ফাটিয়া ড়িতেছে,—তখনও তবু যৌবনের অর্দ্ধোদয়!

বালিকার নাম মহাশ্বেতা; মহাশ্বেতা গন্ধর্ব্ব-তনয়া।

স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, যাহার বাহির এত ন্দর, তাহার ভিতর কেমন? সেই অতি সুন্দর মুখখানি, সেই শান্ত করুণ আঁখিযুগল, সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্র ললাট, আর ই নিতম্বস্পর্শী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মুক্তকেশরাশি,—স্মরণমাত্রেই, ন চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত হয়। সে লাবণ্য-প্রতিমার ভিতরের প কেমন?

যদি এক কথায় বলিতে হয়, তবে মিরন্দার মতো বলি,— "এ সুন্দর রূপ-মন্দিরে, দেবতা ভিন্ন আর কি থাকিবে?" *

বস্তুতঃ, মহাশ্বেতার ভিতরের সৌন্দর্য্য আরও অধিক। বাহির ও ভিতর,—দুই মিশিয়া, কিশোরীর এত মধুর শোভা!

বলিয়াছি, মধুমাস সমাগমে সরোবরে অতি অপূর্ব্ব শোভা। প্রাণ ভরিয়া, মহাশ্বেতা সে শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অশোক তরু ফুলপত্রে সুশোভিত, চারিদিক্ বিহগের মধুরকণ্ঠে নিনাদিত, সরোবর-শোভা কুমুদকহ্লারে পরিবর্দ্ধিত! বাহ্য-জগত ল্ল, মহাশ্বেতার অন্তরও প্রফুল্ল; দুই সুর মিলিল। নির্ব্বি-কারা, স্নিগ্ধ-হৃদয়া, বালিকার সে অন্তরের শোভাও মধুর।

কি এক মধুর সৌরভে সহসা চারিদিক আমোদিত হইয়া

---

* Miranda:—
"There's nothing ill can dwell in such a temple."—The Tempest, Act. I. Sc. 2.

উঠিল। মকরন্দ-গন্ধে মধুকরীর মতো মহাশ্বেতা চারিদিক্ চাহিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল,—দুইটি ঋষিকুমার সেই পথেই আসিতেছেন। তাঁহাদের একজনের অতি মনোহর রূপ, কর্ণে এক অপূর্ব্ব কুসুম মঞ্জরী, তাহারই সৌরভে চারিদিক্ পূর্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বেতকেতু নামে এক মহাতপা মহর্ষি দিব্যালোকে বাস করেন। তাঁহার অসামান্যরূপ,—জগৎপ্রসিদ্ধ। দেবার্চ্চনার নিমিত্ত, কমলসংগ্রহ মানসে, একদিন তিনি মন্দাকিনী-প্রবাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! কমলাসনা লক্ষ্মী * তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হন। পরে পরস্পরের সমাগমে এক পুত্র জন্মে। পুণ্ডরীকে † জন্ম বলিয়া, শ্বেতকেতু এই কুমারের নামকরণ করিয়াছিলেন,—পুণ্ডরীক।

পুণ্ডরীক শ্বেতকেতুর আশ্রমে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সুন্দর রূপ এবং সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া মুনিঋষিগণ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

কপিঞ্জল, পুণ্ডরীকের সখা। দুইজনে বড় প্রীতি। যে দিন মহাশ্বেতা অচ্ছোদসরোবরে আসিয়াছিল, সেই দিন পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল,—উভয়ে মিলিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভবানীপতির পূজার জন্য তাঁহারা কৈলাস পর্ব্বতে

---

* পদ্মবন শোভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

† শ্বেতশতদল।

সিতেছিলেন, পথিমধ্যে নন্দনদেবতা এক অপূর্ব্ব কুসুম-ম়ী লইয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন; এবং প্রণামপূর্ব্বক ...রীককে তাহা প্রদান করিলেন। অতঃপর কপিঞ্জল তাহা ...য়া, সস্নেহে পুণ্ডরীকের কর্ণমূলে পরাইয়া দিলেন।

এই পারিজাত কুসুমস্পর্শে পুণ্ডরীকের প্রাণে কেমন এক নূতন আবরণ পড়িল। পুণ্ডরীক দেখিলেন,—পৃথিবী যেন অনন্ত সৌন্দর্য্য-ধারায় স্নাত হইয়াছে;—চন্দ্রে সূর্য্যে, সাগরে ভূধরে, যেন নব নব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইয়াছে! পৃথিবী তো আগে এত সুন্দর বলিয়া বোধ হইত না! প্রাণে তো এমন আনন্দ-ধারা আগে প্রবাহিত হইত না! চক্ষে তো এমন জ্যোতি কখন ছিল না!

মহাশ্বেতা,—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি,—দুই ঋষিকুমার দেখিল। তাঁহারা—পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুণ্ডরীকের রূপের কথা বলিয়াছি।—মহাশ্বেতা অতৃপ্ত-লোচনে তাহা দেখিতে লাগিল। তেমন সুন্দর, মহাশ্বেতা আর দেখে নাই! পুণ্ডরীকের কর্ণমূলে যে কুসুমমঞ্জরী, তাহারই সৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। কপিঞ্জল ও পুণ্ডরীক—দুই জনের সে কমনীয় মূর্ত্তি দেখিলে, বসন্তসমেত কন্দর্পকেই মনে পড়ে।

আমি বলিয়াছি, বালিকা বিকার-রহিতা। সেই স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ের মতো তাহার হৃদয় নির্ম্মল। আজ সহসা এই মধুর

স্থানে, তদধিক মধুর সময়ে, সে হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব কুসুমধারী পুণ্ডরীকের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে দেবমূর্ত্তি,—বালিকার কোমল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। মহা-শ্বেতা একাধারে এত রূপ আর কখন দেখে নাই। আপনাবিস্মৃত হইয়া, অনিমেষলোচনে, তাহা দেখিতে লাগিল। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য সুরভিপূর্ণ কুসুম কি বালিকার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-ছিল?—না পুণ্ডরীকের অনিন্দ্য-মুখকমল? বুঝি দুই-ই।

প্রেমিকা আজ নির্ব্বাপিতা! কতক্ষণ গেল,—কে বলিবে?—মহাশ্বেতা স্পন্দরহিতা, চৈতন্যহারা, জ্ঞানশূন্যা।

পুণ্ডরীকও অতৃপ্তলোচনে মহাশ্বেতার মুখপানে চাহিয়া আছেন। তিনিও কি রূপমুগ্ধ? হাঁ, তা বৈ কি। "রূপে মুগ্ধ নয় কে? মোহের জন্যই তো রূপ হইয়াছিল!" তিনি ঋষি-কুমার বলিয়া কি এ মোহ তাঁহাকে পরাজয় করিবে না?

পুণ্ডরীক ভাবিলেন,—"এত রূপ! এমন তো আর দেখি নাই! পৃথিবীতলে এত রূপ কোথা হইতে আসিবে?"

শকুন্তলাকে দেখিয়া, রূপমুগ্ধ রাজা দুষ্মন্তও একদিন ভাবিয়া-ছিলেন,—

"মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ॥"

তা যাই হোক, দুইজনেরই হৃদয়ে অভিনব ভাব আসিল। মহাশ্বেতা মনে মনে পুণ্ডরীককে চিত্ত সমর্পণ করিল। কিছু কি ভাবিল না? বালিকার সেই ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর একটু-খানি গোলমাল হইয়াছিল বৈ কি! মহাশ্বেতা ভাবিল,—"এ আমার কি হইল? কেন এমন চিত্তবিকার জন্মিল? ইহাই কি

অনুরাগ? তাহা তো জানি না। বার বার ইহাঁকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে কেন? হৃদয় কেন এমন আকর্ষিত হইতেছে?"

বালিকা ভাবে, আবার দেখে; আবার ভাবে, আবার দেখে!

পুণ্ডরীক দেখিলেন,—"অচ্ছোদ-সরোবরে আজ একাধারে যেমন, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা মিশিয়াছে!" মহাশ্বেতাই সেই মিশ্রণ। সে প্রেমময়ী মূর্ত্তি স্বপ্নের অতীত, কল্পনার অতীত! ধীরে ধীরে সে প্রতিমা তাঁহার হৃদয়মূল স্পর্শ করিল। ঋষিকুমার সে চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এই ভাবটুকু লিখিতে আমার যত সময় লাগিল, পরস্পরের মনোমধ্যে এই নবভাবের আবির্ভাব হইতে এত সময়ও লাগিল না। বলিয়াছি তো, মহাশ্বেতার রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল; পুণ্ডরীকও সে দেবতুল্য রূপরাশি লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত। পরস্পর পরস্পকে আকর্ষণ করিলেন; পরস্পরে সে আকর্ষণে বাঁধা পড়িলেন।

এখন সরলা বালিকা কিছু গোলে পড়িল; ভাবিল,—এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কি চলিয়া যাইবে? পরক্ষণেই স্থির করিল, যখন সেই "ধনুর্দ্ধর ঠাকুরের ফুলবাণ" দু'জনকেই বিদ্ধ করিয়াছে, তখন ইহার শেষ দেখিয়া যাওয়াই বিধেয়। মহাশ্বেতা সাহসে ভর করিয়া কপিঞ্জলকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—"ভগবন্, এ মহাত্মার নাম কি? ইনি কোন্ তপোধনের পুত্র? আর ইহাঁর কর্ণে এই যে সুন্দর কুসুম দেখিতেছি,—যাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত,—ইহা কোথায় জন্মে?"

মহাশ্বেতা হৃদয়ের আবেগে একেবারে পুণ্ডরীকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

মহাশ্বেতার প্রশ্নে কপিঞ্জল ঈষৎ হাসিলেন। তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিলেন। কিছু বুঝিলেন না কি? বুঝিলেন বৈ কি, তাই হাসিলেন। তিনি পুণ্ডরীকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, পারিজাত-কুসুমের কথা বলিতেছিলেন। তখন পুণ্ডরীক সহাস্যবদনে, অতি মধুর কণ্ঠে, মহাশ্বেতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সুন্দরি, তোমার এত অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? যদি এই কুসুমগ্রহণে অভিলাষ হইয়া থাকে, তো গ্রহণ করো,—ইহা তোমারই যোগ্য।"

এই বলিয়া পুণ্ডরীক স্বীয় কর্ণ হইতে পারিজাত গ্রহণপূর্ব্বক, মহাশ্বেতার কর্ণে পরাইয়া দিলেন। তাঁহার সেই কম্পিত হস্তখানি মহাশ্বেতার চিবুক স্পর্শ করিল। পুণ্ডরীকের সর্ব্বশরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত-হস্ত হইতে নিঃশব্দে অক্ষমালা ভূপতিত হইতেছিল, মহাশ্বেতা তাহা ধরিয়া ফেলিল। পুণ্ডরীক কিছুই জানিলেন না। তাঁহার চক্ষু দুটি তখন কোথায়?—মহাশ্বেতার মুখ পানে!

আ ছি, ঋষিকুমার!

সঙ্গিনী আসিয়া মহাশ্বেতাকে ডাকিল;—গৃহে ফিরিতে হইবে। বড় কষ্টে মহাশ্বেতা সে স্থান ত্যাগ করিল।

কিছুদূর যাইয়া, মহাশ্বেতা শুনিল, কপিঞ্জল বলিতেছেন,—"সখে পুণ্ডরীক, একি! এমন ইন্দ্রিয়বিকার কেন হইল? তোমার সে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, লজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা,—কোথায় গেল? তোমার অক্ষমালা কোথায়?"

পুণ্ডরীক কিছু লজ্জিত হইয়া, ধীরে উত্তর করিলেন,—"সখে, ও কিছু নয়, অন্যরূপ ভাবিও না! ঐ চঞ্চলস্বভাবা বালা

ভ্রমক্রমে আমার অক্ষমালা লইয়াছে, এই দেখ, আমি ফিরাইয়া লইয়া আসি।”—এই বলিয়া মহাশ্বেতাকে ডাকিলেন,—“চপলে, আমার অক্ষমালা না দিয়া যাইতে পারিবে না।”

চারিটি চক্ষু আবার মিলিল। বালা ধীরে ধীরে মুখখানি একবার পুণ্ডরীকের মুখপানে তুলিল; আবার তখনই নামাইল;—দূরে যে কপিঞ্জল দাড়াইয়া!

মহাশ্বেতা, অক্ষমালা-ভ্রমে, কণ্ঠের একাবলী-হার উন্মোচন করিয়া, পুণ্ডরীকের হস্তে দিলেন, পুণ্ডরীকও অন্যমনস্ক ভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন। আর সেই অক্ষমালা মহাশ্বেতারই কণ্ঠে রহিল!

মালা-বিনিময়ের রকমটা দেখিলে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম যৌবন-সমাগমে, নবাগত প্রেমের সঞ্চার কেমন মধুর! বাল্যভাব এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই; নির্ব্বিকার অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নাই; তাহারই সহিত যৌবন সমাবেশ!—যেন পূর্ণিমার আলো এখনও নিবিয়া যায় নাই, তাহারই সহিত উষার আলোক আসিয়া মিশিতেছে।—সে মিশ্রণ কি সুন্দর!

যে দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহাশ্বেতা গৃহে ফিরিল, তাহার মধুর আলোকে প্রেমিকা দেখিল,—হৃদয় বড় প্রফুল্ল,

চারিদিক সুপ্রসন্ন, পৃথিবী হাস্যময়ী! কিন্তু সে আলোকের মাঝেও একটা বিষাদ-ছায়া বিদ্যমান। সে ছায়া আলোক নির্ব্বাণ করে না; কিন্তু আলোকের তীব্রতা নষ্ট করিয়া, তাহা স্নিগ্ধ করে! মহাশ্বেতা গৃহের চারিদিকে পুণ্ডরীকের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল। তাঁহারই জন্য প্রাণ তৃষিত, উৎকণ্ঠিত। সরোবরতটে সেই সাক্ষাৎ, তাহারই ভিতর দিয়া কি হইয়া গেল! বিরহবিধুরা কিশোরীর সে অবস্থা বড় অপূর্ব্ব। ডাগর আঁখিদুটিতে—সেই সরোবর, সরোবর-তট, তটস্থিত সেই বৃক্ষবল্লরী, তাহাদিগের শোভা;—তার পর সেই পারিজাত আঘ্রাণ, সেই অনিন্দ্যমুখকমল, অপরূপ রূপ, দিব্যাকৃতি ঋষিকুমার, তাঁহার সেই মোহনস্বর, সেই সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সেই মহাশ্বেতা-কপোল-সংস্পর্শে কম্পিত-অঙ্গুলি, তার পর সেই হস্তচ্যুত অক্ষমালা,—একে একে সেই সব দৃশ্য প্রেমিকার সে ডাগর আঁখিদুটিতে ভাসিতেছে! মনে করিতে করিতে সে আপনাহারা হইতেছে। ভাবিতেছে,—এ কি নিদ্রা না জাগরণ, মৃত্যু না জীবন, সুখ না দুঃখ?

পূর্ণ আবেগে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তখন মহাশ্বেতা প্রাসাদের উপরিভাগে গিয়া দাঁড়াইল। যেখানে পুণ্ডরীকের সহিত শুভ সন্দর্শন ঘটিয়াছিল, সতৃষ্ণনয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া চিত্তবিকৃতি জন্মিল। সেইদিক হইতে যে বাতাস বহিতেছে, বালিকার ইচ্ছা হইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি কি আমার প্রিয়তমের অঙ্গস্পর্শ করিয়া আসিতেছ?" সেই দিক্ হইতে যে পক্ষী উড়িয়া আসিতেছে, ইচ্ছা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি কি আমার পুণ্ডরীককে দেখিয়াছ? তিনি কোথায় আছেন? কি করিতেছেন?"

এমনই চিত্তবিকারে না অলকার পানে চাহিয়া, রামগিরি আশ্রমে বসিয়া, একজন বিরহী, মেঘের সহিত আলাপ করিয়াছিল ?

তরলিকাও সেই দিন অচ্ছোদ-সরোবরে স্নানার্থ গিয়াছিল। পুণ্ডরীক তাহার নিকট হইতে মহাশ্বেতার পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাহাকে মহাশ্বেতার সখী জানিয়া, পুণ্ডরীক তাহার দ্বারা মহাশ্বেতাকে একখানি পত্র পাঠাইলেন।

পত্রখানা কিসে লেখা ? তমালতরুপল্লবরসে নখদ্বারা লেখা,—স্বীয় পরিধেয় বল্কলের এক খণ্ডে লেখা !

মহাশ্বেতা আনন্দে তরলিকার হস্ত হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিল। পড়িয়া দেখিল, লেখা আছে,—

"দূরং মুক্তালতয়া বিসসিতয়া বিপ্রলোভ্যমানো মে।
হংস ইব দর্শিতাশো মানসজন্মা ত্বয়া নীতঃ॥"

অর্থাৎ, "হংস যেমন মুক্তামালায় মৃণালভ্রমে প্রতারিত হয়, তেমনি আমার মন মুক্তাময় একাবলী মালায় প্রতারিত হইয়া, তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছে !"

সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া পর্য্যন্ত প্রেমিকার যে ভাব, তাহা বলিয়াছি ; তার পর আবার এই প্রেমপত্র লাভ ! প্রেমিক পাঠক মহাশ্বেতার সে অবস্থা বুঝিয়া দেখুন।

তার পর প্রশ্নের ঘটা।—"তরলিকে, তুমি তাঁহাকে কোথায় কিরূপে দেখিলে ?—তিনি কি বলিলেন ?—আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করিলেন ?—তিনি কোথায় গেলেন ?—কি বলিয়া গেলেন ? ইত্যাদি।"

এমনই বুঝি ঘটিয়া থাকে। এমনই করিয়াই বুঝি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। বিরহবিধুরা রোজালিণ্ডও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল।

তরলিকা কিন্তু সিলিয়ার মত উত্তর দিতে পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এখন পুণ্ডরীকের কথা কিছু বলি। আমি বলিয়াছি, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুরের ফুলবাণের প্রতাপটা পুণ্ডরীক অতিক্রম করিতে পারেন নাই।—"আহা-হা কি রূপ! মহাশ্বেতার কি সৌন্দর্য্য! তেমন কি আর কিছু আছে? সমস্ত পৃথিবী মাঝে তেমন বুঝি আর দেখি নাই!" পুণ্ডরীকের মনোভাব এইরূপ; পুণ্ডরীক মন্ত্রমুগ্ধ!

তোমরা ইহাকে রূপের মোহ বলিয়া নিন্দা করিতে হয় করো; কিন্তু রূপে মুগ্ধ বলিয়া যে ভালবাসা থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। এদিকে, কপিঞ্জল তো পুণ্ডরীককে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। পুণ্ডরীক কোথায় চলিয়া গেলেন, কপিঞ্জল খুঁজিয়া পাইলেন না।—"বন্ধু কি তবে সেই সৌন্দর্য্যময়ী গন্ধর্ব্ব-বালার অনুসরণ করিয়াছে? তাহা কি সম্ভব? হয়ত বা সেই সুন্দরীর অন্তর্ধানে, এতক্ষণে বন্ধুর চৈতন্য হইয়াছে,—তাই লজ্জায় আমার

---

* Rosalind.—what did he when thou saw'st him? What said he? How looked he? Wherein went he? What make's he here? Did he ask for me? &c &c —Answer me in one word.

Celia.—You must borrow me Gargantua's mouth.

Shakespeare's As you like it —Act III, Sc. 2.

সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না।” কপিঞ্জল এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুণ্ডরীকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ওদিকে সরোবরের এক তীরে, লতামণ্ডপমধ্যবর্ত্তী এক শিলা-তলে বসিয়া, পুণ্ডরীক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষু মুদ্রিত; মুখখানি আঁখিজলে ভাসিতেছে; মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। পুণ্ডরীক স্থির, নিশ্চল, নির্ব্বাক্।

অন্বেষণ করিতে করিতে কপিঞ্জল পুণ্ডরীককে দেখিতে পাই-লেন। দেখিয়া তো তিনি অবাক্!—হায়, রমণী-রূপলাবণ্য!

কপিঞ্জল, বন্ধুর গাত্র স্পর্শ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, একি? আজ তোমার একি দশা দেখিতেছি?”

পুণ্ডরীক। তুমি তো সবই জানো;—আর কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?” আবার দীর্ঘনিশ্বাস!

কপিঞ্জল আর বলিবেন কি? এখন কি আর উপদেশের সময়? তবু বন্ধুকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করা বন্ধুর কাজ; তাই কিছু উপদেশ দিলেন।

কপিঞ্জলকে কখন এ অবস্থায় পড়িতে হয় নাই, সুতরাং উপদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। শাস্ত্রাভ্যাসরত, নির্ব্বিকার-চিত্ত, সংযমী তিনি,—এ ব্যাধি তো কখন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তাই তিনি উপদেশ দিলেন,—“সখে, চিত্তবিকার দূর করো। সামান্য জনের ন্যায় এ অকিঞ্চিৎকর রূপ-তৃষ্ণায় মজিও না। এ ইন্দ্রিয়স্রোত সংযম করো।”

কিন্তু সে উপদেশ শুনিবে কে? বালির বাঁধ দিয়া কে কবে পর্ব্বতনিঃসৃতা নদীর স্রোত ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে?

কপিঞ্জল বুঝিলেন, মহাশ্বেতা-লাভ ভিন্ন এ ব্যাধির উপশম নাই। কিন্তু মহাশ্বেতা মিলিবে কি? বনবাসী তপস্বীর এ সৌন্দর্য্যময়ী গন্ধর্ব্ববালাকে পাইবার প্রত্যাশা কেন? ভাবিতে ভাবিতে কপিঞ্জল,—মহাশ্বেতার উদ্দেশে চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদোপরি বসিয়া, মহাশ্বেতা ও তরলিকা,—পুণ্ডরীক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তখন দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে। এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, দ্বারদেশে এক ঋষিকুমার; তিনি মহাশ্বেতার দর্শন-প্রার্থী। ঋষিকুমার? কে,—পুণ্ডরীক? না। মহাশ্বেতা দেখিল,—

"রূপস্যেব যৌবনম্, যৌবনস্যেব মকরকেতনং, মকরকেতনস্যেব বসন্তসময়ং, বসন্তসময়স্যেব দক্ষিণানিলমনুরূপং সখায়মৃষিকুমারকং কপিঞ্জলং"

"যেরূপ রূপের সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মকরকেতন, মকরকেতনের সহায় বসন্তকাল, বসন্তকালের সহায় মলয়-পবন, সেইরূপ তিনি পুণ্ডরীকের সখা কপিঞ্জল।"

কপিঞ্জলকে দর্শনমাত্র মহাশ্বেতা চিনিল। সভক্তি প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে আসন দিল। কপিঞ্জল বসিলে, মহাশ্বেতা, তাঁহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মহাশ্বেতার মনের অবস্থা তখন কিরূপ, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বুকের ভিতর তখন কত ভাবের উদয় হইতেছিল! মহাশ্বেতা শুনিয়া আসিয়াছে, অচ্ছোদ-তীরে কপিঞ্জল পুণ্ডরীককে

তিরস্কার করিতেছেন। এখন আবার সেই কপিঞ্জল, তাঁহারই সম্মুখে!

কপিঞ্জল কিছু ইতস্ততঃ করিয়া,—কেন না, তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছেন, তাহাতে মহাশ্বেতা বিরক্ত হইবে কি সন্তুষ্ট হইবে, তাহা তিনি জানেন না,—অথচ না বলিলেও নহে,—এইজন্য কিছু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি পুণ্ডরীকের অবস্থা বর্ণন করিলেন। শেষে বলিলেন, "এখন তুমি ভিন্ন পুণ্ডরীকের অন্য উপায় নাই; অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয় করো।"

গা দিয়া মহাশ্বেতার ঘাম ঝরিল! কপিঞ্জলের যে কথা অগ্নি-সম্ভাবনায় ভয় হইয়াছিল, তাহা অগ্নি না হইয়া স্পর্শ-সুখকর রত্ন হইল! পাঠক, এখন একবার কল্পনার চক্ষে মহাশ্বেতার সে মুখখানি দেখুন। লজ্জা ও আনন্দ সেখানে কিরূপ যুগপৎ প্রকাশিত হইতেছে,—দেখুন।

কপিঞ্জলের কথার এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই! প্রেমিকা তো স্থির হইয়া ভাবিতে পারিতেছে না। হৃদয়-নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে; তরঙ্গে তরঙ্গে মন ভাসিতেছে। সেই সময়ে সংবাদ আসিল, মহাশ্বেতার জননী কন্যাকে দেখিতে আসিতেছেন। "যাহা কর্ত্তব্য—করিও" বলিয়া কপিঞ্জল প্রস্থান করিলেন।

আকাশে চন্দ্র উঠিল। জ্যোৎস্নালোক চারিদিক উজ্জ্বল করিল। সেই বিমল রাত্রে, সেই মধুর জ্যোৎস্নালোকে, সেই প্রফুল্ল-হৃদয় প্রণয়িনীর মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চন্দ্রকিরণ ও মধুপবনের সহিত মদনানল আসিয়া সে কুসুম-সুকুমার দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল।

মহাশ্বেতার বড় বিপদ; কি করিবে? নিভৃতে লুকাইয়া কি

পুণ্ডরীকের কাছে যাওয়া যায় না? প্রাণ যে বড় অধীর; সে প্রেমমুখ মনে পড়িয়া হৃদয় যে আকুল,—দেখা কি হয় না? প্রেমিকা কি তবে লজ্জা, ধৈর্য্য, কুল--সব জলাঞ্জলি দিয়া অভিসারিকা হইবে? পুণ্ডরীকের যে অবস্থা, কপিঞ্জল তো তাহা বলিয়া গিয়াছেন,—না যাইলেই বা কেমন হয়?

মহাশ্বেতা আর স্থির থাকিতে পারিল না,—তরলিকার সহিত পরামর্শ করিয়া যাওয়াই ঠিক করিল।

প্রাসাদ হইতে দুই জনে নামিল; কেহ জানিতে পারিল না। সেই মধুর রাত্রে, দুইজনে বাটীর বাহির হইল। মহাশ্বেতার দক্ষিণ নয়ন একবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহাতে প্রেমিকা শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

পাঠক কি কিছু অমঙ্গল আশঙ্কা করেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এমনই জ্যোৎস্না-রাত্রে, এমনই প্রীতিপ্রদ সময়ে, অনেক প্রণয়ীর অনেক কথা মনে পড়ে। বেলমণ্টের পথে এমনই সময় না জেসিকা ও লরেন্‌জো পলায়ন করিয়াছিল?* এমনই সময় না বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে শৈবলিনী ও প্রতাপ পলাইয়াছিল? † আজ আবার সেই সময়েই মহাশ্বেতা আত্মীয় স্বজনকে লুকাইয়া অভিসারে চলিয়াছে!

---

*Merchant of Venice.—Act V. Sc. I.

† বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর"।

দুইজনে চলিয়াছে। মহাশ্বেতার প্রাণে কত আশা, কত আনন্দ! প্রেমিকা মহাশ্বেতা সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সখি তরলিকে, চন্দ্র যেমন তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চলিয়াছে, এমনই তাঁহাকে কি আমার নিকট আনিতে পারেন না?" তরলিকা হাসিয়া বলিল, "তোমায় দেখিয়া চন্দ্রও যে তোমার পক্ষপাতী হইয়াছে;—অন্যে তোমার প্রণয়-সুধা পান করিবে, চন্দ্র এমন জনকে কেন তোমার নিকট আনিবেন? তুমি কি দেখিতেছ না, চন্দ্র তোমার—

"প্রতিবিম্বচ্ছলেন স্বেদসলিল কণিকাচিতং চুম্বতি কপোল-যুগলং?" ইত্যাদি।

"প্রতিবিম্বচ্ছলে স্বেদসলিলসিক্ত কপোলযুগল চুম্বন করিতেছে?"

পাঠক, এই সময় একবার মহাশ্বেতাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লও; এ মূর্ত্তি আমরা আর দেখিতে পাইব না। সমস্ত জীবন আলোচনার পর, যখন মহাশ্বেতাকে স্মরণ করিব, তখন তিনি এ মূর্ত্তিতে আর দেখা দিবেন না;—তাই বলিতেছি, এই সময় একবার ইঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া লও!

আমরা দেখিতেছি, মহাশ্বেতে,—

"দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জন মনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ং।" * ইত্যাদি।

"তোমার দৃষ্টি মদালসা, বদন-শ্রী ইন্দুসন্দীপনী, গতি মনোরমা, ঊরুদ্বয় রম্ভার পরাভবকারিণী।"

একবার এ সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লও।

---

* গীত-গোবিন্দম্।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদূরে সেই অচ্ছোদ সরোবর। এই জ্যোৎস্নালোকে, কুমুদকহ্লার-পরিব্যাপ্ত, ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিলকূজনে মধুর-নিনাদিত, সরোবর-শোভা একবার ভাবিয়া দেখ! চন্দ্রসন্দর্শনে সাগরবারি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সরোবরের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া, পুণ্ডরীকের দর্শন-আশায়, মহাশ্বেতার হৃদয়ও তেমনই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল!

কিন্তু ওকি?—এ ক্রন্দন-শব্দ কা'র? মহাশ্বেতার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইল! ক্রন্দনের পথে মহাশ্বেতা ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিল!—কি দেখিল?

আমরা দেখিয়াছি, মহাশ্বেতা-বিরহে কাতর-প্রাণ হইয়া, এক লতামণ্ডপমধ্যবর্ত্তী শিলাতলে বসিয়া, পুণ্ডরীক প্রিয়া-সমাগম চিন্তা করিতেছিলেন। কপিঞ্জল পার্শ্বে বসিয়া কত বুঝাইতেছিলেন। ক্রমে যখন আকাশে চন্দ্র উঠিল, তখন বিরহী-হৃদয়ে বিরহ-অনল আরও জ্বলিয়া উঠিল। পুণ্ডরীক সে অনলে পুড়িতে লাগিলেন; তাঁহার দেহ অবসন্ন হইল; মাথা ঘুরিতে লাগিল; চক্ষু দৃষ্টিহীন হইল;—শেষে মৃত্যু হইল! কপিঞ্জল হাহাকার করিয়া সেই নৈশ-নিস্তব্ধতা বিনষ্ট করিতেছিলেন। দূর হইতে মহাশ্বেতার কর্ণে সেই ক্রন্দনধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

মহাশ্বেতা দেখিল,—শিলাতলে, শৈবালরচিত শয্যায় শয়ন করিয়া, পুণ্ডরীক যেন নিদ্রা যাইতেছেন। কপিঞ্জল হৃদয়ে করাঘাত করিয়া শিয়রদেশে বসিয়া কাঁদিতেছেন।—পুণ্ডরীকের মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত্যু?—ইহা কি সম্ভব? মুহূর্তের মধ্যে মহাশ্বেতা সব বুঝিল। বুঝিল, তাহার বড় সাধে বাদ পড়িয়াছে!

তার পর, সে দুঃখ-কান্নার কথা বলিতে পারি না। সে হৃদয়বিদারক ঘটনায়, চাঁদের আলোও বুঝি নিবিয়া গেল। পক্ষীগণও বুঝি কুলায় থাকিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে মহাশ্বেতা মূর্চ্ছিতা। তরলিকা অল্পে অল্পে প্রিয়সখীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দিল।

"তরলিকে আর কেন, জীবনের সুখ তো ইহাঁর সঙ্গে চলিয়া গেল! এখন চিতা সাজাইয়া দাও,—এ জ্বালা জুড়াই!"

এমন সময়ে সহসা চারিদিক্ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল! কে এক মহাপুরুষ চন্দ্রমণ্ডল হইতে নামিয়া আসিলেন। পুণ্ডরীকের মৃতদেহ আকর্ষণপূর্ব্বক, গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন,— "বৎসে মহাশ্বেতে ন পরিত্যজ্যাস্তয়া প্রাণাঃ পুনরপি ভবানেন সহ ভবিষ্যতি সমাগম ইতি।"

"বৎসে মহাশ্বেতে, প্রাণত্যাগ করিও না, পুনর্ব্বার এই পুণ্ডরীকের সহিত তোমার মিলন হইবে।"

এই বলিয়া সে দিব্যপ্রভ মহাপুরুষ,—পুণ্ডরীকের মৃতদেহ লইয়া উর্দ্ধে উঠিলেন! কপিঞ্জল বন্ধুর বিরহে কাতর হইয়া,— "ওরে দুরাত্মন্, আমার বন্ধুকে লইয়া কোথায় যাস?" বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বিস্ময়,—ভয়,—বিরহ,—দুঃখ,—শোক! মহাশ্বেতার সে অবস্থা বর্ণনাতীত।

"বৎসে, প্রাণত্যাগ করিওনা, পুনর্ব্বার ইহাঁকে পাইবে"—

মহাশ্বেতার কর্ণে সেই কথা বাজিতে লাগিল।—"পুনর্ব্বার

কি পাইব?—এ নিধি কি আর মিলিবে?" যেন উত্তর শুনিলেন,—"প্রাণত্যাগ করিও না, পাইবে।"

বালিকার মরা হইল না।

পিতামাতার প্রবোধবাক্যে কোন ফল দর্শিল না। সরোবর-তটের অনতিদূরস্থিত, চন্দ্রপ্রভ পর্ব্বতের নিম্নদেশে, মহাদেবের মন্দিরে, মহাশ্বেতা পূজা অর্চ্চনা করিয়া, তন্নিকটস্থ এক গুহা-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে থাকিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। আর গৃহে ফিরিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমণ্ডলের সেই মহাপুরুষ পুণ্ডরীকের দেহ লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিলেন, কপিঞ্জলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন, এ কথা বলিয়াছি। তারপর কি হইল বলিতেছি।

সে মহাপুরুষ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং চন্দ্রদেব। পুণ্ডরীক মহাশ্বেতা-বিরহে কাতর; সেই সময় চন্দ্র, গগনমণ্ডলে উঠিয়া জ্যোৎস্নালোকে জগৎ আলোকিত করিতেছিলেন। পুণ্ডরীক আরও কাতর হইয়া পড়িলেন! বিরহকাতর রাজা দুষ্মন্তের মত * তাঁহার বোধ হইল, চন্দ্রকিরণে আর স্নিগ্ধতা

---

* "তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর
দ্বয়মিদময়থার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্,
ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি।"

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্,—তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

নাই, তাহা অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। কুসুমশর বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইয়াছে।

তখন পুণ্ডরীক অত্যন্ত অস্থির হইয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া, অভিশাপ দিলেন,—(তখন মৃত্যু উপস্থিত)—"আমি আমার প্রিয়তমা-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর,—হে চন্দ্র, তুমি আবার তোমার কিরণে আরও কাতর করিয়া, আমার প্রাণ বিনাশ করিলে! অতএব তোমাকে ভূতলে বারবার জন্মপরিগ্রহ করিয়া আমারই ন্যায় অনুরাগ-পরবশ হইয়া প্রিয়া-বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইবে।"

সর্ব্বনাশ! "বিনাপরাধে আমার প্রতি এই অভিশাপ!" চন্দ্রের অত্যন্ত ক্রোধ হইল! হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনিও প্রতিশাপ দিলেন,—"হতভাগ্য, এবার যেমন যন্ত্রণা ভোগ করিলি, জন্ম জন্ম এমনই যন্ত্রণা ভোগ কর।"

ক্রোধ উপশমে চন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, পুণ্ডরীক মহাশ্বেতার প্রণয়াসক্ত! মহাশ্বেতা চন্দ্রকিরণকুলসম্ভূতা! তখন চন্দ্র অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু আর উপায় নাই, দুইজনের শাপে দুইজনকেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে!

কপিঞ্জল, চন্দ্রের নিকট এই সকল শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। চন্দ্রদেব বলিলেন, "যাবৎ শাপের অবসান না হয়, তাবৎ তোমার বন্ধুর এই দেহ এখানে অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। মহাশ্বেতা পুনর্ব্বার ইঁহাকে এই ভাবেই পাইবেন। তুমি মহাত্মা শ্বেতকেতুর নিকট গিয়া, এই সকল সংবাদ দাও,—তিনি কোন প্রতিকার করিতে পারেন।"

কপিঞ্জল ত্বরিতপদে শ্বেতকেতুর নিকট যাইতে ছিলেন।

পথিমধ্যে এক ঋষি ছিলেন। বিপদের উপর বিপদ! ঋষিকে উল্লঙ্ঘন করাতে, তিনি অভিশাপ দিলেন,—"কপিঞ্জল! তুমি ঘোটক হইয়া জন্মগ্রহণ করো!" অনেক অনুনয়বিনয়ের পর, ঋষি বলিলেন, "চন্দ্রদেব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তুমি তাঁহারই বাহন হইবে। তাঁহার মৃত্যু হইলে, স্নান করিয়া তবে তুমি আপনদেহ প্রাপ্ত হইবে।"

তাহাই হইল। চন্দ্রদেব, পুণ্ডরীকের অভিশাপে তারাপীড় নামক উজ্জয়িনী-রাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। নাম হইল চন্দ্রাপীড়। পুণ্ডরীকও চন্দ্রের অভিশাপে রাজার মন্ত্রী শুকনাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম হইল,—বৈশম্পায়ন। কপিঞ্জল ঘোটক হইলেন, চন্দ্রাপীড়ের দাসত্বে নিযুক্ত হইলেন।

এখন মহাশ্বেতা কোথায় ও কি অবস্থায়, তাহা দেখিব। দুঃখিনী জানে না যে, তাহার অদৃষ্টে কি লিখিত হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

অচ্ছোদ সরোবরের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রপ্রভ নামে এক পর্ব্বত আছে। চন্দ্রপ্রভের শোভা বড় সুন্দর। স্থান নীরব, নির্জ্জন; চারিদিকে রমণীয় উপবন। পর্ব্বতের নিম্নে ভগবান শূলপাণির মন্দির। মন্দির মধ্যে, ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে, পাঠককে একবার দাঁড়াইতে হইবে।

মন্দির মধ্যে, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে, ধ্যাননিমগ্নচিত্তা, মুদ্রিতা নয়না, ঐ বসিয়া কে? ভালো করিয়া দেখ—

"নির্ম্মলাং নির্ম্মমাং নিরহঙ্কারাং নির্ম্মৎসরামমানুষাকৃতিং দিব্য-স্যন্দপরিক্ষ্ণংমানবয়ঃপ্রমাণামপ্যষ্টাদশবর্ষদেশীয়ামিবোপলক্ষ্যমাণাং প্রতিপন্নপাশুপতব্রতাং কন্যকাং"—

"পাশুপতব্রতধারিণী, নির্ম্মলা, নির্ম্মমা, নিরহঙ্কারা, নির্ম্মৎসরা অমানুষাকৃতি, অষ্টাদশবর্ষ-দেশীয়া, এক কন্যাকে দেখিবে।" কন্যার দেহপ্রভায় উপবন উজ্জ্বল! তাঁহার মস্তক জটা পরিব্যাপ্ত; কণ্ঠ রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত;—তাঁহার পরিধানে বল্কল, দেহ বিভূতিভূষিত। "ঘসা ফানুসের ভিতর হইতে আলোক যেমন আরও উজ্জ্বল হইয়া বাহির হয়", মহাশ্বেতার দেহ ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও তাঁহার রূপ আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল।

এই মন্দির সন্নিকটস্থ এক গিরিগুহায়,—মহাশ্বেতার আশ্রম। আশ্রম শান্তিরসে পরিপূর্ণ। নির্ঝরিণীর মধুর শব্দ,—মধুরকণ্ঠ বিহগের সুমিষ্ট সঙ্গীতে মিশিতেছে। চারিদিকে বৃক্ষলতা ফল-পুষ্পে সুশোভিত। এই আশ্রমে, মহাশ্বেতা ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করেন। ব্রহ্মচারিণী সরোবরে স্নান করেন, মন্দিরে গিয়া দেবাদিদেব ভগবানের অর্চ্চনা করেন, বীণা-বাদনপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি গান করেন। আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষা-কপাল লইয়া, বৃক্ষের ফলমূল আহরণ করিয়া আহার করেন। সন্ধ্যাকালে আবার উপাসনাদি করেন, রাত্রে এক শিলাতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। এই ভাবেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য পালন হয়।

হিন্দুর গৃহে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বিনী বিধবার মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করো,—সে মূর্ত্তিও এমনই পবিত্র, এমনই সুন্দর!

তেমন "আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু

সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত ;—যেমন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি।"*

মহাশ্বেতার এই মূর্ত্তি! এস, আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, এই পবিত্রহৃদয়া ব্রহ্মচারিণীর চরণে প্রণাম করি।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—একে একে কত ঋতু কতবারই চলিয়া গেল!—মহাশ্বেতার সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-পালন একবার নয়ন ভরিয়া দেখ! অভক্তি নাই, অবিশ্বাস নাই, অধৈর্য্য নাই!—এ মহাব্রতের যেন আর অবসান নাই! ধন্য সহিষ্ণুতা,—ধন্য প্রেম!

এই মন্দিরে, দেবমূর্ত্তি সম্মুখে, মহাশ্বেতার যে পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলাম, ইহাই হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকে। সেই নির্ম্মল চন্দ্র-করোজ্জ্বল নিশীথে মহাশ্বেতা অভিসারিকাবেশে যখন অচ্ছোদ-সরোবর-তট আলো করিয়া চলিয়াছিলেন,—প্রেমিকার সে অনুরাগোৎফুল্ল মুখখানি আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। সে প্রেমোন্মাদিনী মূর্ত্তিতে ও এই শান্তিরূপিণী দেবী-মূর্ত্তিতে কত প্রভেদ!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নে খুব সৌহার্দ্দ। পিতামাতার আজ্ঞা লইয়া, চন্দ্রাপীড় দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন, বৈশম্পায়নও সঙ্গে চলিলেন।

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের "শান্তি"—আনন্দমঠ।

অচ্ছোদ-সরোবরের কিছু দূরে তাঁহারা শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন। এই সময়ে চন্দ্রাপীড়ের জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। সে কথা আমাদের আলোচ্য নহে। উজ্জয়িনী হইতে পিতার পত্রপাঠে চন্দ্রপীড় গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। সৈন্যাদি ফিরাইয়া লইবার ভার বৈশম্পায়নের হস্তে দিয়া, তিনি অগ্রে চলিয়া গেলেন।

বৈশম্পায়ন, অচ্ছোদ-সরোবরের কথা শুনিয়া ছিলেন। পুরাণে কথিত আছে, এই সরোবর অতি পবিত্র তীর্থ। বৈশম্পায়নের ইচ্ছা হইল,—এই তীর্থ দেখিয়া যাইবেন।

পাঠক জানেন, পুণ্ডরীক বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আবার অচ্ছোদ সরোবরের নিকটবর্ত্তী। কিন্তু আমরা এখনই যাহা আশা করিতেছি, তাহা কি মিটিবে? মহাশ্বেতা প্রেমে অবিচলা, মহাপুরুষের আশ্বাসবাক্যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন,—তাঁহার আশা কি মিটিবে?

বৈশম্পায়ন,—সরোবর দেখিলেন। সরোবরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণে বড় আনন্দ পাইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা অতীত-স্মৃতি মনে জাগিতে লাগিল। সে স্মৃতি বড় অস্পষ্ট, বড় ক্ষীণ! ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু এইখানে যেন তাঁহার কি ছিল,—যেন কি হইয়াছিল,—যেন কি হারাইয়া গিয়াছে,—কিছুই মনে পড়ে না;—কিন্তু তবু একটা স্মৃতি জাগিতেছে।

বৈশম্পায়ন সরোবর-তীরে ঘুরিতে ঘুরিতে এক লতামণ্ডপ দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে এক শিলা পতিত ছিল। বৈশম্পায়ন সতৃষ্ণনয়নে সেই শিলাপানে চাহিয়া রহিলেন!—কেন?

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে,—এইখানে এই শিলাতলে বসিয়া,—সেই প্রেমময়ী, লাবণ্য-প্রতিমা মহাশ্বেতার চিন্তা করিতে করিতে পুণ্ডরীক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ আবার কত বৎসর পর, পুণ্ডরীক সেই বৈশম্পায়নরূপে সেই স্থানে উপস্থিত!—তাই এই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি।

এখানে মনোবিজ্ঞানের একটি সত্য দেখিতে পাই। একটি ঘটনা,—কখন কেবলমাত্র সেইটি,—কখন বা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক ঘটনা কিংবা কারণ সমূহের সহিত,—হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। মনে করো, একটা ঘটনা ঘটিল। সেইরূপ ঘটনার পর অনেক দিন গিয়াছে,—ঘটনার স্মৃতি কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে,—কখন বা তাহা এককালে স্মৃতি হইতে বিলুপ্তও হইয়াছে;—কিন্তু যখন সেইরূপ ঘটনা আর একটা ঘটিল, কিংবা তদনুরূপ পারিপার্শ্বিক ঘটনা আরও ঘটিতে থাকিল,—তখন সেই অতীতের ঘটনা মনে পড়া খুবই সম্ভব।

আবার এমনও হইয়া থাকে। এক স্থানে একটা ঘটনা ঘটিল। ঘটনাটা কালক্রমে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যখন আবার সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন সেই অতীত ঘটনা স্মৃতিমাঝে পুনর্জ্জীবিত হইল।

পুণ্ডরীক, এই সরোবরতীরে, এই লতামণ্ডপে, এই শিলাতলে, মহাশ্বেতার চিন্তায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছিলেন। কপিঞ্জল পাে বসিয়া কত উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাশ্বেতার চিন্তায় হৃদ অবসন্ন, তাহার উপর বিরহি-হৃদয়ের সন্তাপদায়ী চন্দ্র-কিরণ!—পুণ্ডরীক মহানিদ্রার ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন! চন্দ্রকে অভিশপ্ত করিলেন। সে পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। তার পর

অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। সেই পুণ্ডরীক,—এক্ষণে বৈশম্পায়ন,—ঘটনাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত!

অতীত ঘটনা মনে পড়িবার যে দুই প্রকার কারণ বলিয়া আসিলাম, সেই সেই কারণে বৈশম্পায়নের হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা অতি অস্পষ্ট। অস্পষ্ট,—কেন না, পুণ্ডরীকের জন্মান্তর ঘটিয়াছে। পরন্তু একটা কথা হইতেছে এই যে, আমি যে কারণদ্বয় উপরে বলিয়া আসিলাম, তাহা একই জীবনে সম্ভব। পুণ্ডরীকের জন্মান্তর ঘটিয়াছে,—জন্মান্তরেও কি সে স্মৃতি জাগিতে পারে? ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য।

হিন্দু পূর্ব্বজন্মবাদী। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম,—দুই-ই এক শৃঙ্খলে বদ্ধ। একই আত্মা অবিরত চলিয়াছে,—তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এক জীবনে যতদূর চলিবার, চলিয়াছি; পরজীবনে, তাহার পর হইতে আরও চলিয়াছি বা চলিতে হইবে। এক এক জনের ইহজীবনের কার্য্যাবলী দেখিয়া অনেক সময় বুঝি, তাহা তাহার পূর্ব্বজীবনের বাসনা-স্বরূপ। * পূর্ব্বজীবন ও ইহজীবনের মাঝখানে যে ব্যবধানটুকু আছে, তাহাতে পূর্ব্বজীবনের সকল স্মৃতি এককালে বিলুপ্ত হয় না। সেই বিলুপ্ত না হওয়াটা,—অনেক সময় জীবনের কার্য্যাবলীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কথাটা গুরুতর। এখানে সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে।

বৈশম্পায়নের মনে সেই অস্পষ্ট স্মৃতি জাগিতেছে। তিনি বড় অন্যমনস্ক,—যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। বহুক্ষণ তিনি নির্নিমেষ নয়নে সেই শিলাপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

অনুচরবর্গ, বৈশম্পায়নের এ ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না।

* "সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব"—রঘুবংশম্।

সরোবর হইতে প্রত্যাগমনের জন্য তাহারা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। ফিরিবার বুঝি সামর্থ্যও ছিল না,—তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিকল হইয়া আসিতেছে, শরীর অবসন্ন হইতেছে। তখন অনুচরবর্গ ফিরিয়া গেল। বৈশম্পায়ন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘুরিতে ঘুরিতে বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাশ্বেতা দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার সে ভাব ও ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, যেন তিনি কোন প্রনষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতেছেন। দুইজনে দুইজনকে দেখিলেন।—চারিটি চক্ষু আবার মিলিল!

বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতাকে দেখিলেন,—মহাশ্বেতা যেন তাঁহার কতদিনের পরিচিতা;—সেই ভাবেই তিনি মহাশ্বেতার পানে চাহিয়া রহিলেন। মহাশ্বেতার চক্ষু বিস্ময়পূর্ণ; তিনি ভাবিতেছেন—"এ আবার কি! এ ব্যক্তি এমন ভাবে আমার পানে চায় কেন?"

হায় পুণ্ডরীক!

জন্মান্তরীণ অনুরাগ পরতন্ত্র হইয়াই বৈশম্পায়ন এই ভাবে মহাশ্বেতার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

বলিয়াছি, মহাশ্বেতার এ মূর্ত্তিতে পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য আর নাই। সে সৌন্দর্য্যের উপর এখন আর একটা সৌন্দর্য্যের আবরণ পড়িয়াছে। গন্ধর্ব্ববালার সেই অপরূপ রূপরাশির উপর,

চিত্তের পবিত্রতা হইতেও আর একটা নূতন রূপ আসিয়া মিশিয়াছে।—"জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইয়াছে।"

এখন আবার পুণ্ডরীকের সেই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য মনে করো। বৈশম্পায়ন ইহজন্মে, এই উপস্থিত মুহূর্ত্তেও সেই রূপ ইন্দ্রিয়বিকারগ্রস্ত হইলেন। মহাশ্বেতার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি কে? তোমার এই নবীন বয়স, এই সুকুমার দেহ, এই পবিত্র রূপরাশি,—তোমার এ তপস্বিনীর বেশ কেন? এ কঠোর ব্রত কেন? এ ব্রতপালন যে তোমার বয়স ও আকৃতির বিসংবাদী কার্য্য!"*—এইরূপ অনেক কথাই তিনি বলিলেন। এখন বৈশম্পায়ন,—রূপমোহে চঞ্চল, ইন্দ্রিয়বিকারে অধীর; তাই এ দেবী-প্রতিমার সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য পবিত্র চক্ষে দেখিতে পাইলেন না।

পতিপ্রেম-ভিখারিণী তপস্বিনী মহাশ্বেতার হৃদয়ে পুণ্ডরীকের মূর্ত্তি নিয়তই জাগিতেছে। গিরিগুহায় বাস, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দেবার্চ্চনা, পতিপদ চিন্তা,—এই লইয়াই তাঁহার জীবন।—"বৎসে, প্রাণত্যাগ করিও না, পুণ্ডরীককে আবার পাইবে"—মহাপুরুষের সেই কথা এখনও তাহার কাণে বাজিতেছে,—সেই আশায় তিনি প্রাণধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে বৈশম্পায়নের সেই সব ঘৃণাকর

* পাঠকের অবশ্যই মনে আছে, চন্দ্রের অভিশাপে পুণ্ডরীকের জীবন বিপর্য্যস্ত; কিন্তু যাঁর কিরণ-সম্ভূত কুলে মহাশ্বেতার জন্ম বলিয়া, চন্দ্রের কৃপায় মহাশ্বেতা সেই বয়সেই, সেই দিব্যাকৃতি পুণ্ডরীককে পাইবেন,—এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছিলেন।

কথা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন। অগত্যা সেদিনকার মতো বৈশম্পায়ন চলিয়া গেলেন।

একদিন নিশীথসময়ে, গ্রীষ্মের আতিশয্যবশতঃ, মহাশ্বেতা বহিঃস্থিত এক শিলাতলে শয়ন করিয়াছিলেন। চক্ষে নিদ্রা নাই। আকাশে চন্দ্র ; চন্দ্রকিরণে চারিদিক্ উজ্জ্বল। চন্দ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের কথাই ভাবিতেছেন ;— "আর কি পাইব না ? দুঃখিনীর জীবন-সর্ব্বস্ব কি আর মিলিবে না ? দেববাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রাণধারণ করিয়া আছি, সে বাক্য কি মিথ্যা হইবে ? প্রিয়তম,—দেব পুণ্ডরীক, কোথায় তুমি ?"—ভাবিতে ভাবিতে মহাশ্বেতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বল্কল-পরিধানা, দিব্যমূর্ত্তি, তপস্বিনীর সেই দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ চক্ষে জল !—তাহার উপর চন্দ্রকিরণ ! সে মূর্ত্তি কি সুন্দর !

এমন সময়ে, মহাশ্বেতা কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই বৈশম্পায়ন দুই বাহু প্রসারণ করিয়া, যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই, উন্মত্তভাবে ছুটিয়া আসিতেছেন। তখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বৈশম্পায়ন উন্মত্তই বটে। নিকটে আসিয়া অতি লজ্জাকর কথাই বলিলেন। তপস্বিনীর সেই কুসুম-সুকুমার দেহ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল, এক একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। মহাশ্বেতার সে তেজোময়ী ভীষণা মূর্ত্তি,— বৈশম্পায়নের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিল।

তখন সেই শান্তিপূর্ণ নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া, মহাশ্বেতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"আঃ পাপ, কথমেবং গদতো মামুত্তমাঙ্গে ন তে নিপতিতং ?——"

"রে দুরাত্মন্! তুই আমাকে এইরূপ বলিতেছিস্? এখনও তোর মস্তকে বজ্রপাত হইল না?"

তারপর, সাধ্বী পতিব্রতা মহাশ্বেতা চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দেব, যদি পুণ্ডরীকের দর্শনাবধি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে তির্য্যক্‌জাতির ন্যায় যথেচ্ছাচারী এই দুরাত্মার,—তির্য্যক্‌জাতিতেই পতন হউক!"

সতীর অভিশাপ! সতীবাক্য কোন্ কালে বিফল হইয়াছে? বৈশম্পায়ন অচেতন হইয়া, ভূতলশায়ী হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অচ্ছোদ সরোবর হইতে প্রত্যাগত অনুচরবর্গের নিকট চন্দ্রাপীড় শুনিলেন যে, বৈশম্পায়ন সরোবর দর্শনাভিলাষে গিয়াছেন, সেখান হইতে তিনি আর ফিরিবেন না। বন্ধুর সহসা এই বৈরাগ্যের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, চন্দ্রাপীড় অশ্বারোহণে অচ্ছোদ সরোবরে আসিলেন। মহাশ্বেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বৈশম্পায়নের মৃত্যু-সংবাদ তিনি শুনিলেন।

চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়ও স্বীয় প্রণয়িনী-চিন্তায় পূর্ণ ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার পরামর্শ লইয়া, প্রণয়িনী সন্দর্শনে যাইবেন। এখন তো সে আশায় নিরাশ হইলেন। বৈশম্পায়নের মৃত্যু সংবাদে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন।

দুইজনের অভিশাপ ফলিল। চন্দ্রের অভিশাপে, পুণ্ডরীক, বৈশম্পায়ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার অনুরাগ-পরতন্ত্র হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। আবার পুণ্ডরীকের অভিশাপে, চন্দ্র, চন্দ্রাপীড় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও অনুরাগবশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এখনও আর একবার দুইজনকেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে!

এদিকে চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অশ্ব, সরোবরে ঝম্প প্রদান করিল। এতদিনে ঋষিশাপ বিমোচিত হইল। কপিঞ্জল সরোবর হইতে উঠিয়া মহাশ্বেতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে, মহাশ্বেতা চমৎকৃতা হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্ কপিঞ্জল, এ সকল কি? এ সব কাহার মায়া? কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না!"

আমরাও কিছুই বুঝি না। আমাদের অলক্ষ্যে, কত কি ঘটিতেছে, কিছুই জানিনা,—জানিবার উপায়ও নাই। যাহা ঘটিতেছে, আমরা কেবল তাহারই ফলভোগ করিতেছি মাত্র।

মহাশ্বেতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার বন্ধুর মৃত-দেহের সহিত আপনিও যে সেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন,—এতকাল কোথায় ছিলেন? আপনার প্রিয় সখাকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন?"

পুণ্ডরীকের মৃতদেহ লইয়া যাহা যাহা হইয়াছে,—পুণ্ডরীক যে বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কপিঞ্জল যে অশ্ব হইয়া-ছিলেন,—ইত্যাদি সকল কথাই আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। মহাশ্বেতা এখন সেই সকল শুনিলেন।

মহাশ্বেতা সব শুনিলেন;—"পুণ্ডরীকই আবার বৈশম্পায়ন-

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? জন্মান্তরেও তিনি আমার প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই? তাই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন? তাই পরিচিতের ন্যায় আমার মুখপানে চাহিয়াছিলেন? হায়! নৃশংসা, রাক্ষসী আমি,—আমারই জন্য বার বার তাঁর এই দশা হইতেছে?"——নয়ন-জলে মহাশ্বেতার বল্কল ভাসিয়া গেল।

কপিঞ্জল বুঝাইতে লাগিলেন;—"চন্দ্রের অভিশাপ বশতই এই সব ঘটিতেছে, তোমার দোষ কি? কিন্তু তুমি তাঁহাকে আবার পাইবে,—ইহা স্বরূপ কহিলাম। এই ব্রত প্রাণপণে পালন করো,—ইহাতেই একান্ত অনুরক্ত হও;—আশা অবশ্যই মিটিবে। তপস্যা করিয়া গৌরী যেমন শিবকে পতিত্বে লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি পুণ্ডরীককে পাইবে।"

এইরূপে মহাশ্বেতাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া, তিনি মহাত্মা শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিলেন।

চন্দ্র, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি বিদিশা নগরীতে শূদ্রক নামে রাজা হইলেন। পুণ্ডরীকও জন্মগ্রহণ করিলেন; কিন্তু সতীবাক্যে পক্ষিজাতিতে শুকরূপে তাঁহার জন্ম হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাঠককে এখন একবার মহর্ষি জাবালির আশ্রমে যাইতে হইবে। মহর্ষির আশ্রম,—সুখশান্তিপরিপূর্ণ। উন্নত পাদপ সকল ফুলফলে সুশোভিত রহিয়াছে। কুসুমিতা বল্লরী আপন শোভায় শোভাময়ী। গাছে গাছে, লতায় লতায়, বুকে বুকে মিশিয়া, কি সুন্দর কুঞ্জই নির্ম্মিত হইয়াছে! ভ্রমরকুল ঝঙ্কা-

করিয়া, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইতেছে। মধুর-কণ্ঠ বিহগ-গণ সুমিষ্ট-সঙ্গীতে আকাশ প্লাবিত করিতেছে। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ব্যাধি নাই, দুঃখ নাই ;—আশ্রম শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র।

মহর্ষি জাবালি অতি প্রবীণ। তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলে, হৃদয় পবিত্র হয়। সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। তাঁর চারিদিকে শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছেন। কেহ বেদপাঠ করিতেছেন, কেহ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, কেহ শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, কেহ বা অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন। সকলেরই নয়নে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি।

একদিন, এমনই সময়ে, মহর্ষি জাবালির পুত্র হারীত একটি শুক-শিশু লইয়া আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। হারীত পম্পা-সরোবরে স্নানার্থ যাইতেছিলেন,—পথিমধ্যে মৃতপ্রায়, অসহায়, ভূপ.তত এই শুকশিশুটিকে দেখিতে পাইয়া, তুলিয়া লইলেন।

হারীতের হস্তে এই শুকশিশু দেখিয়া, অন্যান্য মুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহা কোথায় পাইলে?" হারীত যে ভাবে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শুক-শিশু বৃক্ষ-কোটর হইতে ভূপতিত হইয়াছিল।

ত্রিকালদর্শী মহাতপা জাবালি একবার সেই শুক-শিশু পানে তাকাইলেন। তপঃপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে সকল রহস্যই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "এই শুক-শিশু আপন দুষ্কৃতির ফল ভোগ করি-তেছে।" কথাটা শুনিয়াই সকলের সেই শুক-বৃত্তান্ত জানিবার কৌতূহল জন্মিল। মহর্ষি আদ্যোপান্ত সকল কথাই বলিলেন।

পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এই শুক-শিশুই,—সেই শুদ্ধাচারিণী মহাশ্বেতার অভিশপ্ত বৈশম্পায়ন এবং সেই বৈশম্পায়ন চন্দ্রের অভিশপ্ত পুণ্ডরীক।

যে প্রকার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে মৃত্যু উপস্থিত হয়, পুণ্ডরীকের সে প্রকার চিত্তবিকার কেন হইয়াছিল? সেই কথা এখন বলিব।

আমাদের যে প্রশ্ন, জাবালির আশ্রমস্থিত মুনি ঋষিগণেরও সেই প্রশ্ন। পুণ্ডরীক দিব্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে এত অল্পায়ু কেন হইলেন? প্রাণধারণ করা যায় না,—এমন চিত্ত-বিকারই বা কেন তাঁহার হইয়াছিল?

সর্ব্বতত্ত্ববিৎ, তপোনিষ্ঠ জাবালি সে কথা বুঝাইয়া দিলেন।

কথাটা এই ;—

আমরা জানি, সন্তান পিতামাতার অনেক গুণ পাইয়া থাকে। কোন বংশে যদি কোন একটা গুণ বরাবর চলিয়া আসিয়া থাকে, তবে বংশ-পরম্পরায়ও, সেই গুণ চলিতে পারে। এমনও শুনা যায়, সঙ্গীতজ্ঞ একটা বংশে, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সকলেই সঙ্গীত-প্রিয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ।

মানসিক বৃত্তিনিচয় লাভের যত প্রকার উপায় আছে, জন্ম-সময়ে, পিতৃপুরুষ হইতে তাহার দুই একটা লাভও তাহার একটা উপায়। সর্ব্বত্র ইহা দৃষ্ট না হইলেও, অনেকস্থলেই ইহা দেখা যায়। সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন তাহার মাতার যেরূপ মনোবৃত্তি, সেই সন্তানেরও সেইরূপ মনোবৃত্তি সংক্রামিত হওয়া সম্ভব।

পুণ্ডরীকের জন্মকালে তাঁহার মাতা অত্যন্ত রিপুপরতন্ত্র হইয়া-ছিলেন বলিয়াই, সন্তানে তাহা বর্ত্তিয়াছে। তাহারই ফলে এই অনর্থ ঘটিয়াছে। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রামিত হইয়াছে। [illegible] হইয়া থাকে।

এদিকে, মহাত্মা জাবালি যখন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে শুক-বিবরণ বলিতেছিলেন,—তখন শুক-শিশু সেই সকল শুনিতে শুনিতে, আত্মবিবরণ জ্ঞাত হইল।—তখন একে একে সব মনে পড়িল।—হায়, কোথায় মহাশ্বেতা? কোথায় কপিঞ্জল? কোথায় চন্দ্রাপীড়? আর কোথায় বা মহাত্মা শ্বেতকেতু?

শ্বেতকেতু পুত্রের শুভার্থে এক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি তপঃ-প্রভাবে সমস্তই জানিয়াছেন। কপিঞ্জলও সেইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কিছুদিন গেল। শুকরূপী পুণ্ডরীকের প্রাণে আবার মহা-শ্বেতার চিন্তা জাগিল। তিনি ভাবিতেছেন,—"হায়! কতদিনে আবার সে প্রেমমুখ দেখিতে পাইব? দিব্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার এই দুর্দ্দশা!—হায়, সব তো ভুলিয়াছিলাম! ভুলিয়া থাকিয়াই যে ভালো ছিলাম! এখন আবার কেন সব কথা মনে পড়িল?" যখন মহাশ্বেতার চিন্তাটা বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—সকলের অজ্ঞাতে আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। কোথায় যাইবেন?—মহাশ্বেতার আশ্রমে!

ঘটনাচক্রের কি নিষ্পেষণ! পথের মাঝে এক চণ্ডাল-কর্তৃক সেই শুকশিশু ধৃত হইল। চণ্ডাল সেই শুকশিশু শূদ্রক রাজাকে উপহার দিল।—কবির কৌশলটা দেখিলে?

পাঠক জানেন, শূদ্রক রাজা আর কেহই নহেন,—স্বয়ং চন্দ্র। একবার চন্দ্রাপীড় হইয়াছিলেন, এখন শূদ্রক রাজা হইয়াছেন!

এইবার আমরা আশা করিতে পারি, এই মিলন হইতে একটা কিছু শুভ ফলিবে।

তাহাই হইল। পুণ্ডরীকের জননী লক্ষ্মী সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শ্বেতকেতুর সে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।—"শাপ বিমোচিত হইল, তোমরা এক্ষণে স্ব স্ব বস্তু লাভ করো"—এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন।

তারপরের কথাটাও কি বলিতে হইবে? তবে একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে এস;—শূদ্রক রাজার কথায় আমাদের আর কাজ নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্ত কাল উপস্থিত। বসন্ত সমাগমে, অচ্ছোদ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। সেই চন্দ্রপ্রভ পর্ব্বত, সেই উপবন,—সব মনোরম হইয়াছে। ব্রহ্মচারিণী মহাশ্বেতার আশ্রম অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

সব সুন্দর। যে পবিত্র আশা বুকে করিয়া, মহাশ্বেতা ব্রহ্মচারিণী, তাহাও সুন্দর। আশা কি চিরদিনই অতৃপ্ত থাকিবে? [illegible] কি অবসান হইবে না?

[illegible], বসন্ত-সমাগমে উপবন হাসিতেছে; মহাশ্বেতার মুখেও [illegible] দেখিব না? জ্যোৎস্নালোকে সরোবর নৃত্য করিতেছে; [illegible] হৃদয়ও কি আনন্দে নৃত্য করিবে না? সহকার, [illegible]রী পরিয়া সুন্দর হইয়াছে—মৃদুমন্দ বসন্ত পবন বহি-[illegible]—কোকিল কুহুরবে সুধাবর্ষণ করিতেছে,—ভ্রমরকুল [illegible]কারে আনন্দ করিতেছে,—চারিদিকে শোভা,—চারিদিকে

এদিকে, মহাত্মা জাবালি যখন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে শুক-বিবরণ বলিতেছিলেন,—তখন শুক-শিশু সেই সকল শুনিতে শুনিতে, আত্মবিবরণ জ্ঞাত হইল।—তখন একে একে সব মনে পড়িল।—হায়, কোথায় মহাশ্বেতা? কোথায় কপিঞ্জল? কোথায় চন্দ্রাপীড়? আর কোথায় বা মহাত্মা শ্বেতকেতু?

শ্বেতকেতু পুত্রের শুভার্থে এক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি তপঃ-প্রভাবে সমস্তই জানিয়াছেন। কপিঞ্জলও সেইরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কিছুদিন গেল। শুকরূপী পুণ্ডরীকের প্রাণে আবার মহাশ্বেতার চিন্তা জাগিল। তিনি ভাবিতেছেন,—"হায়! কতদিনে আবার সে প্রেমমুখ দেখিতে পাইব? দিব্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার এই দুর্দ্দশা!—হায়, সব তো ভুলিয়াছিলাম! ভুলিয়া থাকিয়াই যে ভালো ছিলাম! এখন আবার কেন সব কথা মনে পড়িল?" যখন মহাশ্বেতার চিন্তাটা বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—সকলের অজ্ঞাতে আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। কোথায় যাইবেন?—মহাশ্বেতার আশ্রমে!

ঘটনাচক্রের কি নিষ্পেষণ! পথের মাঝে এক চণ্ডাল-কর্তৃক সেই শুকশিশু ধৃত হইল। চণ্ডাল সেই শুকশিশু শূদ্রক রাজাকে উপহার দিল।—কবির কৌশলটা দেখিলে?

পাঠক জানেন, শূদ্রক রাজা আর কেহই নহেন,—স্বয়ং চন্দ্র। একবার চন্দ্রাপীড় হইয়াছিলেন, এখন শূদ্রক রাজা হইয়াছেন!

এইবার আমরা আশা করিতে পারি, এই মিলন হইতে একটা কিছু শুভ ঘটিবে।

তাহাই হইল। পুণ্ডরীকের জননী লক্ষ্মী সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শ্বেতকেতুর সে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।—"শাপ বিমোচিত হইল, তোমরা এক্ষণে স্ব স্ব বস্তু লাভ করো"—এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন।

তারপরের কথাটাও কি বলিতে হইবে? তবে একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে এস;—শূদ্রক রাজার কথায় আমাদের আর কাজ নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্ত কাল উপস্থিত। বসন্ত সমাগমে, অচ্ছোদ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। সেই চন্দ্রপ্রভ পর্ব্বত, সেই উপবন,—সব মনোরম হইয়াছে। ব্রহ্মচারিণী মহাশ্বেতার আশ্রম অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

সব সুন্দর। যে পবিত্র আশা বুকে করিয়া, মহাশ্বেতা ব্রহ্মচারিণী, তাহাও সুন্দর। আশা কি চিরদিনই অতৃপ্ত থাকিবে? [illegible] কি অবসান হইবে না?

[illegible] বসন্ত-সমাগমে উপবন হাসিতেছে; মহাশ্বেতার মুখেও হাসি দেখিব না? জ্যোৎস্নালোকে সরোবর নৃত্য করিতেছে; মহাশ্বেতার হৃদয়ও কি আনন্দে নৃত্য করিবে না? সহকার, [illegible] পরিয়া সুন্দর হইয়াছে—মৃদুমন্দ বসন্ত পবন বহি[illegible]—কোকিল কুহুরবে সুধাবর্ষণ করিতেছে,—ভ্রমরকুল [illegible]রে আনন্দ করিতেছে,—চারিদিকে শোভা,—চারিদিকে

আনন্দ ;—মহাশ্বেতা কি তবে কেবল আশা লইয়া থাকিবেন? আশা কি ফলবতী হইবে না?

মহাশ্বেতা নির্ম্মল আকাশে, নির্ম্মল চন্দ্রের পানে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে, সেই অনিন্দ্যরূপ সেই দেবমূর্ত্তি পুণ্ডরীক ধীরে ধীরে নামিতেছেন। তাঁহার নয়নে প্রীতি, অধরে হাসি, হৃদয়ে আনন্দ, কণ্ঠে সেই একাবলী হার,—সঙ্গে কপিঞ্জল! চাহিয়া, চাহিয়া, মহাশ্বেতার কি হইল, তাহা বলিব না, তাহা বলিতে পারিব না,—বলিবার সে ক্ষমতা আমার নাই।

তার পরের অবস্থা দেখ। মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক পরস্পরে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। কাহারও হৃদয়ে ভাষা নাই। সেই উদার অনন্ত আকাশ তলে, শুভ্র জ্যোৎস্না-কিরণে, বসন্ত-পবনান্দোলিত বৃক্ষ-বল্লরীর অন্তরালে,—সেই পরস্পর-প্রেমালিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ প্রণয়ি-যুগলের সে শোভা কি মধুরিমময়ী! দুইজনেরই চক্ষে জল!—তাহাই বা কত মধুর ও অপূর্ব্ব!

প্রেমের জয় হইল।

মাতৃভক্তি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এই অমৃতময়ী দেব-বাণী যে মহাপুরুষের মুখ হইতে প্রথম বাহির হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে, তাঁহাকে শত শত নমস্কার করি। বস্তুতঃ, জননী অপেক্ষা পূজনীয়া, সংসারে আর কেহ নাই এবং জননী অপেক্ষা মহাগুরুও আর কেহ নহেন। "স্বর্গাদপি গরীয়সী"—অর্থাৎ "স্বর্গ যে এত উচ্চ ও পবিত্র, মাতা তদপেক্ষাও উচ্চ ও পবিত্র।" কথাটি ধ্রুব-সত্য। হিন্দুর দেশে, মাতৃভক্তি যে কি পরম পুণ্যময় পবিত্র বস্তু, তাহা হিন্দুই জানেন। শুধু হিন্দুর দেশ কেন,—পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই, যেখানে মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া না যায়। তবে ভক্তিপ্রাণ হিন্দুর দেশে, ভক্তি-প্রাণ হিন্দুর জীবনে, এই পবিত্র মাতৃভক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেবতাভাবে মাতৃ-পূজা আর কোন দেশে নাই।

কিন্তু হিন্দু, 'মাতা' বলিতে, কেবলই গর্ভধারিণী জননীকে বুঝেন না,—অনেকেই তাঁহার মাতৃস্থানীয়া বা মাতা। হিন্দু-শাস্ত্রকারও, মাতার "একবিংশতি নামমালা" নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন।—"মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা, সর্ব্বদুঃখহা, আরাধনীয়া, পরমা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া ও দুঃখ-

হন্ত্রী”—এই একবিংশতি নামমালাই হিন্দুর জপ, তপ ও আরাধ্য বস্তু। এবং এই কয়েকটিতে আত্মমনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিলেই, হিন্দুর মুক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবী, গো, বসুন্ধরা প্রভৃতি আরও ষোড়শমাতা শাস্ত্রে কথিত আছে।

হিন্দুর শাস্ত্র কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;—শাস্ত্র বলিতেছেন,—পিতা ও মাতা উভয়েই এক;—উভয়েই মহাগুরু এবং উভয়েই বিশিষ্ট ভক্তির পাত্র। পিতা—জ্ঞান, মাতা—ভক্তি; পিতা—পুরুষ, মাতা—প্রকৃতি; পিতা—হর, মাতা—গৌরী। উভয়ের আধার-আধেয় সম্বন্ধ। যিনি একাধারে, অভেদজ্ঞানে, এই যুগল-মূর্ত্তির পূজা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সু-সন্তান।

আবার হিন্দুর নীতিবেত্তা বলিতেছেন,—“মাতৃবৎ পর-দারেষু”। পরস্ত্রী মাত্রেই মাতার ন্যায়। অর্থাৎ কেবলই যে, মাতাকে ভক্তি করিবে এমন নহে,—পরস্ত্রীকেও মাতৃবৎ ভক্তি করিবে। হিন্দুর শাস্ত্র বড় উদার, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহৎ;—শাস্ত্র ইহার উপরও আবার বলিতেছেন,—স্ত্রীজাতি “পুরুষের নিকট বিশেষ সম্মানার্হা এবং দেবতার ন্যায় পূজনীয়া।” জ্ঞানের জ্বলন্ত ভাস্কর—তন্ত্রশাস্ত্র, আরও উচ্চ-সোপানে উঠিয়া, আরও শতগুণ পবিত্রতা প্রচার করিতেছেন,—‘নারীজাতি শক্তি-স্বরূপিণী;—এ শক্তি, সেই আদ্যাশক্তি—মহাশক্তি,—সাকার-রূপিণী জগন্মাতা জগদম্বার অংশ! এই নারী-মূর্ত্তিতেই ব্রহ্মময়ী-মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে।’—কবি-কল্পনাও স্তম্ভিত হয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে,—কোথাও আছে কি?

সুতরাং এক্ষণে বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রীজাতিকে হিন্দু, অতি ভক্তির চক্ষেই দেখেন। সাধারণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই যখন এই বিধি হইল,—তখন যিনি মাতা, গর্ভধারিণী, করুণা ও স্নেহের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, তাঁহার প্রতি সন্তানের কতদূর ভক্তি করা কর্ত্তব্য ও কতদূর ভক্তি হওয়া স্বাভাবিক,—তাহা কেবলই অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে। মাতৃচরণে হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও, পুত্র তখন মনে করে,—"আরও কেন কিছু রহিল না!" না, বুঝি তবুও পরিষ্কার করিয়া বলা হইল না!—এই যে প্রাণঘাতিনী পিপাসা, ইহারই নাম—নাম কি ঠিক জানি না,—তোমরা ইহাকে ভক্তি বলিতে হয় তো বলো।

এই ভক্তির মধ্যে প্রীতি ও শান্তি নিহিত। ভক্তের হৃদয় প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—তিন মিলিয়া, এক মহাতীর্থ হইয়াছে। ভক্ত, আপনার হৃদয় মধ্যেই, সেই মহাতীর্থ রচনা করেন। তাহার অনিবার্য্য ও চরমফল—মুক্তি।

মাতৃমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিতেছেন,—

"মাতা ও পিতাই পরম গুরু জানিবে। * * * গর্ভে ধারণ ও পোষণ করা হেতু,—মাতা, পিতা অপেক্ষাও অধিক গরীয়সী। অতএব মাতৃতুল্য গুরু, ত্রিভুবনে আর কেহই বিদ্যমান নাই। যেরূপ গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, মহেশ্বরের ন্যায় পূজনীয় নাই, সেইরূপ মাতার সমান গুরুও আর কেহ নাই। যেরূপ ত্রিলোক-বিশ্রুত একাদশী ব্রতের ন্যায় মহৎ ব্রত আর লক্ষিত হয় না, এবং অনশনের তুল্য, যেরূপ আর কোন তপস্যাই নাই, সেইরূপ জগতে মাতার সমান গুরুও আর কেহ

নাই। যেরূপ ভার্য্যার সদৃশ মিত্র নাই, পুত্রের ন্যায় প্রিয়বস্তু নাই এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় মান্যা আর কেহ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ মাতার ন্যায় গুরুও আর দ্বিতীয় নাই। যেমন জামাতার সদৃশ পাত্র আর দৃষ্ট হয় না, যেমন কন্যাদানের তুল্য দান আর নাই এবং ভ্রাতার তুল্য বন্ধুও যেরূপ সম্ভবে না, সেইরূপ মাতার ন্যায় গুরুও আর কেহ নাই। দেশের মধ্যে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী দেশ যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পত্রের মধ্যে তুলসী যেরূপ প্রধান এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেরূপ গরীয়ান্, গুরুর মধ্যে মাতাও সেইরূপ গরীয়সী, সন্দেহ নাই। পুরুষ, ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া, পুত্ররূপে জন্মগ্রহ করিয়া থাকে ;—পূর্ব্বভাবাশ্রয় হইয়া জন্মধারণ করিতে হয় ;—এইজন্য মাতা পরম-গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত। ধর্ম্মবিৎ পুত্র মাতা ও পিতাকে দর্শন করিলে, অগ্রে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর পিতৃপদে প্রণাম করিবে। * * * সুদারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়াও পরমেশ্বরী মাতাকে দর্শন করিলে, যাহার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন হয়, :তাহার আর কোন্ বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে?" *

উদ্ধৃত অংশের অক্ষরে অক্ষরে, জীবন্ত সত্য প্রকটিত। এমন অমৃতময়ী দেব-বাণী, হিন্দুর শাস্ত্র ভিন্ন, আর কোথায় শুনিতে পাইবে?—"পুরুষ, ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বভাবাশ্রয় হইয়া জন্মধারণ করিতে হয়, এইজন্য মাতা, পরম-গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত।"—ইহাপেক্ষা, মাতৃমাহাত্ম্যের আর কি উচ্চাঙ্গের কথা থাকিতে পারে? এইজন্য দেবাদিদেব মহাদেব, আদ্যাশক্তি ভগবতীকে দুই ভাবে দর্শন করেন। জগন্মাতা

* বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ;—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ।

জগদম্বা, এক হিসাবে শিব-জননীও বটেন; অন্য পক্ষে শিবা, শিব-সীমন্তিনীও বটেন। সৃষ্টি-রহস্যের সেই মহাপ্রলয়ের কথা স্মরণ করো;—কারণ-সলিলে ভাসমান সেই মায়াময় গলিত শবদেহের কথা মনে পড়ে কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু—সে মহারহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না,—শ্মশানচারী, সদাশিব সে রহস্য ভেদ করিয়া সে মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন;—যুগ-যুগ কঠোর তপস্যা করিয়া, বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই জন্যই শিব-চরিত্র জগতের আদর্শ; শিবানী-চরিত্র গভীর রহস্যময়। হর-গৌরী পুরুষ-প্রকৃতিও বটেন, আবার উভয়ের মধ্যে মাতা-পুত্র-সম্বন্ধও বটে।—সতীর দক্ষালয় গমনের সে উদ্দাম-দৃশ্য মনে পড়ে কি? সামান্য রমণী-জ্ঞানে না শঙ্কর সতীকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন? কিন্তু তার পর?—তার পর শঙ্করীর সেই কাল-চক্র-নিষ্পেষিত—যুগ-চতুষ্টয়ের সেই .ভাবী-মূর্ত্তি,—কল্পনা করো দেখি! অপরূপ "দশমহাবিদ্যা"-রূপে দেখা দিয়া, সেই বিশ্বপ্রসবিনী, জগজ্জননী,—নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়কেও ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন! তখন শিবের পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িল,—অমনি "মা—মা" রবে, তিনি, সতীর শরণাপন্ন হইলেন। পক্ষান্তরে, সমুদ্র-মন্থনকালে, নীলকণ্ঠের সেই প্রাণ-মাতুয়ারা "দুর্গা"-নাম এবং "মা"-নামও তাঁহার পুত্রত্বের পরিচায়ক।—তখন দেবাদিদেব বিশিষ্ট মাতৃভক্ত বলিয়া সকলের পরিচিত।

মাতৃ-ভক্তি অতি স্বাভাবিক। এ ভক্তি কাহাকেও শিখাইতে হয় না। ভক্ত, মাতৃ-স্তন-পানের সহিত ভক্তির আস্বাদ পান। আমরা যে এখন এত বড় হইয়াছি,—জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা শিখিতেছি, গ্রন্থ ছাপাইতেছি, দশের একজন হইতে চেষ্টা করিতেছি,—

আর আজ এই গভীর বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশে, এই "শাদার পিঠে কালী" দিয়া মুন্সীয়ানা দেখাইতে বসিয়াছি,—ভালো হউক, মন্দ হউক,—এ শক্তিটুকু পাইলাম কোথা হইতে? সকলই সেই মাতৃ-প্রসাদাৎ। জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সেই অসহায় অবস্থায়, কাহার কৃপায়, কাহার করুণায়, আজ আমি এত বড়টি হইয়াছি? সংসার যখন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, জগৎ যখন আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ অন্ধকার,—মল-মূত্র মাখিয়া, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, যখন মনোভাব মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবারও ক্ষমতা ছিল না,—বলো দেখি, সেই অসহায় অজ্ঞানাবস্থা হইতে, আজ অবধি কাহার অঞ্চল-বাতাসে পরিবর্দ্ধিত হইতেছি? সেই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে, বলো দেখি, ক্রমে কে আলোক দেখাইল? অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া কে বলিল,—"ভয় নাই বাছা, আমি তোর আছি!" সেই মা, সেই আমার জগদ্ধাত্রী, সেই আমার সাক্ষাৎ আরাধ্যা দেবী,—আমি অন্ধ,—আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে,—দেখিলাম, আমার সম্মুখে স্ব-প্রকাশ! আমার জীবনদায়িনী, আমার সুখ দুঃখে সমভাগিনী, আমার গুরুর গুরু—মহাগুরু,—আমার প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরী,—আজ আমার চক্ষের সম্মুখে,—অগ্রে মাতৃ-চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া, আর কাহার চরণে দিব? পিতা?—পিতা তো পরে চিনিলাম;—জননী বুঝাইলেন, তবে তো পিতা চিনিলাম! যখন সুকোমল শয্যা ও আগুন পৃথক্ জানিতাম না,—আগুন দেখিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতাম; যখন বিষধরে ও খেলানায় ভেদজ্ঞান ছিল না,—সর্প দেখিলে ধরিতে যাইতাম; তখন—সেই ভেদজ্ঞানের অতীতকালে, আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়াও,—প্রতিপদে, প্রতিমুহূর্ত্তে, কে আমার

জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন?—জননী! জননীই আমাকে প্রথম শিক্ষা দিলেন, এই বস্তুটির নাম এই, ও-বস্তুটি ইহা নহে—উহা আর একটি। শৈশবে জননীই আমায় প্রথম দেখাইলেন, এটি বিছানা—আরাম-স্থল, আর ওটি বিছানা নহে,—আগুন,—উহা স্পর্শ করিলেই হাত পুড়িয়া যায়! জননীর কৃপায় প্রথম শিক্ষা পাইলাম, কে পিতা, কে মাতা, কে ভ্রাতা, কে গুরু। মাতাই আমাকে প্রথম বুঝাইলেন,—এটি কি, ওটি কি; এর গুণ কি, ওর গুণ কি। অতএব মাতাই আদিগুরু। বুঝি এইজন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতেছেন,—"ধর্ম্মবিৎ পুত্র, মাতা ও পিতাকে দর্শন করিলে, অগ্রে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর পিতৃপদে প্রণাম করিবে।" অতএব মাতৃ-ভক্তি যে অতি স্বাভাবিক এবং সুসন্তান মাত্রেরই যে মাতৃভক্ত হইতে হইবে, সে পক্ষে আর কথাটি নাই। মাতৃভক্তিতে পুণ্য আছে কিনা, সে কথা এখন বলিব না,—কিন্তু তদভাবে যে ঘোর অধর্ম্ম ও মহাপাপ সংঘটিত হয়, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুর দেশ ভিন্ন প্রত্যক্ষ দেবতাভাবে মাতৃ-পূজা আর কোন দেশে নাই। কারণ, প্রকৃত ভক্তি কি, তাহা হিন্দুই বুঝেন; আর কর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতভূমি আবহমান কাল হইতে, এই ভক্তির আস্বাদ পাইয়া আসিতেছেন। ইহকাল-সর্ব্বস্ব, পরকালে-অবিশ্বাসী—পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করিতে করিতে, কতটুকুই বা ভক্তির আস্বাদ পায়?—তাহার সে আস্বাদ পাইবার অবসরই বা কোথায়? কেহ কেহ জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিলেও, পূর্ণমাত্রায় ভক্তি উপভোগ করিতে পারে না, জানেও না। কারণ, "পরের মঙ্গল-মন্দিরে

প্রাণের প্রাণ বলি” দিতে না পারিলে,—প্রকৃষ্ট পরিমাণে আত্ম-ত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে, মনুষ্যত্বই লাভ হয় না,—ভক্তি তো দূরের কথা। হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতি এরূপ মহান্ আত্মত্যাগ করিতে পারে না,—সুতরাং হিন্দু ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্বের অধিকারীও আর কেহ হইতে পারে না। এই মনুষ্যত্ব- লাভের সহিত ভক্তিও লাভ হয়। কারণ হিন্দু জানেন,—জীবনও অনন্ত, কালও অনন্ত; কোন-না-কোন জীবনে, কিংবা কোন-না কোন কালে, তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইবেই হইবে। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে ও পরা ভক্তির অধিকারী হইতে, আর কেহ সক্ষম নন। এবং হিন্দু ভিন্ন, প্রত্যক্ষ দেবতা-ভাবে মাতৃ-পূজাও, আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। দুর্ভাগ্য,—দেশের,—এবং ততোধিক আমাদেরও বটে যে, আজ এই মাতৃভক্তিরমাহাত্ম্য,—হিন্দুর দেশে,—হিন্দুর নিকটেই বুঝাইতে হইতেছে!

মাতৃভক্তির এই উচ্চ আদর্শ লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দ-মঠের” সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতা অর্থে, হিন্দু অনেকেই বুঝেন;—জন্মভূমি বা স্বদেশও হিন্দুর মাতা। স্বদেশভক্ত কবি, তাই আনন্দ-মঠে শিক্ষা দিতেছেন,—“দেশের জন্য তুমি কি দিতে পারো?—তোমার পণ কি?” “পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।” “জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।” “আর কি আছে?—আর কি দিব?” তখন উত্তর হইল,—“ভক্তি!” কবি দেখাইলেন, ভক্তির তুলনায় জীবনদানও তুচ্ছ। যেখানে ভক্তি, সেখানে আত্মত্যাগ, সেখানে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন, সেখানে জীবন উৎসর্গ!—না, ইহাতেও হইল না,—যাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাহার জন্য আত্ম-দান,—ইহাও অতি সামান্য কথা,—আপ-

নাকে বা আপনার-বলিতে-যাহা-কিছু আছে—সে সমস্ত অস্তিত্ব-কেই সেই মহান্ ভক্তি-ভাজনের চরণে উৎসর্গ করা চাই;—তবেই তুমি যথার্থ ভক্ত হইলে।

ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি নিষ্ক্রিয় নহে,—ভক্তির কার্য্য অনন্ত। নানাকার্য্যে ভক্তি বিকশিত হয়। মনে মনে ভাল-বাসিয়া বা ভক্তি করিয়া, কিংবা কেবলই হৃদয়ের ভাব লইয়া, ভক্তের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। হৃদয়ে এই ভক্তি বা প্রেম লুকাইয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই, ভক্ত, পুষ্প-চন্দনে আরাধ্য-দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ-দেবতাভাবে পূজা না করিলে, ভক্তের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। আরাধ্য-দেবতার বিরাট-ধ্যানে, আপন অস্তিত্ব মিশাইতে না পারিলে, ভক্তের চিত্ত সুস্থির হয় না। জীবনের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও ভক্ত কাঁদিতে থাকেন,—"আরও কেন কিছু রহিল না!" হৃদয়ের এই দারুণ পিপাসা নানাকার্য্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অবশ্য, মানুষকে অনেক সময় হৃদয়ের অনেক ভাব লুকাইয়া বা চাপিয়া রাখিয়া, কাজ করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত ভক্তির কার্য্য তাহাতে হয় না; সে ভক্তি দু'দিনের মধ্যে উপিয়া যায়;—তাহার প্রতি-ষ্ঠার স্থান হৃদয়ে নাই। ভক্তির এই কার্য্য হইতেই পূজার বিধি।

ভক্তের নিকট মাতৃপূজা অতি স্বাভাবিক। কারণ, ঈশ্বরকে শরীরিবেশে, আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না,—অন্ততঃ, এ অধম লেখকের সে সৌভাগ্য নাই;—কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্য জনের কি তবে পরিত্রাণ নাই? সকলই কি ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছি?—না, আমার সম্মুখে আমার মা-জননী স্ব-প্রকাশ।—আমার সাকার দেবতা, মূর্ত্তিমতী পরমেশ্বরী আর কোথায়?

আমার গৃহেই আমার মূর্ত্তিমতী পরমেশ্বরী,—আমার জননী!—আমি অন্ধ,—মুক্তিলাভার্থ কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছি!

মা আমার পুণ্যের অতীত। এই পুণ্যের অতীত অবস্থা কি?—আমার পাপের অতীত অবস্থা কি, আমি বুঝিতে পারি; কিন্তু পুণ্যের অতীত অবস্থা কি? যখন পুণ্যে পুণ্যে বোধ হয় না, সেই অবস্থাই বুঝি পুণ্যের অতীত। সে কিরূপ?—একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাউক।

পুত্রের ভীষণ বিসূচিকা উপস্থিত; জীবনের আশা অতি অল্প। পুত্র শয্যায় মল-মূত্র ত্যাগ করিতেছে,—উত্থান-শক্তি রহিত। অন্য কেহ স্পর্শ করিতেও সাহস করিতেছে না,—পাছে তদ্দ্বারা তাহাকেও আক্রান্ত হইতে হয়। এই অবস্থায়, মাতা অবিচলিত-চিত্তে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন; নানা প্রকারে তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন।—আপনি স্বয়ং দুই হাতে করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সেই মল-মূত্র পরিষ্কার করিতেছেন।—তখন মা কি ভাবিতেছেন,—"আমি বড় পুণ্য করিতেছি!" মাতা কি তখন ভ্রমক্রমেও ভাবিয়া থাকেন,—"সন্তান হইলেও এ অতি বিপন্ন; বিপন্নের সহায় হইলে পুণ্যসঞ্চয় হয়,—সুতরাং আমারও পুণ্যসঞ্চয় হইতেছে!"—এই অতি-পুণ্যের কার্য্যেও, এক লহমার জন্য মাতার মনে হয় না যে, তিনি পুণ্য করিতেছেন। এই সন্তান অতি দুর্ব্বৃত্ত হইলেও মাতা কখন এমনও ভাবেন না যে, এখন ইহার বিপদকাল, অতএব ইহার সেবা করি। কর্ত্তব্য-চিন্তা কিংবা কোনরূপ চিন্তা, তাঁহার মনেই আসে না।—এই খানেই পুণ্যে পুণ্যজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থাই পুণ্যের অতীত অবস্থা। মাতার হৃদয় ছাড়িয়া এ অবস্থা আর বড় দেখা যায় না।—'আর বড় কি?' এ বিশ্ব-

সংসার খুঁজিয়াও তো আর দেখিতে পাই না! বলিবে,—সহধর্ম্মিণী? না, অন্য অনেক গুণে তিনি আদর্শস্থানীয়া হইলেও এখানে তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হয়। এ যে প্রকৃতি-দত্ত আঁতের টান। বত্রিশ বন্ধনের এ মানব-দেহ ধারণ করিয়া, এক মা ছাড়া, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন কে আছেন,—যিনি এ আদর্শে উপনীত হইতে পারেন? তাই বলিতেছিলাম, মাতার হৃদয় ছাড়িয়া, এ অবস্থা আর দেখিতে পাই না। ভাবিলে মানুষকে অবাক্ হইতে হয়। স্বর্গ যদি থাকে, তবে তাহা এইখানে। মানুষের যে স্বর্গজ্ঞান, তাহা এই হৃদয় দেখিয়া। কোন অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট বস্তুর কল্পনা যে আমরা করি, অগ্রে আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহার ছায়াও দেখিয়া লই। এই জীবন্ত সাকার দেবতা—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী,—মা-আনন্দময়ী-প্রতিমা আমার গৃহে,—ভক্তি থাকিলে, মুক্তি তো আমার করতলগত।

এই কথা মনে রাখিয়া বিচার করিলে দেখি,—মাতৃভক্তি অতি স্বাভাবিক, এবং এই ভক্তি হইতেই মাতৃপূজা বিহিত হয়।

আমাদের একটা চলিত-কথা আছে,—"মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলে ডাইন!" কথাটা বড় খাঁটী। যতবার যত রকমে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছি, ততবারই এই কথার কর্ত্তাকে মনে মনে নমস্কার করিয়াছি। অবশ্য হিন্দুর স্ত্রীও, দেবী স্বরূপা;—স্বামীকে কিরূপ ভক্তি করিতে এবং ভালবাসিতে হয়, তাহা তিনি জানেন,—একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে কথা এই যে, তাঁহাকে নাকি একজন 'পর'কে আপনার করিয়া লইতে হয়; অনেক শিখিয়া পড়িয়া, দেখিয়া শুনিয়া

এবং হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে সেই সকল ভাব অনুভব করিয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে উচ্চ স্তরে উঠিতে হয়; কিন্তু মাতাপুত্রের সম্বন্ধ প্রকৃতি-দত্ত; মাতার নিকট পুত্র আপন অপেক্ষাও আপন;—পরত্ব তাহার ত্রিসীমায়ও নাই;—সে সম্বন্ধ হাড়ে হাড়ে—রক্তে রক্তে—মজ্জায় মজ্জায় নিহিত। সুতরাং এ ভালবাসার কথা একজনকে শিখাইয়া দিতে হয় না, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উদ্রিক্ত করিতে অন্যকে উপদেশ দিতেও হয় না,—এবং এ ভালবাসা অন্যের দেখিয়া-শেখাও নহে!

এই সেদিনের কথা,—সেই শ্রীক্ষেত্রের-ফেরৎ সাগর-যাত্রীদের কথা, বোধ করি, অনেকেরই স্মরণ আছে। মনে পড়ে কি?—গভীর জলে হাবু-ডুবু খাইয়া, সকলেই আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া মরিয়াছিল! কিন্তু সে অপরূপ করুণ-দৃশ্যের কথা মনে হয় কি!—সন্তান ডুবিয়াছে, মাতাও ডুবিয়াছেন,—কিন্তু মায়ের বুকের ভিতর ঐ সাগর-ছেঁচা ধন, ঐ অমূল্য রতন,—ঐ প্রাণের প্রাণ বস্তুটি কি, বলো দেখি?—মাও ডুবিয়াছেন, ছেলেও ডুবিয়াছে,—কিন্তু মরিতে বসিয়াও মহাদেবী পুত্রস্নেহে আত্মহারা!—দুই হাতে দৃঢ় বাহুপাশে, সন্তানকে আগুলিয়া আছেন! বুঝি তখনও মায়ের মনে হইতেছিল,—"নিজে মরিয়াও যদি বাছাকে রাখিয়া যাইতে পারি!"—এমন মায়ের প্রতি ভক্তি, কি বুঝাইবার বস্তু?—না বলিবার কথা? স্বর্গ আর কোথায়?—স্বর্গ এই মাতৃ-হৃদয়ে! এমন সবটা মনপ্রাণ দিয়া, ভালবাসিতে আর কে পারে? এ তো কর্ত্তব্যের দায় নহে,—এ যে আঁতের টান!

সংসারে, যাঁহারা যথার্থ বড়লোক, তাঁহারা সকলেই মাতৃভক্ত,

অথবা মাতৃভক্ত বলিয়াই তাঁহারা বড়লোক। মাতাকে বা পিতাকে যে না ভক্তি করে,—তাহার সহস্র বিদ্যা-বুদ্ধি-খ্যাতি-মান থাকুক,—প্রকৃত মানুষের কাছে, সে, নগণ্য অধম। যাহার পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি নাই,—ঈশ্বরে ভক্তি বা মনুষ্যে প্রীতিও সে করিতে পারে না। যিনি যথার্থ বড়লোক, তিনি পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ; সুতরাং ধার্ম্মিক। অগ্রে মাতা-পিতাকে ভক্তি করিতে না শিখিলে, কিছুতেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

যে কোন ভালো কাজ,—গৃহেই প্রথম আরম্ভ করিতে হয়। এই আরম্ভের পরিণতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। গৃহ ছাড়িয়া যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুকের মধ্যে রাখিব মনে করিয়াছি,—দেখিয়াছি, ভিত্তিস্থান পাকা হয় নাই। মাতা-পিতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হৃদয়ে অপরাজিতা ভক্তি লইয়া, চলিতে হইবে ;—তবেই সে পরম দেবতার সিংহাসন মস্তক-স্পর্শ করিতে পারে। মাতা-পিতাকে মূর্ত্তিমান্ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি পূজা করিতে করিতেই, পরম দেবতা ভগবানের প্রতি প্রাণ টানিতে থাকে। যিনি অধিক ভাগ্যবান্ ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, তাঁহাকে আর স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে খুঁজিতে হয় না,—একমাত্র মাতৃ-চরণে, হৃদয়-পারিজাত উৎসর্গ করিলেই, তাঁহার মুক্তি হয়। এরূপ সুসন্তান, ইহ সংসারে অতি বিরল। এরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ লীলাচ্ছলে কচিৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। মাতা-পিতার চরণ-পূজা ভিন্ন, তাঁহার আর অন্য যোগ নাই, তপস্যা নাই, ধ্যান-ধারণাও নাই ;—অন্য দেবতা তিনি জানেনই না।

মহাভারতের সেই ধর্ম্ম-ব্যাধের কথা স্মরণ করো।—সেরূপ পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত সুসন্তানের মাতৃ-পিতৃ-পূজাতেই মুক্তি হইবেনা কি ?

পাণ্ডবের মাতৃভক্তিও পৃথিবীর আদর্শ। হিন্দু-সন্তান মাত্রেই মহাভারতের অমৃতময়ী কথা, কিছু কিছু জানেন; সুতরাং পাণ্ডব-গণের মাতৃভক্তির বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে কর্ণধার স্বরূপ থাকায় যে, পাণ্ডবেরা অনন্ত বিপদ-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?—কিন্তু মাতৃ-ভক্তির যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে, তবে এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে,—"হাঁ, পাণ্ডব, হরিপদে মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদি কুন্তীর মতো মাতা না থাকিতেন এবং সেই মাতৃ-পদে যদি পাণ্ডবের ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিত, তবে বুঝি, পাণ্ডবও উদ্দেশ্য-সাধনে বিফল-মনোরথ হইতেন;—পাণ্ডবেরও ধর্ম্ম-জীবন বুঝি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত!"

বস্তুতঃ, এই মাতৃভক্তিই পাণ্ডবের অন্যতম প্রধান সহায় বা ব্রহ্মাস্ত্র-বিশেষ। এই মাতৃভক্তিরূপ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে, জীবনের শত-সহস্র বিপদেও তাঁহারা অচল—অটলভাবে দাঁড়াইয়াছি-লেন; এবং যথাসময়ে একে একে সেই সমস্ত বিষম বিঘ্ন-বাধায় উত্তীর্ণ ও সমস্যাপূর্ণ মহা পরীক্ষায় জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। যখন অধর্ম্ম-পরায়ণ কৌরব-কর্ত্তৃক, ধর্ম্মপ্রিয় পঞ্চপাণ্ডব স-মাতা বারণাবতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন এক মা ভিন্ন, পাণ্ডব আর কাহাকে জানিতেন? পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে মাতৃভক্ত বৃকোদর জননীকে ও সেই সঙ্গে সেই ছোট ভাই ক'টিকেও স্কন্ধে লইয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেন। তেজস্বিনী, আর্য্যরমণী, কুন্তীর ন্যায় মাতা পাইয়াছিলেন এবং সেই মাতৃপদে অচলা ভক্তি ছিল বলিয়াই বুঝি, জতুগৃহদাহ

প্রভৃতি বিপদে, পাণ্ডব পরিত্রাণ পান। তখন এক মাতা ভিন্ন তাঁহারা আর সংসারের কিছুই জানিতেন না। মাতৃপদ-ধ্যান ও মাতৃ-পূজায়, পাণ্ডব, জীবন অতিবাহিত করিতেন। তার পর সেই একচক্রানগরীতে, সেই ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণের বাটীতে পাণ্ডবের আতিথ্যগ্রহণের কথা মনে করো। বকাসুরের দারুণ-দৌরাত্ম্যে ও তাহার সেই ভীষণ নিয়ম পালন জন্য, সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীর সেই পাষাণভেদী করুণ-বিলাপের কথা ভাবিয়া দেখ! সে সময় কুন্তীর সেই অলৌকিক মহত্ত্বের কথা মনে পড়ে কি?—নিজ পুত্রের প্রাণ দিয়াও তিনি ব্রাহ্মণ-পুত্রের জীবন রক্ষা করিবেন,—প্রতিজ্ঞা করিলেন। মাতৃভক্ত সন্তানও অম্লানবদনে মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। পরন্তু মাতৃ-মাহাত্ম্য বলে, অবশেষে সেই মহাবাহু ভীমসেন, বকাসুরেরই প্রাণসংহার করিলেন। এখানে আর্য্য-রমণীর মহত্বে, ধর্ম্মপুত্র-কেও শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল। কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এখানে এই সকল কথার উল্লেখ করিতেছি। সুমাতা কুন্তীর উপদেশে যুধিষ্ঠির বুঝিয়াছিলেন যে, মায়ের কথাই সার বটে।—আশ্রয়দাতার উপকারার্থ,—অবস্থা-বিশেষে, নিজ পুত্রেরও প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়। যাইহোক, শেষে মাতৃভক্ত ভীমসেনের অদ্ভুত মাতৃভক্তি-বলে বকাসুর নিহত হইল, একচক্রাবাসিবর্গের দারুণ উৎকণ্ঠাও দূর হইল। মহাকবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,—সুমাতা ও সুসন্তানের অপূর্ব্ব চিত্র দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন।

তারপর, পাণ্ডবের সেই দ্রৌপদী-লাভের কথা মনে করো দেখি!—উপন্যাস বলো, কবি-কল্পনা বলো, গল্প বলো,—পঞ্চম বেদকে যাহা ইচ্ছা সম্ভাষণ করো,—কিন্তু এ অপরূপ-চিত্র, পৃথিবীর

আর কোন্ কবি,—কোন্ ইতিবৃত্ত-লেখক কাব্যে বা ইতিহাসে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? দ্রুপদ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া, পাণ্ডব মাতৃসকাশে উপনীত হইলেন; মাতা অনুমতি করিলেন,—'জয়যুক্ত বস্তুকে তোমরা পাঁচ-ভাই সমান অংশ করিয়া লও।' মাতা আজ্ঞা করিয়াছেন,—শাস্ত্র, নীতি, সমাজ, লোকাচার,—অতলজলে নিমজ্জিত হউক,—সে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। সুতরাং দ্রুপদতনয়া কৃষ্ণা,—পঞ্চপাণ্ডবেরই মহিষী হইলেন। * মায়ের একটা কথা-রক্ষার জন্য, যে দেশের লোক, আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, একমাত্র স্ত্রীকে পাঁচ ভায়ে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশের মাতৃভক্তির পরিচয় আর কি দিব?—পাণ্ডবের মাতৃভক্তি জগতের আদর্শ।

পক্ষান্তরে, কুন্তী ও গান্ধারীর সেই শিব-পূজার কথা মনে পড়ে কি? পূর্ব্ব হইতে প্রকাশ ছিল,—একশত আটটি সুবর্ণ-বিল্বপত্রে যে দেবাদিদেবকে পূজা করিতে পারিবে, আশুতোষ তাহারই প্রতি প্রসন্ন হইবেন। এমত অবস্থায় গান্ধারীর পক্ষে ইহা সহজলভ্য—তাঁহার তো কোন বিষয়ের কোন অভাব নাই। সুতরাং গান্ধারী পুত্রগণকে বলিয়া অবিলম্বেই নির্দ্দিষ্টপরিমাণ সুবর্ণ-বিল্বপত্র সংগ্রহ করিলেন।

---

* যদিও ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তথাপি কূট-তর্কের অনুরোধে এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইলাম। অপিচ, বিশ্বাসী হিন্দু জানেন, কৃষ্ণার পঞ্চস্বামী হওয়ার কারণ মহাভারতে সবিস্তার বর্ণিত আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা বর কি অভিশাপ, তাহা যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে ভারত পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারাই জানেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সে সকল রহস্যই প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রমণী স্বভাবসুলভ গর্ব্বে গান্ধারী তখন গর্ব্বিতা হইলেন। দুঃখিনী কুন্তী মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রগণ একে একে সকলেই মায়ের এই কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কুন্তী অর্জ্জুনকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। সুমাতা অন্তর্য্যামিণী সদৃশী,— কোন্ পুত্র দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারেন; তাই কুন্তী কেবলমাত্র অর্জ্জুনকে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন অর্জ্জুন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মা! এজন্য আর চিন্তা কি?—তোমার অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে, জানিও।" যথাসময়ে সেই ধনুর্দ্ধারী তৃতীয় পাণ্ডব, শিব-মন্দিরে উপনীত হইয়া, তথা হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে, কুবের-ভাণ্ডারে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই লক্ষ্যগুণে অল্পক্ষণ মধ্যেই মণিকাঞ্চনে সেই মন্দির ভরিয়া গেল;—সুবর্ণ-বিল্বপত্রে শিবলিঙ্গ ঢাকিয়া পড়িল, দর্পহারী ত্রিলোচন,—গান্ধারীর সকল দর্প চূর্ণ করিলেন। কুবের-ভাণ্ডার হইতে ধন জয় করিয়া, মহারথ অর্জ্জুন 'ধনঞ্জয়' নাম প্রাপ্ত হইলেন। আশাতীত মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হইল দেখিয়া, কুন্তীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী কবি, এইরূপে ইহসংসারে মাতৃভক্তিরই জয় দেখাইলেন।

আবার অন্যদিকে, সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের প্রভাবও বড় কম কথা নহে। দুর্য্যোধনের অঙ্গে গান্ধারীর সেই পদ্মহস্ত-সঞ্চালনের কথা একবার স্মরণ করো—এক উরুদেশ ভিন্ন, দুর্য্যোধনের আর সর্ব্বাঙ্গ পাষাণময় হইয়াছিল! তবে অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের অভি-সম্পাত অবশ্যই ফলিবে নাকি,—তাই হতভাগ্য পুত্র, চক্রীর চক্রে পড়িয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া, মাতা গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ

করিল। গান্ধারী পুত্রকে বিজয়ী করিবার মানসে, কেবলমাত্র আপন পদ্মহস্ত সঞ্চালনেই, দুর্য্যোধনের সেই অনাবৃত সমস্ত অঙ্গ পাষাণবৎ করিয়া দিলেন,—কেবল চক্রীর চক্রে, হতভাগ্যের সেই আবৃত স্থানটুকু সহজ স্বাভাবিক মাংসপিণ্ড অবস্থায় রহিল।—মহাকবি দেখাইলেন যে, পুত্রের প্রতি মায়ের আশীর্ব্বাদ-বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে;—আর মাতৃ-স্নেহও বড় একটা সাধারণ জিনিস নয়!

একটা চলিত প্রবাদ আছে যে, মুমূর্ষু-পুত্র মাতৃক্রোড়ে থাকিলে, মহাকাল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কথাটার আর কোন মূল্য না থাক্,—ইহাতে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, মাতার স্নেহাশীর্ব্বাদে, সন্তান ইহ-সংসারে অমরের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে। প্রকৃত ভালবাসা এমনই জিনিস বটে। তাই কবি, আদর্শটাকে আর একটু উঁচাইয়া সেই জগৎ পূজ্যা আদর্শ-সতী সাবিত্রীর ক্রোড়ে সত্যবানের মৃত-দেহ রাখিয়া মহাকালকে তাহা স্পর্শ করিতে দেন নাই। এরূপ স্পর্শ করিতে না দিয়া, পতিপ্রাণা পুণ্যবতী আর্য্যসতীর মাহাত্ম্য জগতকে শিক্ষা দিলেন। বুঝাইলেন যে ইহার প্রভাবে প্রকৃতির নিয়মেরও বিপর্য্যয় ঘটে। যদিও এখানে এ উপমাটি ঠিক খাটে না,—একটি মাতা পুত্র সম্বন্ধ,—অন্যটি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ;—তথাপি এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে, মূলে একই কারণ বর্ত্তমান।—একটি স্নেহের প্রভাব, অন্যটি সতীর প্রেমের পরাক্রম।—কেবল পাত্র ও অধিকারিভেদে, একই বস্তু দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই ভালবাসার মূলে ভক্তি ও প্রীতি বিশিষ্টরূপে নিহিত। এই মূল বস্তুটি নিম্নগামী হইলেই ভালবাসা—ভালবাসা হয়, আর ঊর্দ্ধগামী হইলেই তাহা ভক্তি, প্রীতি ও প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহাকবি বাল্মীকিও সেই সতী-প্রতিমা সীতা এবং তাঁহার লব-কুশ পুত্রদ্বয়ের চরিত্রে, এই ভালবাসা ও ভক্তির চিত্র উজ্জ্বল-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তৎ-পদানুসরণকারী কবি কীর্ত্তিবাস,—এই ঔজ্জ্বল্যের উপর আরও রং চড়াইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়, যজ্ঞীয় অশ্বকে বন্ধন পূর্ব্বক, দুধের-ছেলে লব-কুশ, দুর্জ্জয় রাঘব-সৈন্যকেও পরাভূত করিয়াছিল। এবং অবশেষে অশেষ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন খুল্লতাত-ত্রয় এবং পিতাকেও সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মাতৃভক্ত পুত্রদ্বয়ের, মায়ের পদধূলিই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ, অথবা সেই মাতৃপদ-ধ্যানই তাহাদের বিজয়ী হইবার এক মাত্র কারণ। আদর্শ জননী পুত্রদ্বয়ের শরীরে অস্ত্রলেখা দেখিয়া, স্বহস্তে তাহাদের বক্ষে "রক্ষা-কবচ" সংরক্ষিত করিয়াছিলেন,—বুঝি বজ্র অপেক্ষাও সে কবচ কঠিন,—তাই সতী-পুত্রদ্বয়, সেই বিষম পিতৃ-সমরেও জয়যুক্ত হইতে পারিয়াছিল। কবি দেখাইলেন, মাতৃভক্তের প্রভাব কিরূপ অলৌকিক, এবং সন্তানের প্রতি মাতার আশীর্ব্বাদও কিরূপ কার্য্যকর।

সুমাতার আদর্শে, সুসন্তান, আদর্শের চরম-সীমায় উপনীত হইতে পারেন। মাতার চরিত্রে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। মাতার শিক্ষায় সন্তান সুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তাই সংসারে সুমাতার গৌরব ও মাহাত্ম্য এত অধিক; তাই সুসন্তান, মাতৃভক্তিবলে, অসাধ্য সাধনেও সমর্থ হয়। পৃথিবীর ইতি-হাস স্বর্ণাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীর যত বড়-লোকের জীবন-আলোচনা করিয়া দেখ,—দেখিতে পাইবে,—প্রায় সকল বড় লোকই মাতৃভক্ত অথবা মাতৃভক্ত, বলিয়াই

তাঁহারা বড়লোক। অধিকন্তু তাঁহাদের প্রায় সকল জননীই সুমাতা।

মাতার শিক্ষা সন্তানের কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য-পণ্ডিত স্মাইল্স সাহেব তৎপ্রণীত "চরিত্র" নামক গ্রন্থে, "হোম" নামক অধ্যায়ে, বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সন্তান বাল্যকালে অধিক সময় মাতার নিকট থাকে, সুতরাং মাতার প্রায় সকল কার্য্যেরই অনুকরণ করে। মাতার নিকট দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা,—সন্তান এ সমস্তই শিক্ষা পায়। সুতরাং জননীরও সুমাতা হওয়া আবশ্যক। ইংরেজীতে "মহৎ লোকের জননী" নামে যে একখানি পুস্তক আছে, তাহাতে, সুমাতা হইতে হইলে কি কি গুণের প্রয়োজন, তাহা অতি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। এবং সন্তান জননীর নিকট কতদূর শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জনৈক সুবিখ্যাত ইংরেজ জীবনী-লেখকও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"এটা খুব খাঁটী সত্য যে, গুণবান্ পুত্রের জননীও গুণবতী"। বস্তুতঃ, সকল দেশের সকল মহৎ লোকই মাতৃমাহাত্ম্যের পোষকতা করিয়া থাকেন। স্ত্রী-জাতি দ্বারা রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, ইলিয়াদ, হাম্লেট, প্যারাডাইস্ লষ্ট প্রভৃতি লিখিত হয় নাই সত্য;—স্ত্রীজাতি জেনাফনের ন্যায় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া, শত্রুর দেশ হইতে অজানিত পথে, নির্ব্বিবাদে, স্বদেশে আসিতে সমর্থ হন নাই সত্য;—রমণী সেই স্বদেশভক্ত বীরকেশরী রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় স্বদেশউদ্ধারে ব্রতী হইয়া আজীবন "মন্ত্রের সাধন" করেন নাই সত্য;—কিংবা শত-সহস্র বাধা ও নিরাশার সম্মুখীন হইয়া, মহাবীর নেপোলিয়নের মত আল্পস্

পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতেও পারেন নাই বটে,—কিন্তু এই মাতৃস্বরূপা স্ত্রী জাতির বা সুমাতার পদতলে বসিয়া,—একদিন সেই বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, হোমার, সেক্‌সপিয়র, মিলটন, জেনাফন, প্রতাপ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি পুরুষসিংহ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সেই ভীষ্ম, ভীমার্জ্জুন, রাম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি তেজস্বী বীরগণ একদিন এই মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার চরণে শরণ লইয়াই জগতে আপনাদের মহৎ চরিত্রের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এই মাতা বা মাতৃস্বরূপা স্ত্রীজাতির নিকট একদিন ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া,—বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি,—আজি কোটী কোটী হৃদয়ের অধীশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। পুত্র, জননীর নিকট হইতে সহিষ্ণুতা, সংযম, বাধা ও বিঘ্নের সহিত অবিচলিত-চিত্তে সংগ্রাম, ঈশ্বরে ভক্তি, সর্ব্বজীবে প্রীতি প্রভৃতি মহৎ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। এই মাতার দৃষ্টান্তে কন্যাও জীবন এবং চরিত্রের গঠন করিয়া থাকে। জগৎপূজ্যা আর্য্যরমণী,—একদিন এই মাতা বা মাতৃস্বরূপিণী পালনকর্ত্রীর নিকট চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই,—আজ পতি-ভক্তি ও পতিপ্রেম-প্রভাবে জগৎপূজ্যা হইয়া আছেন। এই জন্যই হিন্দুর শাস্ত্র কহিতেছেন যে, জননী আদিগুরু ও মহাগুরু। এই গুরু-কল্পতরুর পাদ-মূলে সন্তানের সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। সুতরাং মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তিও না হইবে কেন?

আমাদের দেশে একটা চলিত-কথা আছে,—"কু-পুত্র যদিচ হয়, কু-মাতা কখন নয়!"—কথাটা বড়ই খাঁটী। সন্তান, কু-সন্তান হইতে পারে বটে, কিন্তু মাতা, কিছুতেই কু-মাতা হইতে পারেন

না। অর্থাৎ পুত্র যতই কেন অসৎ, কদাচারী, দুর্ম্মতি-পরায়ণ হউক না,—তাহার প্রতি মাতার স্নেহ সমভাবেই থাকে। বুঝি, দয়ার ভাগটা আর একটু বেশীও থাকে।—"রাম, হরি, ওরা তো মানুষের-মত হইয়াছে,—কিন্তু এ ভূতো অভাগার আর কোন উপায় নাই"—এমন কথা অনেক মায়ের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। মায়ের সেই স্বাভাবিক স্নেহের সহিত দয়ার আধিক্য হওয়ায় অন্য দুই পুত্র—রাম হরি অপেক্ষা,—জননী বুঝি, ভূতকেই অধিক কৃপাচক্ষে দেখেন। তিনের প্রতি স্নেহ সমানই থাকে,—তবে অকৃতী, অধম, অসহায় বলিয়া, ঐ ভূতোর প্রতি মায়ের দয়া বুঝি বেশী হয়। হিন্দুর সংসারে, এ দৃশ্য বিরল নহে'।

"যার কেউ নাই, তার মা আছে"—অনেক দুঃখেও এ বড় সুখের সান্ত্বনা! এমন সান্ত্বনা বুঝি, আর কিছুতেই মিলে না। জীবনের তৃপ্তি তো অনেক রকমে হয়, কিন্তু মাতৃস্নেহের ন্যায় তৃপ্তি কি সন্তান আর কিছুতে পাইতে পারে? হিন্দুর সংসারে, পুত্রের আহার করিবার সময়ে, মাতার এই স্বর্গীয় স্নেহ বড়ই সুন্দররূপে বিকশিত হইয়া থাকে;—"বাবা! ও ক'টি ভাত খা, এই মাছটুকু খা,—খা না বাবা,—খা না;—তোর্ পেটের আঁত যে এখনও উঠে নাই, আমার মাথা খাস্, আর দুটি খা"—মায়ের এ সময়কার এই স্নেহ-দৃষ্টিটি কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?—সেই স্নেহের সহিত ঈষৎ কাতরতা,—সেই পুত্রের আহারে নিজের আহার বোধ,—সেই একবার পুত্রের মুখের পানে, আর বার সেই অন্নব্যঞ্জনের প্রতি সঘন সস্নেহ দৃষ্টি,—মায়ের সেই আন্তরিকতা পূর্ণ করুণাময়ী মূর্ত্তি কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?—যেন সাক্ষাৎ

করুণাধার মা-অন্নপূর্ণা তখন ধরাধামে অবতীর্ণা!—সেই মা-জননী অন্নপূর্ণাই যেন তখন স্বহস্তে সন্তানকে খাওয়াইতেছেন!

মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি যে অতি স্বাভাবিক, তাহা আর না বলিলেও চলে। অতি নিষ্ঠুরহৃদয় হইলেও, সে, মাতার প্রতি ভক্তি করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে।

মাতৃভক্তি সৎকার্য্যের প্রধান সহায়। মাতার চরণ-চিন্তা,—অনেক পাপ-কার্য্যের অন্তরায়। নিজের জীবনে দেখিয়াছি, যখন অন্তরে পাপের আবির্ভাব হয়, কিংবা সেই পাপ-কার্য্যসাধনে মন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন আমার প্রত্যক্ষ দেবতা মাতার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হই;—সেই মাতৃ-পদ চিন্তা-রূপ পুণ্যের আগুনে, আমার পাপ চিন্তা পুড়িয়া থাক্ হইয়া যায়।

সংসারে মাতৃভক্তি বা মাতৃপূজা অনেক পুণ্যের কাজ। সুমাতা লাভ করা আরও জোর-কপালের কথা। "যার মা নাই, বুঝি তার কেউ নাই"—এ বড় খঁটি কথা!—এ যে কি কথা, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি,—অপরকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। অপ্রত্যক্ষ দেবতার জ্ঞান আমাদের কতটুকু?—তাহাও কি এই প্রত্যক্ষ সাকারদেবতা জননীকে দেখিয়া নয়? এই মাতৃ-ভক্তি হইতেই ভগবানের প্রতি প্রাণ টানিতে থাকে। কিন্তু সবার মূলেই আমার সেই স্নেহের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, পরম পুণ্যময়ী জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা-জননী।

মহাবীর নেপোলিয়ান একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি যদি কোনরূপে ভালো এবং মহৎ হইয়া থাকি, সে কেবল আমার মাতার শিক্ষকতায়।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। শৈশবে সেই মহৎ-হৃদয় ম্যাট-সিনী, এক বৃদ্ধ অন্ধকে দেখিয়া, করুণ হৃদয়ে, মাতার নিকট

হইতে পয়সা চাহিয়া, অন্ধকে দিয়াছিলেন; মাতা তখন হইতেই সন্তানের চরিত্র আরও উজ্জ্বল করিয়া দিতে থাকেন, তাহারই ফলে একদিন সেই স্বদেশ-প্রেমিক বীর,—স্বদেশের দুর্গতি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া সেই মত কার্য্য করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধ্রুব যে হরিপদে স্মরণ লইয়া, ধ্রুব-লোক পাইয়াছিলেন, তাহাও এই মায়ের করুণায়। মাতা সুনীতিই শিক্ষা দেন,—"হরি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই;—হরিকে ডাকো, তিনিই কূল দিবেন।" মায়ের এই অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন বলিয়াই না ধ্রুব, ধ্রুব-লোক প্রাপ্ত হন? আর সেই ধ্রুবের মাতৃভক্তিই বা কি অপূর্ব্ব!—হরিভক্তি-প্রভাবে ধ্রুব, যেমন ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, মাতৃভক্তিতেও ধ্রুবের সেইরূপ অপূর্ব্বত্ব ছিল। সেই অরণ্যে মুনিবালকদিগের সহিত খেলাইয়া, বন্যফল লইয়া ধ্রুব কুটীরে আসিত; মাতৃপদে প্রণাম করিয়া সোণার চাঁদ শিশু সেই বন-ফল জননীকে দিত,—রাজমহিষী সুনীতি চোকের জলে বুক ভাসাইয়া ধ্রুবকে কোলে লইয়া, মুখচুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেন;—আর মনে মনে কহিতেন,—"বাপ আমার! তোমা হ'তে যেন সুখী হই!"

বালক সিন্ধুরও বিশিষ্ট পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি পুরাণে দেখিতে পাই। অন্ধ ও বৃদ্ধ জনকজননীকে সেবা-শুশ্রূষা করাই সিন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল। সেই অন্ধের-নড়ী—বালক সিন্ধুই বন-ফল ও স্নিগ্ধ-জল আনিয়া ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট পিতামাতার প্রাণরক্ষা করিত। আর এই পিতামাতার সেবা করিতে গিয়াই, সেই মৃগয়াবেশী অযোধ্যারাজ দশরথের নিশীথশর—শব্দভেদী বাণে, ভক্ত-পুত্রকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বিনতা-পুত্র গরুড়ও পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। সর্প-জননী কদ্রুর সহিত পণ রাখিয়া, বিনতা ঘটনা-চক্রে পরাভূত হন। শেষে নিজ অঙ্গীকার অনুসারে কদ্রুর দাসী হইয়া তিনি মনোদুঃখে কালযাপন করেন। কিন্তু পুত্র গরুড় অসাধারণ উপায়ে, মাতার দুর্জ্জয়-পণের প্রতিরোধ করেন। ভক্ত পুত্রের কল্যাণে বিনতা আবার স্বাধীনা হন।

পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে, সংসারে—ভক্ত-পুত্রের এমন সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

মাতা অসহিষ্ণু, প্রগল্‌ভা বা অপ্রিয়বাদিনী হইলেও, ভক্ত-সন্তান, আপন লক্ষ্য-পথ হইতে বিচ্যুত হন না। মাতাকে সন্তুষ্ট করিতে তিনি প্রাণপাতও করিয়া থাকেন। মাতা সৎ হউন আর অসৎ হউন, পুত্রের কিন্তু কোনমতে মাতৃভক্তি হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মাসিডনাধিপতি সেই মহাবীর আলেকজাণ্ডার-দি-গ্রেটের কথা মনে করো; তাঁহার মাতা এইরূপ সদা-অসন্তুষ্টা, অপ্রিয়বাদিনী ও অসহিষ্ণু ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের এত পদ-সম্ভ্রম এবং ধন-সম্পত্তিতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এক সময়ে মাসিডনাধিপতি স্থানান্তরে ছিলেন; তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাঁহার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ আণ্টিপেটার রাজ্য পরিদর্শন করেন। আলেকজাণ্ডার-জননী প্রতিনিয়তই আণ্টিপেটারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে থাকেন। তাহাতে আণ্টিপেটার বিরক্ত হইয়া প্রভুকে পত্র লিখেন যে, রাজমাতার জন্য তিনি সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। তাহার উত্তরস্বরূপ মাতৃভক্ত আলেকজাণ্ডার এইমাত্র বলিয়াছিলেন,—"আণ্টিপেটার জানেন না যে, মায়-আমার এক ফোঁটা চোখের

জলে, তাঁহার এরূপ শতসহস্র পত্রও মুছিয়া যাইতে পারে!” অতএব দেখা গেল, মাতৃভক্তি সর্ব্বত্রই আছে; তবে হিন্দুর দেশে মাতৃপূজার ব্যবস্থা কিছু অপূর্ব্ব। হিন্দু যে ভক্তিপ্রধান জাতি।

এ অবধি আমরা যতগুলি পিতৃ-মাতৃ-ভক্তের নামোল্লেখ করিয়াছি,—প্রায় সকলেই ভক্তির চরমপথে উপনীত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল, আমরা কেহই দেখিতে যাই নাই। তবে পুরাণ-ইতিহাস আলোচনায় এবং আত্মবিশ্বাসে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, মুক্তি অর্থে যদি “লয়” বা ব্রহ্মে লীন হওন হয়, তবে সে পরম নির্ব্বাণ-পদও কোন কোন মাতৃভক্ত মহাত্মা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর মুক্তি অর্থে যদি স্বর্গলোক, অনন্ত বৈকুণ্ঠ বা তদপেক্ষাও কোন উচ্চস্থান হয়, তবে তাহাও অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

মহাভারতের যক্ষ ও যুধিষ্ঠির-সংবাদের সেই কথা মনে পড়ে কি? যক্ষ কহিলেন, “পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কি?” ধর্ম্মপুত্র উত্তর দিলেন, “মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর।” মহাকবি, এই একটিমাত্র কথায়, মাতা-পিতার কি উচ্চাসনই দিয়া গিয়াছেন!

যুধিষ্ঠিরের মাতৃভক্তিও বড় উচ্চ। মাতা ও বিমাতা তাঁহার নিকট দুই-ই সমান। যখন যক্ষ বলিল, “তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে একটিকে ইচ্ছা করো, তিনি জীবিত হউন;” যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলেন। যক্ষ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, “ভীমার্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে বিমাতৃপুত্র নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ?” যুধিষ্ঠির কহিলেন,—“ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট করেন এবং রক্ষিত হইলেই রক্ষা করিয়া

থাকেন। * * * আমার পিতার কুন্তী ও মাদ্রী দুই ভার্য্যা; ইহাঁরা উভয়েই পুত্রবতী থাকেন, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রেত। আমার পক্ষে কুন্তী যাদৃশী, মাদ্রীও তাদৃশী; তাঁহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই; আমি মাতৃদ্বয়ের প্রতি সমান ভাব ইচ্ছা করি; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন।" *

এরূপ উচ্চজ্ঞান ও ভক্তি-তত্ত্ব পূর্ণ কথা,—ধর্ম্মপুত্রের মুখেই শোভা পায় বটে। একাধারে ভক্তিজ্ঞানের এরূপ অপরূপ চিত্র অতি অল্পই দেখিতে পাই।

—"মাতা সকল অবস্থাতেই পুত্রের পূজনীয়া। আবার যখন তিনি পতিহীনা হন, তখন তাঁহাতেই পিতা রহিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকেই পিতৃপূজা ও মাতৃপূজা উভয় পূজাই দিতে হয়। মাতা বিধবা হইলে তাঁহাকে অধিকতর পূজা করিও; তিনি যেন বুঝিতে না পারেন, যে তাঁহার সমস্ত সৌভাগ্য চলিয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, পিতামাতার যত সেবা করো না কেন, সহস্রবর্ষেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।" কথাটি অতি সত্য।

আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সাধ্যানুসারে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভক্তি কি এবং মাতৃভক্তিই বা কি বস্তু, এবং তাহার ফলই বা কি। এক্ষণে বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এই মাতৃভক্তি কেবলমাত্র কবি-কল্পনা বা ঔপন্যাসিক চিত্র নহে;—পরন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত জীবন্ত সত্য।

একটি সুন্দর পৌরাণিক-কিংবদন্তী আছে। এক দিন পার্ব্বতী, কুমার কার্ত্তিকেয় ও গজাননকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে

* বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ মহাভারত।

বলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—"তোমরা দু'ভায়েই পৃথিবী ভ্রমণ করিতে যাও; দেখি, কে অগ্রে ফিরিতে পারো।" কথা শুনিয়া কার্ত্তিক "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার ময়ূরে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে চলিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, "আমি তো এলেম ব'লে; দাদা আর ইঁদুরে চ'ড়ে কতদূরই বা যাবেন!" কিন্তু গজানন কোথাও না গিয়া, কেবল ভক্তিভরে সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী জগদম্বাকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া, সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণামানন্তর উপবেশন করিলেন। যথাসময়ে কুমার কার্ত্তিকেয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অগ্রজকে মাতৃসকাশে উপস্থিত দেখিয়া, সাগ্রহে কহিলেন,—"একি মা! দাদা যে এখানে বসিয়া আছেন?—আমি তো মা! তোমার আদেশ পালন করিলাম।" ভগবতী একটু হাসিয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমার সাধের ময়ূর আছে,—তুমি মনে করিলে আর পৃথিবী বেড়াইলে; কিন্তু তোমার দাদা আমার কাছে থাকিয়াই সে কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।"

গল্পটির ভিতর এই শিক্ষা পাওয়া যায়, ভক্তিভরে একমাত্র জননীর পাদপদ্মে দেহ-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিলে, তাহার আর কোথাও যাইতে হয় না,—কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয় না, তাহার অন্য কোন যোগ-যাগ-সাধনাও নাই,—মুক্তি তাহার করতলস্থ।

অদ্বৈত-গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সেই মাতৃভক্তির কথা স্মরণ হয় কি?—মায়া-বাদ-প্রবর্ত্তক সেই ভগবান্ শঙ্কর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সুসিদ্ধ হইয়াও, মাতৃ-পাদ-পদ্ম বিস্মৃত হন নাই,—মাতা বিশিষ্টা দেবীর অন্তিমকালে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং মাতার পদধূলি মস্তকে লইয়া, তাঁহারই ইচ্ছামত প্রথমে "শিবলোক" আহ্বান করিলেন। যোগীশ্বর সাক্ষাৎ-শঙ্করের

আহ্বানমাত্রেই তথায় শিবলোকের আবির্ভাব হইল; জননী শিবলোকে যাইতে ভীতা হইলেন; অদ্বৈত-গুরু যোগবলে তৎক্ষণাৎ "বিষ্ণুলোক" আহ্বান করিলেন; বিষ্ণুলোকেরও আবির্ভাব হইল। রত্নগর্ভা, ভাগ্যবতী জননী পুত্রের কল্যাণেই সেই আনন্দধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন!—আর সেই ভক্ত পুত্র?—ভগবান্ শঙ্কর-চরিত পৃথিবীর আদর্শ।—একাধারে এত জ্ঞান, গবেষণা ও পাণ্ডিত্য লইয়া,—উপনিষদস্থ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ও "সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্" এই অপূর্ব্ব ভাবময়—জ্ঞানময়—যোগময় গভীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, দ্বাত্রিংশ বর্ষে, কেদারেশ্বর তীর্থে যোগবলে দেহ ত্যাগ করেন। বুঝি, শঙ্করের অসাধারণ মাতৃভক্তিই শঙ্করকে এই চরম আদর্শে লইয়া যায়। যখন অদ্বৈতগুরু সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন কি তাঁহাকে কম-সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল!—এক দিকে মাতার পুনঃপুনঃ নিষেধ, অন্যদিকে প্রাণের ঐকান্তিক টান!—শঙ্কর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে কিছুতেই মাতৃ-আজ্ঞা না পাইয়া, শেষে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা মনে হয় কি?—মহাজ্ঞানী শঙ্কর নদী পার হইবার সময় যোগবলে নদীতে বৃহৎ এক মায়া-কুম্ভীর সৃজন করিলেন, এবং সেই ভীষণ জন্তুর ভীষণ মুখে আপন দেহের কিয়দংশ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া জননীকে কহিলেন,—"মা, যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসী হইতে আজ্ঞা দাও, তবে আমি এই ভীষণ কুম্ভীর-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাই; নচেৎ আমার জীবনের আশা ত্যাগ করো!" অগত্যা বিশিষ্টা দেবী, পুত্রকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে আদেশ দিলেন,—অদ্বৈত-গুরুরও আজীবন-সঞ্চিত আশা ফলবতী হইল।

শঙ্কর-জীবনের এই ঘটনায় আমরা এই শিক্ষা পাই, জননী অজ্ঞান হইলেও তাঁহার কথা ঠেলিয়া, তাঁহার মনে কষ্ট দিয়া, কোন বড় কাজ করাও উচিত নয়। বড় কাজ করিতে হইবে, অথচ সে কাজে মায়ের অভিমতি নাই,—তখন ভক্তিবলে মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া, সেই কাজ সম্পন্ন করা বিহিত। শঙ্কর যেমন পরম জ্ঞানী, মহাতত্ত্বদর্শী, সেইরূপ ভক্তিমানও বটেন। মূলে, এই মাতৃভক্তি ছিল বলিয়াই, শঙ্কর, সাক্ষাৎ-শঙ্করজ্ঞানে আজিও দাক্ষিণাত্যাঞ্চলে পূজিত হইতেছেন এবং সেই শঙ্কর-চরিত আজি জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

যতদূর আলেচনা করিলাম, তাহাতে পুনঃ পুনঃ বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছি যে, মাতৃভক্তি অতি অপূর্ব্ব বস্তু এবং ইহার প্রভাবও অতি অপূর্ব্ব।

যে আর অন্য কোন ধর্ম্ম জানে না, কর্ম্ম জানে না, যোগ জানে না, তপস্যা জানে না; তন্ত্র জানে না, মন্ত্র জানে না;—পার্থিব সংসারেরই বা কি, আর পরমার্থ তত্ত্বেরই বা কি,—কোন বিষয়েরই কোন ধার ধারে না,—একমাত্র মাতাকেই চিন্ময়ী, জগদ্ধাত্রী-রূপিণী, মহাদেবী বলিয়া জানে এবং সেইরূপ জানিয়া বিশিষ্টরূপ ভক্তি ও প্রীতিতে মাতৃপূজা ও মাতৃ-উপাসনা করিয়া থাকে, মুক্তি তাহার করতলস্থ। বলিবে, কেন?—সেরূপ লোক কি পাপ করিতে পারে না?—দস্যুও তো নরশোণিত পান করিয়া, মহোল্লাসে মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে;—তবে সেও কি মুক্তি পাইবে?—তদুত্তরে আমার বক্তব্য, দস্যুর কালী-ভক্তির সহিত এই অনাবিল মাতৃভক্তির তুলনাই হইতে পারে না।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মাতৃভক্তি সৎকার্য্যের সহায় এবং

অসৎচিন্তার অন্তরায়। অন্তরের সকল বৃত্তিগুলি যখন এক হইয়া সেই মাতৃস্বরূপা পরম দেবতার পানে অনুধাবিত হয়,—তখনই প্রকৃত ভক্তির আবির্ভাব। এই ভক্তি লইয়াই ভক্তের জীবন পরিপূর্ণ।—অসচ্চিন্তার অবসর কৈ ? তাহার স্থান কোথায় ?

নদীতে কখন বান্ আসিতে দেখিয়াছ ? নদী-হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, অগাধ জলরাশি যখন নদীর দুইটি পার্শ্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—কি দৃশ্য বলো দেখি ! অগাধ জলরাশি তখন উচ্চ নীচ দেখে না, পাহাড় পর্ব্বত মানে না, অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার বলে আপনি চলিয়া যায়। ভক্তিপ্রবণ হৃদয়েরও এই অবস্থা। সেখানে আর নূতন করিয়া বান্ আসে না। হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ভক্তি চারিদিকের বাধা-বিঘ্ন, পাপ-প্রলোভন কিছুই না মানিয়া, আপনার মহালক্ষ্য পথে চলিয়া যায়। ভক্তির লক্ষ্য-পথ—চিদ্‌ঘন সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠধাম। মাতৃভক্ত পুত্র মাতার হৃদয়েই সেই বৈকুণ্ঠ-ধাম অবলোকন করেন।

ভালবাসা

"Love is Heaven and Heaven is Love."

"ভালবাসাই স্বর্গ এবং স্বর্গের নামই ভালবাসা।"—এ বড় উচ্চ, পবিত্র কথা। ভালবাসিতে পারিলে মানুষের দেবত্ব লাভ হয়,—তাহার সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই থাকে না! এই আধি-ব্যাধি-শোক-তাপপূর্ণ ছার মাটীর সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া,—রোগ-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল জীবন লইয়া, মন-মরা হইয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি?—যদি মানুষ হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলাম, তবে বৃথা এ জড়পিণ্ড দেহধারণ কেন? জানি না, এরূপ জীবনের উদ্দেশ্য কি,—এরূপ রুদ্ধ প্রাণের লক্ষ্য কি? যদি একের বিপদে বুক দিতে না পারিলাম, প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ দিতে না শিখিলাম; সংসারের শত সহস্র বিঘ্নবিপত্তি, উপহাস ভ্রূকুটী, হিংসা-দ্বেষ-পরবাদ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ধরিতে চেষ্টা না করিলাম, তবে ধরণীর ভার বৃথা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক কি? এরূপ বিষম দুর্ব্বহ জীবনের প্রয়োজন কি, বুঝি না। ভালবাসা কি, ইহা যে না বুঝিল, না শিখিল, না ভাবিল,

হৃদয়ে না উপলব্ধি করিল, তার মরণই মঙ্গল। প্রাণ দিয়া ভাল ভাসিয়া মরিয়া যাও ;—আমি তোমার সেই পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া তোমার অমর আত্মার পূজা করিব ; তথাপি আমি তোমার ঐ অপ্রশস্ত, অনুদার স্বার্থমলিনতা পূর্ণ নীরস প্রাণ লইয়া পৃথিবীতে থাকিতে পরামর্শ দিই না।

তুমি বলিবে, "আমি জগতের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করি, জগৎ আমাকে তাহা প্রদান করে না ;—আমি মানুষকে যে চক্ষে দেখি, মানুষ আমায় সে ভাবে দেখে না ;—আমি যাহাকে ভালবাসি, সে তো আমায় ভালবাসে না,—তবে আমি আত্মত্যাগ করিব কেন? প্রাণের প্রশস্ততা বাড়াইব কেন?—মানুষকে ভালবাসিব কেন?"—এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য, তাহা না করাই তোমার নীচ, হীন, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয়,—তাহা না করাই তোমার অমনুষ্যত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব। দান প্রতিদান, অদল বদল, বেচা কেনা,—এ প্রেম-ব্যবসায়ীর কথা,—প্রেমিকের কথা নয়। এ ভালবাসার কোন মূল্য নাই, কোন সার নাই। কাচ দিলাম,—কাঞ্চন পাইলাম ; ছাই মুষ্টি দিলাম,—কড়িমুষ্টি পাইলাম বা পক্ষান্তরে তদ্বিপরীত ফল হইল ;—সে ভালবাসার স্থায়িত্ব কতক্ষণ?—তাহার গৌরবই বা কি? স্বার্থের অন্তস্তলে যাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, 'এই আছে এই নাই' যাহার সম্বন্ধ, সে ভালবাসার ক্ষমতা কতটুকু? তাহাতে এই অনন্তজীবজন্ত-পূরিত বিশাল জগতের কথা দূরে থাক্,—নিজ ক্ষুদ্র গৃহের পরিবার মণ্ডলীরই কল্যাণসাধন হয় না। তাই বলিতেছিলাম, যদি যথার্থ ভালবাসিতে চাও, যাহাকে ভালবাসা বলে, সেই মত ভালবাসিতে চাও, তবে অদল বদল, দান প্রতিদান, বেচা কেনার আশা করিও

না। যদি প্রকৃত ভালবাসিতে চাও, তবে প্রেমিকের কাছে তাহার মন্ত্র গ্রহণ করো ;—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

এমন নহিলে কি আর ভালবাসা ? আত্মত্যাগ ভিন্ন ভালবাসা হয় না ; স্বার্থের কড়াক্রান্তির হিসাবে ভালবাসা টিকে না ; মান অভিমান—সকলই বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে,—সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে না শিখিলে, ভালবাসার মোহনমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে যে সংসারে একটা "ভালবাসা ভালবাসা" রব শুনিতে পাওয়া যায়, সেটা কেবল একটা কথার কথা। হৈ চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে ভালবাসা টিকিতে পারে না। তোতা-পাখীর রাধাকৃষ্ণ-বুলির মতো "ভালবাসা ভালবাসা" করিলেই ভালবাসার উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয় না। ভালবাসার ব্যভিচার করিয়া,—একজনকে ঠকাইয়া নীরয়গামী হইতে হয় মাত্র। ভবের হাটে পণ্য দ্রব্যের মতো যাহার ক্রয়-বিক্রয় হয় ;—লৌকিকতায়, সামাজিকতায় যাহার নিদর্শন,—"তোমারই," "একান্ত তোমারই," "প্রাণ তোমারই," "মনে রেখ," "ভুলনা আমায়" প্রভৃতি—ছাবার কথা ছাবাখানার ভাষায় যাহা ব্যবহৃত হয়, সে মুখের ভালবাসা,—সে লৌকিক নিয়ম রক্ষার স্বরূপ ভালবাসিতে হয় বলিয়া ভালবাসা ;—তাহার কোন মূল্য নাই। এ ভালবাসার উৎপত্তি স্বার্থে,—ইহার বিলয় স্বার্থের ব্যাঘাতে। এরূপ ভালবাসার বিভ্রাট যখন তখন যেখানে সেখানে শুনিতে পাইবে।

সকল বস্তুরই ক্রমোন্নতির একটা স্তর আছে ;—ভালবাসারও একটা স্তর আছে। অপত্য-স্নেহ, ভ্রাতৃ-প্রেম, পিতৃ-ভক্তি, মাতৃ

সেবা, দাম্পত্য-প্রণয় যাহার হৃদয়ে নিহিত থাকে, কালে তাহার সেই ভালবাসা সমাজে, দেশে বিস্তৃত হইয়া যায়। যে যাহার সাধনা করে, সে তাহাতে সিদ্ধকাম হয়। দেশকে ভালবাসিতে পারিলে, ক্রমে সে ভালবাসার স্তর আরও উন্নতির পথে ধাবিত হইতে থাকে। যাহার ভাগ্যে স্বদেশ-ভক্তি পর্য্যন্ত উঠিল, তাহার ভালবাসা-স্রোত ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে সে মহাপুরুষ,—এই অনন্ত জীব-জন্তু-পরিপূরিত বিশাল সংসারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে ভালবাসিয়া থাকেন। তখন তিনি শত্রু মিত্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিত,—সকলকেই ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং সচ্চিদানন্দের পূর্ণবিকাশ তখন তিনি সর্ব্বত্রই দেখিতে পান। জলে, স্থলে, অনলে অনিলে, গৃহে বনে, শত্রুপুরে কারাগারে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে—সর্ব্বত্রই সকল সময়েই তখন তিনি ভালবাসা-সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পান।

রূপজ মোহে যে ভালবাসার উৎপত্তি, সে ভালবাসার যেমন মূল্য নাই, তেমনই গুণজ প্রেমে যে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে, তাহারও খুব উচ্চ প্রশংসা করি না। যেহেতু, এ উভয় ভালবাসাই ক্ষণিক; রূপজ ভালবাসার ন্যায় গুণজ ভালবাসাও স্বার্থ-বিজড়িত। আকাঙ্ক্ষা, আশা ও উদ্দেশ্য মিটিলেই এ ভালবাসাও স্থানবিশেষে লোপ পায়। সুতরাং এ শ্রেণীর ভালবাসাও আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। কেবল সেই ভালবাসাই আদর্শস্থানীয় হইতে পারে,—যে ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা, আশা ও স্বার্থাভিসন্ধিশূন্য;—যে ভালবাসা প্রেমের টানে, প্রাণের আহ্বানে পরস্পরের মধ্যে জড়িত হয়;—

যে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃ-উৎপন্ন, লৌকিক কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিহীন ও স্থূলদৃষ্টির অতীত।

এখন, সে বস্তু কি? সে ভালবাসার উৎপত্তি স্থান কোথায়?—বিশাল বিশ্বরাজ্যে প্রাণ সংমিশ্রণই সেই ভালবাসা। এই অনন্ত জীবজন্তু-পূরিত চেতনাচেতনময় বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই ভালবাসার সন্ধিস্থল। ইহারও উর্দ্ধে যে নিত্য, সত্য, পরম পদার্থ অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই ভালবাসার লক্ষ্যস্থল। মানুষের চরম লক্ষ্য,—অনন্ত বিশ্বের চরম,—পঞ্চভূতময় এই বিশাল ধরিত্রীর মূলাধার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ জগদীশ্বরই সেই নির্ব্বিকার ভালবাসার সাকার মূর্ত্তি। ভালবাসার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি, সুতরাং ভালবাসাই ঈশ্বরের অন্যতম রূপ। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই ভালবাসার পাত্র। ইহার মধ্যে বাদ সাদ দিলে তো চলিবে না। তাই বলিতেছিলাম, গুণাগুণ বিচার করিয়া ভালবাসিও না। সকলকেই আপনার করিতে হইবে,—ভালবাসার রাজ্যে এই বিধি; বিধাতার বিধানও তাই। আপনাকে বা আপনার হৃদয়কে [illegible] ডুবাইতে হইবে—প্রেমের ভাবে বিভোর করিতে হইবে, তবেই তোমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে,—নচেৎ নহে। যে এরূপ আদর্শ ভালবাসায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে আর মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না,—সর্ব্বত্রই তাহার মনের মানুষ বিরাজ করিয়া থাকে।

প্রেম, ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, দয়া, শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি,—সমস্ত সদ্‌বৃত্তিই ভালবাসা হইতে উৎপন্ন; সুতরাং এ সকলের মূলেই ভালবাসা নিহিত আছে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন

ফলের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ,—ভজন, সাধন, প্রার্থনা সকলের মূলেই এই ভালবাসা নিহিত। অতএব জীবনের নির্ম্মল উষাকালেই,—সেই সুকুমার শৈশব হইতেই এই মহাপথের পথিক হইতে হয়। যেহেতু সংস্কার ও অনুকরণবশবর্ত্তী মানুষ শৈশবে যাহা দেখিবে ও শুনিবে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহারই অনুসরণ করিবে।

তবেই ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাটা আসিতেছে,—আত্মত্যাগই ভালবাসা;—পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনাকে উৎসর্গ করাই ভালবাসা।

ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না, নিষ্কাম ভাবে কাজ করিয়া যাও,—তবেই তুমি প্রকৃত ভালবাসার অধিকারী হইতে পারিবে; এবং প্রাণে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। চঞ্চলতা শূন্য, আবেগশূন্য, উদ্বেগশূন্য, প্রশান্ত, ধীর, সুখ-দুঃখ-আকাঙ্ক্ষা-শূন্য আনন্দময় হৃদয়ক্ষেত্রেই ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়,—ভালবাসার প্রতিমা ফুটিতে থাকে। তখন চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আপনার বোধ হয়,—স্থূলদৃষ্টির ভেদাভেদ-জ্ঞান এক কালে লোপ পায়;—প্রাণ উধাও হইয়া অনন্ত লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে,—সকলেরই প্রাণে প্রাণ মিশাইতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা; আর এই ভালবাসাই জগতের আদর্শ।

এমন বিশ্বজনীন উদার ভালবাসা ছাড়িয়া, সঙ্কীর্ণ বিবরমধ্যে,—কেবল একের প্রতি, অথবা কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যকের প্রতি, চিরকাল তোমার ভালবাসা গুটাইয়া রাখিলে আর কি হইল?

এস, জগতের সহিত জগদম্বার চরণে তোমার ভালবাসা উৎ-র্গ করো। মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, নিজ হৃদয়কন্দরে দৃষ্টিক্ষেপ

করো ; দেখিবে, জ্ঞানালোক প্রভায় তথায় মহামায়ার মূর্ত্তি কেমন স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই জগদম্বাই ভালবাসার জীবন্তছবি। ভেদ-বুদ্ধি ঘুচাইয়া তিনি তোমায় ভালবাসার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। ঐ শুন, মা করুণকণ্ঠে ডাকিতেছেন,—"এস বৎস! এস; তুমি ভ্রান্ত জীব! মায়াজালে জড়িত হইয়া ভালবাসার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না; অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ্য স্থির করিতে পারিতেছ না;—সুতারং ভালবাসিয়া তোমার মনের পিপাসা আজিও মিটিতে পায় নাই;—এস বৎস! আমি তোমার বন্ধন ছিঁড়িয়া দিলাম; তিমির-জাল আজ আমার কৃপায় অপসারিত হইল;—এখন দেখ, ভালবাসার চরমে আসিয়া পহুঁছিয়াছ। এই জগৎ আর আমি, ইহাই তোমার ভালবাসার লক্ষ্যস্থল। এস, এই জগৎ, এই তুমি, আর এই আমি,—আজ এক হইয়া পরস্পর মিশিয়া যাই; তখন কে কাহাকে ভালবাসে,—কাহাকে কাহার ভালবাসিতে হয়,—খুঁজিতে হইবে না; ভালাবাসার কোন ক্ষোভই তখন আর কাহারও থাকিবে না। এস বৎস! এই ভালবাসার সাগরে তবে আত্মবিন্দু ডুবাইয়া দাও।"

ভালবাসার বংশীধ্বনি ভক্তচিত্তরূপ নিত্যবৃন্দাবনে প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি যে ভাবে চাও, সেই ভাবেই সেই বাঁশীর রব তোমার কাণে বাজিবে। যদি রাধিকা হও, তবে আনন্দময়ের ঐ আনন্দনিক্কণে আহূত হইয়া, কুলমানে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রেমময়ের চরণে ভালবাসার সাধ মিটাইতে, তোমায় ছুটি-তেই হইবে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম

যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর। তবে যে "রূপ চক্ষে",—কথাটা একেবারে অসঙ্গত, তাহাও বলিতেছি না,—স্থানবিশেষে ও ব্যক্তিবিশেষে বরং উহাই অধিক প্রযুজ্য। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য,—প্রকৃত সৌন্দর্য্য পদবাচ্য নহে ;—ইহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং ইহার স্থায়িত্বকালও অতি অল্প। সহজ কথায়, ইহাকে 'রূপ' না বলিয়া 'রূপজ মোহ' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি।

প্রধানতঃ স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই এই কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে। একজন আর একজনের রূপে মোহিত হইল, তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রাণ আকৃষ্ট হইল, অথচ তোমার আমার জগৎ-সাধারণের চক্ষে সে কিছুই নহে,—যৎ-কুৎসিত মাত্র। ইহাতে কি বুঝা গেল ?—বুঝা গেল এই যে, সে তাহার শিক্ষা, রুচি ও হৃদয়ের ভাব অনুসারে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, বা তাহার একটি বিশেষ গুণ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে উদারত্ব ও সার্বভৌমিকত্ব ভাব কিছুই নাই—ইহা অতি সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তিবিশেষ বা স্থানবিশেষের এ সৌন্দর্য্য সাধারণ নিয়মে খাটে না,—প্রকৃতির আদর্শস্থানীয়ও হইতে পারে না। কোনরূপ বিশেষত্ব দেখিয়া, ভালো মন্দ গুণাগুণ বিচার করিয়া, যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে আকাঙ্ক্ষা,

লক্ষ্য ও স্বার্থের ছায়া বিদ্যমান থাকে,—তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, ও পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই, বা মধ্যে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইলেই, এ সৌন্দর্য্য আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়,—তখন সেই রূপ বা গুণের আর কোন বিশেষত্ব থাকে না,—উহার অস্তিত্বই এককালে লোপ পায়,—মোহ ভাঙ্গিলেই সেই রূপ-পিপাসা মিটিয়া যায়। কিন্তু যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সকল সময়েই সুন্দর বোধ হইবে। এ সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য অনন্ত এবং ইহার স্থায়িত্বকালও অনন্ত। ইহাতে ব্যক্তিগত, জাতিগত, স্থানগত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব নাই। তবে ইহাতেও শিক্ষা, রুচি ও হৃদয়ের ভাব, অনুযায়ী ফল মিলিয়া থাকে। এ সৌন্দর্য্য আদর্শস্থানীয় ও ভাবমূলক (Ideal)। ভাব-চক্ষে এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিলে, অতি মনোহর ও অনির্ব্বচনীয় বোধ হয়। বহি-শ্চক্ষে যে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা বলিতেছি না—তবে ততটা নহে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ আদর্শ বস্তু দেখিতে হইলে, ভাব-চক্ষে দেখাই প্রশস্ত।

ভাব-চক্ষু লাভ করিতে হইলে প্রেম-সাধনার আবশ্যক হয়। প্রেম লাভ না করিতে পারিলে, আদর্শ সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না,—হৃদয়ে সে ভাব উপলব্ধিও হয় না। যেখানে সৌন্দর্য্য-বোধ, সেই খানেই অগ্রে প্রেম,—যেখানে প্রেম সেইখানেই সৌন্দর্য্য। একের অভাব হইলে আর একটি মলিন হয়,—তাহার পূর্ণস্ফূর্ত্তি থাকে না। সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা—প্রেমে, প্রেমের পরিচয়,—সৌন্দর্য্য-বোধে। দুয়ের সংযোগ না হইলে কোনটিরও পূর্ণবিকাশ হয় না। অতএব সৌন্দর্য্য

দেখিতে হইলে প্রেমের আবশ্যক হয়, প্রেমলাভ করিতে হইলে সৌন্দর্য্য দেখিবার শিক্ষাও আবশ্যক করে।

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি নানাপ্রকার, প্রেমের স্ফূর্ত্তিও নানাভাবে বিকশিত। সৌন্দর্য্য ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই,—প্রেম ও অন্তরে প্রকাশ্যে সর্ব্ব আধারেই। প্রেমের স্ফূর্ত্তি,—সৌন্দর্য্যে, সাকারমূর্ত্তি ধারণ করে;—সৌন্দর্য্য-বোধও প্রেমে মিলিয়া সংসারে স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সৌন্দর্য্য প্রেমের সাহায্য করে,—প্রেম সৌন্দর্য্যের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যেন দুয়ের প্রাণ এক হয়, দুয়ের প্রাণই যেন মহামিলনে একীভূত হইয়া যায়।—এ এক মহাযোগ। ইহার উপরেও সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আর একটি স্তর আছে, সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

জড়-রাজ্যে যেমন সৌন্দর্য্য আছে, মনোরাজ্যেও তেমনি সৌন্দর্য্য আছে। জড়-জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে যেমন প্রেমের আবশ্যক হয়, মনোজগতের সৌন্দর্য্য দেখিতেও সেইরূপ প্রেমের সাহায্য আবশ্যক করিয়া থাকে। তবে ইহাতে প্রভেদ এই,—জড়-জগৎ—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, দর্শন-স্মৃতি-বুদ্ধি-যুক্ত আকার-বিশিষ্ট—সাকার-মূর্ত্তি;—আর অন্তর্জগৎ নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার, ভাব-মূলক। একটিতে সাকার, সগুণ, সকামভাব বিদ্যমান,—অন্যটিতে নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্কামভাব নিহিত। একটি ত্রিগুণাত্মক—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ভাবাপন্ন,—অন্যটি ত্রিগুণাতীত—সচ্চিদানন্দ ভাবে বিভোর। একটি জগদীশ্বর,—অন্যটি ব্রহ্ম। একের ভাব,—এই কার্য্য-কারণ-যুক্ত লীলা-বৈচিত্র্য;—অন্যের ভাব,—বিশুদ্ধং শান্তং শিবমদ্বৈতং;—অনন্ত বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আভাসমান থাকিতেও যে ভাব, বিশ্ব-বিধ্বংসী মহাপ্রলয়ের সময়ও ব্রহ্মের সেই ভাব।

বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠে, গোলোকে রাসমণ্ডলে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মহামিলন। রাসেশ্বর **সুন্দর পুরুষ,** হ্লাদিনী রাধা **প্রেমময়ী প্রকৃতি ;** রাধা কৃষ্ণের যুগলমিলনে,—প্রেম সৌন্দর্য্যের মহা-মিলন। রাধা পদানুসরণে কৃষ্ণ মিলে, অর্থাৎ মহা প্রেমে মহা সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়। একটা হ'লে, আর একটা জিনিস পাওয়া যায় ;—এ দুটার কোনটা বড় ? কৃপণ বলিবেন,—টাকাই বড়, পেটুক বলিবে,—সন্দেশই বড়। শুক বলে কৃষ্ণ বড়, সারী বলে রাধা বড়। শুক বলে, 'আমার কৃষ্ণ মদনমোহন ;' সারী বলে, 'আমার রাধা বামে যতক্ষণ,—নইলে শুধুই মদন।' প্রশ্নের এই একরূপ উত্তর। আর একরূপ উত্তর নসুর মুখে। নসুর পিতা মাতা বসিয়া আছেন, নসু খেলা করিতেছে ; হঠাৎ নসুর মাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে নসু, তুই তোর বাপকে বেশী ভাল বাসিস্, না মাকে বেশী ভাল বাসিস্ ?" নসু বড় গোলে পড়িল। মায়ের মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল, মা টিপি টিপি হাসিতেছেন ; মায়ের বসনাচ্ছাদিত স্তনের দিকে তাকাইল, দেখিল, স্তনদুটি কাঁপিতেছে ; তাহার পর বাপের দিকে তাকা-ইল, দেখিল পিতা একদৃষ্টিতে হাস্যবদনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তখন সাহস পাইয়া নসু মায়ের স্তনে বাম হাতের চড় মারিয়া, দক্ষিণ হস্তে পিতার গোঁফ ধরিয়া টানিল, আর মাসীকে উত্তর দিল—**"দুজনকেই।"**

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি নানাপ্রকার। এই জড়-জগৎ ও অন্তর্জগতের সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বিরাজিত। ফলে ফুলে, জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহে উপগ্রহে, সমুদ্রে ব্যোমে,—সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী,—অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার।

নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের উৎস—জীব জন্তু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রাণী মাত্রেরই প্রাণে অবিরাম গতিতে বহিতেছে। প্রেমের মন্দাকিনী ধারা এই সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া একই উদ্দেশ্যে—সেই চরম-লক্ষ্যে খরতর বেগে ছুটিতেছে। প্রকৃতির সন্তান সে সুধাপানে অমর হইতেছে। এই প্রভাত হইল, মৃদুল মলয় বায়ু ধীরি ধীরি বহিতে লাগিল, বিহঙ্গমকুল সুললিতস্বরে প্রভাতীগানে অনন্ত জগৎ মাতাইয়া তুলিল, মধুকর দল গুন্ গুন্ রবে প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুপানে মত্ত হইল, দিনকর স্বর্ণকর ঢালিয়া আরক্তিম লোচনে চাহিতে লাগিলেন, অনন্ত সুনীল আকাশ দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল,—চারিদিক কোলাহলপূর্ণ হইতে লাগিল। আবার মধ্যাহ্নে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ;—এখন আর প্রকৃতির সে স্ফূর্ত্তি নাই;—বৃক্ষরাজী, তরুলতার এখন আর সে হাস্যময় ভাব নাই—এখন জীব জন্তু, পশু পক্ষী সকলেই ক্লান্ত, সকলেই অবসন্ন,—মার্ত্তণ্ডের খর কিরণে সকলেই এক্ষণে বিশ্রামলাভে লালায়িত। গোধূলি সমাগমে, আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন।—সুনীল আকাশ এখন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। আকাশের চারিদিক্ নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, কৃষ্ণ, ধূসর নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তটিনী কুল-কুল-স্বরে আপন মনে বহিতেছে, পশু পক্ষী স্ব স্ব বৃক্ষ-নীড়ে ফিরিতেছে।—দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী তিমির বসন পরিধান করিয়া ধরা-উদ্যানে বিচরণ করিতে আসিলেন। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজী ফুটিয়া তাঁহার মস্তকে হীরক খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; চাঁদ উঠিল, চকোর চকোরী চাঁদের সুধা পান করিতে লাগিল, চাঁদের আলোয় দিক আলোকিত হইল। বিমল জ্যোৎস্না একটু একটু

করিয়া ফুটিতে লাগিল। ক্ষণপরে আবার সে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন। স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত পৃথিবী ক্রমেই অধিকতর প্রশান্ত হইতে লাগিল। গভীর নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যে কেমন এক সুমৃদু গম্ভীর ঝিম্ ঝিম্ রব শ্রুত হইতে লাগিল; নিদ্রার বিশ্রাম ক্রোড়ে সকলেই সুপ্ত—কোথাও কিছু সাড়া-শব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে সুদূর আকাশ হইতে দেব দেবীর পূজোপকরণ অপূর্ব্ব ঘণ্টার মৃদু মধুর রব ভক্তের মন প্রাণ বিমুগ্ধ করিতে লাগিল;—সংসারের পাপী তাপী, দীন দুঃখী, আর্ত্ত অনুতপ্ত,—সন্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া স্ব স্ব ভারবহ জীবন লঘু করিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন;—এই বার সুখময়ী উষাদেবীর আবির্ভাব হইল। এইরূপে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি আবহমানকাল আপনার অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। গ্রীষ্মের দুর্দ্দমনীয় উত্তাপ, বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারা, শরতের মেঘরাশি, হেমন্তের নীহার, শীতের শৈত্য, বসন্তের মলয় বায়ু—ষড় ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব অন্তর্ধানে প্রকৃতি রাজ্য নিত্য নূতন শোভায় শোভিত হইতেছে,—অনুক্ষণ সৌন্দর্য্যের ডালি মাথায় লইয়া প্রকৃতি-দূতী জীব-জগতকে উপহার দিতেছেন। এ সৌন্দর্য্য সকলকেই মোহিত করে,—সকলের হৃদয়েই আনন্দ বর্দ্ধন করে। এ সৌন্দর্য্যের মূলেও প্রেম নিহিত;—প্রেমই সুখ। হৃদয়ের তারতম্যানুসারে এ সুখ সকলেরই উপভোগ্য হয়।

তারপর অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যের কথা। দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শান্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি কমনীয় গুণ সমষ্টিতে এ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি। প্রেমই ইহার মূলাধার, ভালবাসাই ইহার প্রাণ। এ সৌন্দর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের

দেবত্বলাভ হয়। বহির্জ্জগতের ন্যায় ইহার জড়রূপ নাই,—ইহার রূপ,—বাসনায়। বাসনায় মূর্ত্তি গড়িয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। এ জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রতিভায় ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু প্রেম ভিন্ন জড়-জগতের সৌন্দর্য্যও সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতি রাজ্যেই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ,—তোমার আমার চক্ষে একরূপ বোধ হইবে, আবার প্রেমিক, ভক্ত, সাধক বা কবির চক্ষে ভিন্ন রূপ বোধ হইবে। তুমি আমি সহজ দৃষ্টিতে যাহা দেখিবার তাহাই দেখিব, কিন্তু ইঁহারা সাধনার অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক অধিক ও উচ্চতর ভাব দেখিতে পাইবেন। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, শিক্ষা, রুচি ও মনের উদার অনুদার ভাব অনুসারে, সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহই নিরাশ হইবে না—অবিনশ্বর অনন্ত-সৌন্দর্য্য সকলকেই একটু না একটু দেখা দিবে। অল্প হোক্, অধিক হোক্,—সাধনা তো সকলেরই আছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম,—যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর বোধ হইবে।

প্রকৃতি-রাজ্য ছাড়িয়া আরও সহজ পথে অগ্রসর হইতেছি। একখানি সুবৃহৎ শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত বিচিত্র ও মনোহর চিত্রপট দর্শন করো;—নানা বর্ণে রঞ্জিত বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র, আকাশ প্রভৃতি সে চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে;—চিত্রকরের দক্ষতা গুণে চিত্রখানি বড়ই সুন্দর ফুটিয়াছে। তুমি আমি সকলেই এক দৃষ্টে সেই চিত্র দেখিতেছি, দেখিয়া

মুগ্ধ হইতেছি ;ও মুক্ত অন্তরে চিত্রকরের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। তুমি আমি, চিত্রপটের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতেছি, বিবিধ বর্ণের চাকচিক্যময় বৃক্ষ-লতা, অরণ্য পর্ব্বত প্রভৃতি দেখিয়া স্থির দৃষ্টে হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছি,—কিন্তু ভিতরের সৌন্দর্য্য বা ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই, হয়ত তাহার বিশেষ দোষ গুণ বিচার করিতেও পারিতেছি না—অথচ কিছু না কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সেই চিত্রকরের সমকক্ষ আর একজন চিত্র-সমালোচক যদি সেই চিত্রপট খানি দর্শন করেন, তবে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই চিত্র দর্শন করিয়া কতই না সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবেন! এখানে শিক্ষার উপর এই সৌন্দর্য্য-দর্শন নির্ভর করিতেছে।

গান সকলেই শুনে, মিষ্ট লাগিলে সকলেই "আহা মরি" করে ; কিন্তু প্রকৃত সুর, তান, লয় বুঝে কয়টা লোক ? মহাকাব্য সকলেই পড়ে, কিন্তু প্রকৃত রস-বিচার বোধ কয়জনের আছে ? গ্রন্থ লিখে অনেকে, পাঠযোগ্য হয় কয় খানা ? এ সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে সৎশিক্ষার আবশ্যক করে ; তারপর রুচিও কতকটা পরিমার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

সাহিত্য ও কাব্য-জগতের সৌন্দর্য্যও বড় একটা সহজ ব্যাপার নয়। স্থূল জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জ্জগৎ সৃষ্টি করা, বড় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির কাজ। যখন তখন সে শ্রেণীর লোকও বড় একটা জন্মগ্রহণ করে না। সাহিত্য-জগতের অমর কবি বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের ভারত—রসের সপ্তসমুদ্র বিশেষ। মানব-চরিত্রের এরূপ বিশ্লেষণ ও ঘটনা-পরম্পরার এমন সুকৌশল-সংযোগ অতি অল্পই

দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, ভবভূতির উত্তরচরিত প্রভৃতিও রত্নবিশেষ। কিন্তু এ সকল কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে কয় জন? সেক্সপিয়রের গ্রন্থ তো অনেকেই পড়ে; কিন্তু হামলেট, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো ও লিয়রের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে কয়জন? আর আজ বাঙ্গালী লেখকের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা-বান্ বঙ্কিমচন্দ্রের উপাখ্যানাবলী পঠিত হয় ত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে —স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকারও মধ্যে;—কিন্তু "কপালকুণ্ডলা"র সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছে কয়জন? তাহাতেই বলিতেছিলাম, কাব্য-জগতের সৌন্দর্য্যও বড় একটা সহজ জিনিস নয়। প্রভূত প্রতিভা-শক্তি না থাকিলে আদর্শ চরিত্রের অঙ্কনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না,—সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয় না। কোন্ ইংরেজ দার্শনিক বলেন,—"কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তির নাম প্রতিভা (genius);" আমরা বলি, তাহারই নাম প্রেম। প্রতিভায় শক্তির স্ফূর্ত্তি; প্রেমে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি।

আদর্শ চরিত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকশিত করাই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ,—পরন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্র অঙ্কনে সে ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না,—এমন কথা বলিতেছি না। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা বাস্তব বলিতেছি, সময়ে তাহাই আদর্শ হয়,—আবার উপস্থিত যাহা আদর্শ মনে হইতেছে, কোন কোন প্রত্যক্ষ ঘটনায় তাহাই আবার 'বাস্তব' রূপে দেখিতে পাই। অতএব বাস্তব ও আদর্শের বিশেষ মীমাংসা সিদ্ধ হয় না। তবে এই অবধি বলিতে পারা যায়, বাস্তব হোক আর আদর্শ হোক,—এ উভয় চিত্র অঙ্কিত করিতেই প্রভূত প্রেমের প্রয়োজন। এ 'বাস্তব' ঠিক **realistic sketch** নহে, পরন্তু যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি,

শুনিতেছি, বলিতেছি, লিখিতেছি, পড়িতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহাই বাস্তব বা realistic।—ইহাতে যে সৌন্দর্য্য নাই, এমন কথা বলি না। তবে কথা এই, যে জিনিসটা খুব সুলভ ও অতি সাধারণ, চিন্তাশীল ভাবুকের নিকট তাহার আদর কম। তাহা হইতে সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করায় বেশী শক্তির আবশ্যক হয় না; অধিকন্তু তাহার শক্তি এবং স্থায়িত্বকালও অল্প। এই জন্যই আমরা realistic অপেক্ষা idealistic-এর অধিক পক্ষপাতী; এবং এই জন্যই আমরা স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের অধিক প্রাধান্য দেই।

পক্ষান্তরে মানুষের স্বভাব, শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সৌন্দর্য্য-দর্শনের তারতম্য হয়। সুতরাং যে বস্তু বা যাহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাহার প্রতি তত আস্থা বা ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে না; কেন না, তাহাতে "লুকানো ছাপানো কোন না কোন খুঁৎ থাকিতে পারে।" তুমি সমস্ত সৎগুণের আধার-স্বরূপ হইলেও, লোকে আর এক-জনকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়, হয়ত তোমার আদর্শ দেখাইবে না,—যাহা সকলের শীর্ষস্থানীয়, এমন আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিবে। তুমি আজ হয়ত ভালো আছ, কাল হয়ত না থাকিতে পারো,—দুই বৎসরে হয়ত তোমার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে,—তোমার চরিত্রে একটু না একটু কলঙ্কের দাগ স্পর্শ করিতে পারে;—সুতরাং কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবার সময় লোকে বলিবে,—"রামচন্দ্রের মতো সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যব্রত হও,—যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্ম্মপরায়ণ ও বিনীত হও।" যদি স্ত্রীলোক হয়, তো বলিবে,—"এস মা, সীতা সাবিত্রীর মতো পতিব্রতা হও।" এখানে এ আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিবার কারণ এই,—"ইহারা পৌরণিক চরিত্র; ইহাদের চরিত্রে তো খুঁৎ থাকিতে

পারে না;—আর পরিবর্ত্তন,—তাহাও অসম্ভব।” তাহাতেই বলিয়াছি যে, আদর্শ-সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। প্রেমেই তাহার সৃষ্টি, প্রেমেই তাহার অনুভাবনা।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ব্যভিচার—রূপজ-মোহ যে কিছুই নয়, এক্ষণে সেই কথাটি বলিব। একটি পরম লাবণ্যবতী অসমা সুন্দরী বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাঁচজনের মনে পাঁচ রকম ভাবের উদয় হইল। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে তাহাকে দেখিয়া কেবলই পাশববৃত্তির উত্তেজনায় অন্ধ হইল;—দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া কেবলই “আহা মরি” বলিয়া তাহার রূপের ও অঙ্গসৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল;—তৃতীয় ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া “আহা, এমন সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এ কলুষিত স্থানে কেন আসিল” বলিয়া তাহার ঘৃণিত বেশ্যা-জীবনের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। চতুর্থ ব্যক্তি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম-বিগলিত নেত্রে জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করত কহিলেন,—“আহা, বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এমন রূপের প্রতিমা গড়া কেবল তাঁহাকেই শোভা পায়!” পঞ্চম ব্যক্তি সৌন্দর্য্য ও প্রেমে আত্মহারা,—তিনি ভাবের পূর্ণোচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া কহিলেন,—“আহা, কি অপরূপ রূপ! কি কমনীয় কান্তি! এ হেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে যিনি সৃজন করিয়াছেন, না জানি তিনি কতই সুন্দর!”

এখন রূপজ-মোহে এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দৃষ্টিতে কত প্রভেদ দেখিলে? এখন জানিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও প্রেম কি? এখন বোধ হয় স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর বোধ হইবে। দেখ, এই বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য কাহাকেও বঞ্চিত করিল না। যাহার হৃদয়ে যে ভাব,

যেমন রুচি, যেরূপ শিক্ষা, সে, সেই ভাবেই বারাঙ্গনাকে দেখিল,—তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিল।

যাহারা রূপে মজিয়া সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাহারা দেখিতে পায় না। প্রেমের পূজা না করিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখা দেয় না। মনের কালিমা না ধুইলে জ্ঞান-চক্ষু ফুটে না। সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি না করিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বহু দূরে অবস্থিতি করে। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ—প্রেমে; আর প্রেমের পূর্ণস্ফূর্ত্তি সেই সৌন্দর্য্য বোধে। সত্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যময় ও প্রেমময় বস্তু আর কিছুই নাই;—সুতরাং সত্যই সৌন্দর্য্য ও সত্যের ধারণাই প্রেম। ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই,—সুতরাং ধর্ম্মই সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মের ধারণাই প্রেম।

রূপজ মোহে মানুষকে আদর্শ-পথে লইয়া যাওয়া দূরের কথা,—তাহাকে অধঃপথে নরকের দিকে আকর্ষণ করে,—তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সাধ্বী সতী সুন্দরী রমণীকে যদি কোন দুর্ব্বৃত্ত আক্রমণ করিতে যায়, তবে সেই সতীর দীর্ঘশ্বাসে এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অপূর্ব্ব মহিমায়, অতি শীঘ্রই সে আক্রমণকারী পশুকে চিরদিনের মত ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বলরূপে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে রূপের আগুনে পুড়িয়া ট্রয় নগর এককালে ভস্মীভূত হইয়াছিল; যাহার জন্ম একদিন রোমের সাধারণ বিচার-তন্ত্র সংস্কৃত হইয়া রোমবাসীর হৃদয়ে একতা ও সহানুভূতির বীজ বদ্ধমূল হইয়াছিল; যে কারণে লুক্রেশিয়া-নাম অক্ষয় অক্ষরে ইতিবৃত্তে খোদিত হইয়াছে,—ইহা সেই সতীবিক্রম। যাহার জন্ম সেই প্রবলপরাক্রমশালী, প্রচণ্ড-

তেজা, দুর্জ্জয় দশানন সবংশে নিহত হইয়াছিল; বিপুল কুরুকুল যে কারণে এককালে নির্ম্মূল হয়; যে আগুনের অলৌকিক তেজে সর্ব্ববিধ্বংসী মহাকালও বিকম্পিত হইয়াছিল—সত্যবানের দেহ স্পর্শ করিতেও সাহসী হয় নাই, তাহা কেবল প্রেমের মহিমা, সতীত্বের সৌন্দর্য্য।

কিন্তু সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই চরম অবস্থা,—ইহ সংসারে অতি বিরল। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন এ সৌভাগ্য কেহ লাভ করিতে পারে না। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিলে, মানুষের দেবত্ব লাভ হয়। তখন শত্রু মিত্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যবান্,—সকলকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়,—ইহ সংসারে আর কোন বিষয়ের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না।

চর্ম্মচক্ষে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এ গভীর উদার ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। চর্ম্ম-চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যখন মানুষের মনশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখনই এ ভাব উপলব্ধি হয়। তখন প্রেমময় ভগবানের প্রেমচ্ছবি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।—জলে স্থলে, অনলে অনিলে, গৃহে বনে, পর্ব্বতে অরণ্যে, শত্রুপুরে কারাগারে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে—সর্ব্বত্রই সকল স্থানেই মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের বিরাট সাকার মূর্ত্তি এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। চরাচর অনন্ত বিশ্ব তখন সদাই অনাবিল আনন্দের পূর্ণ বিকাশে আনন্দময় হইয়া উঠে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভাণ্ডার হয়। কারণ সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, সে প্রেমেরও অন্ত নাই। তাহা অনন্ত ও অক্ষয়।

এই প্রেমের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-

দেব "হরিবোল হরিবোল" রবে এক দিন ভারত মাতাইয়া ছিলেন; মহামতি শাক্যসিংহ এই ভাবে বিভোর হইয়া একদিন জীবের মুক্তির উদ্দেশে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন; বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অদ্বৈতবাদী পরমজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য একদিন এই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত "সচ্চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং" রবে ধর্ম্ম-জগৎ বিকম্পিত করিয়াছিলেন; আর ধ্রুব প্রহ্লাদ এই আলোকে হৃদয় আলোকিত করত মরণভয় তুচ্ছ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য লক্ষ্য-পথে ছুটিয়াছিলেন। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অপূর্ব্ব মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া খ্রীষ্ট ক্ষমা-গুণের অসাধরণ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন; মহাত্মা সক্রেটিস্ এই সত্যের মহিমায় বিষপান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; মিবাররাজ মহারাণা প্রতাপ এই সৌন্দর্য্যপ্রেমে বিমোহিত হইয়া স্বদেশ-সেবা-ব্রতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। আর সেই ভক্তি-তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তের মেলায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই একদিন এই প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।—স্রোতস্বতী যমুনা একদিন এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকর্ষণে তাহার স্বভাব-গতিও রোধ করিত! সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ অবতার—যখন সেই মোহন বাঁশরী মোহন করে লইয়া অনন্ত প্রেমের মহিমা আলাপ করিতেন,—কুলবধূ তখন কুলত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইত না,—সতী রমণী পতিকে ছাড়িয়া আসিত,—জড় জগতেরও তখন স্বাভাবিক বিপর্য্যয় ঘটিত। এই তো সৌন্দর্য্য—এই তো প্রেম। এই তো পরিণাম, এই তো জড়জগতের প্রাণ। ইহাই জগতের সার,—ইহাই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

প্রতিভা ও প্রেম

পূর্ব্ব প্রবন্ধের একস্থানে কোন ইংরেজ দার্শনিকের অভিমতি বলিয়াছি,—"কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তির নাম প্রতিভা।" আমরা বলি, তাহারই নাম প্রেম। প্রতিভায় শক্তির স্ফূর্ত্তি; প্রেমে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি।

কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভাবিয়া দেখিলে, কেবলই 'অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে' মানুষ, প্রতিভা ও প্রেম লাভ করিতে পারে না। কতকটা পূর্ব্বজন্ম হইতে সঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহজন্মে তাহার বিকাশ হয়। জিনিস দুইটি কিন্তু মূলে এক। যাহা প্রকৃত প্রতিভা ও প্রেম, তাহা একস্থান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রতিভা ও প্রেম দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, তাহার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি হয়। প্রতিভা—মস্তিষ্কের কার্য্য, প্রেম—হৃদয়ের কার্য্য। মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বৈষয়িক কারবারে,—হৃদয় ও মস্তিষ্ক, দুইটা পৃথক রাখিয়া কেহ কেহ কাজ করিতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা ও প্রেমের কার্য্য তাহাতে হয় না। কারণ প্রকৃত প্রতিভায় ও প্রেমে, প্রবঞ্চনা নাই।

প্রতিভা কার্য্যকরী, প্রেম পোষণকরী; প্রতিভায় সৃষ্টির বিকাশ, প্রেমে স্থিতি বা পালনের স্ফূর্ত্তি; প্রতিভা—জ্ঞান, প্রেম—ভক্তি; প্রতিভা—ব্রহ্মা, প্রেম—বিষ্ণু। সুতরাং এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত বস্তুদ্বয়,—একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। মূলে দুয়ে এক।

মতান্তরে, কেহ বলিতে পারেন, প্রতিভার কোন কার্য্য নাই, প্রেমেরই কার্য্য ষোল আনা। প্রতিভা কেবলই একটি অসাধারণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করে মাত্র, প্রেম তাহা কার্য্যে পরিণত করে। কিন্তু প্রতিভা অর্থে যদি "to bring forth" হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলি কিরূপে?

তবে একটি কথা আছে। প্রেম অর্থে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝে, প্রতিভা অর্থে সে ভাব উপলব্ধি করে না। প্রেমের চরম লক্ষ্য,—যেন পরার্থপরতায় উৎসর্গীকৃত; আর প্রতিভার লক্ষ্য যেন ইহজাগতিক অবিনশ্বর পদার্থে সংবদ্ধ। তাই কেহ কেহ বলেন, প্রতিভা ও প্রেম দুইটি বিভিন্ন বস্তু; এবং উহাদের কার্য্যও স্বতন্ত্র। অতএব প্রতিভাহীন প্রেমও থাকিতে পারে এবং প্রেম-বিহীন প্রতিভা রহিয়াও যায়। যেমন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বা সেক্স-পিয়র প্রেমিক ছিলেন না,—পরন্তু তাঁহারা প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন বটেন।

এইখানেই কিন্তু গোল বাধিল। তুমি একটি অনুপমা মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হও; আর আমি একটি ফুল দেখিলেই ইহ-সংসার ভুলিয়া যাই;—দুইটা জিনিসের কোন্‌টা বড়? এখানে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে যাহার রুচি, প্রবৃত্তি ও শিক্ষানুযায়ী প্রেম-সম্ভোগ করে। রমণীমূর্ত্তি দর্শনে, তোমার যে প্রেমের উদয় হয়; অরণ্য-

জাত একটি ক্ষুদ্র ফুল দর্শনে যে, আমার সে প্রেম উদয় হইতে পারে না, এ কথা কে বলিল ? তবে জিনিসের তারতম্য করিয়া যদি দর কসিতে হয়, সে কথা স্বতন্ত্র ;—মূলে কিন্তু দুয়ে এক রহিল।

পক্ষান্তরে যে বৃত্তি ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভগবৎচরণে উপনীত হয়, তাহা পরাভক্তি বা প্রেমনামে অভিহিত হইয়া থাকে ; আর সাংসারিক বা পার্থিব বিষয়ে যে বৃত্তির বিশেষরূপ অনুশীলন করা যায়, তাহা অনুরাগ নামে কথিত হয় ;—কিন্তু এই অনুরাগ ও প্রেমের উৎপত্তি স্থান কি এক নহে ? এক শব্দগত পার্থক্য-ছাড়া প্রতিভা ও প্রেম যে একই বস্তু, একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। তুমি বলিবে, এমন অনেক নাস্তিক আছেন, তাঁহারা অবশ্য প্রতিভাবান্, কিন্তু প্রেমিক নহেন।—কেহ হয়ত কাব্যে বা দর্শনে কিংবা বিজ্ঞানে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু জগদীশ্বরের নাম দিনান্তেও মুখে আনেন নাই, এমন কি, তাঁহার অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই। এখানে আমার বক্তব্য, তাঁহাদের ঐ প্রতিভা বা প্রেম ঐ কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞানে ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায়, অন্য চিন্তার অবসরই তাঁহাদের হয় না। কিন্তু তা' বলিয়া তাঁহাদের যে প্রেম নাই, এমন কথা কে বলিল ? তোমরা ইহাকে অনুরাগ বলিতে হয় বলো ; কিন্তু আমি বলি, ইহারই নাম প্রেম।—তাঁহাদের ঐ কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞানই মনে করো, তাঁহাদের জগদীশ্বর !

সংসারে সকল বস্তুরই ক্রমোন্নত একটা স্তর আছে। এই প্রতিভা ও প্রেমেরও সেইরূপ একটা স্তর আছে। এই স্তর যখন পূর্ণসীমা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিভা ও প্রেমের মহামিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহার ফল অতি অপূর্ব্ব।

প্রতিভা অনেক রকমে ফুটিতে পারে, প্রেমও নানা আধারে বিকশিত হয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে কার্য্যের ফলাফল হইয়া থাকে। প্রতিভা ও প্রেমও সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী। প্রতিভা-বলে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা সংসাধিত হইতে পারে; প্রেমের মহিমায়ও ধরায় স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পক্ষান্তরে অধিকারী ভেদে, শিক্ষার দোষে বা শিক্ষার অসম্পূর্ণতা হেতু,—এই স্বর্গীয় বস্তু হইতেই যে, কতবিধ অনর্থ ও হাহাকার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্বা নাই। হইবারই কথা;—ভালো জিনিস মন্দ হইলে, বড় মন্দ হয়।

পরন্তু প্রতিভা ও প্রেম যখন একাধারে মিলিত হয়, যখন তাহা সম্পূর্ণত্বে উপনীত হইয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করে; তখন তাহার কার্য্যফল বড়ই মনোহর ও শুভকর হইয়া থাকে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

যে প্রতিভা, ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট; যে প্রেম ভগবদ্ভক্তির মহামহিমায় পরিবর্দ্ধিত; তাহার ফল অতুলনীয়। তাহা কখন অসৎপথে ধাবিত হইতে পারে না। খাঁটি জিনিষ কখন মন্দ ফল দেয় না,—মেকি, মিশ্রিত ও অসম্পূর্ণ বস্তুই যত কিছু অনর্থ আনয়ন করে। কিন্তু যাহা প্রকৃতই প্রতিভা ও প্রেম, যাহা অবিনশ্বর ও অলৌকিক, যাহা অকৃত্রিম ও উৎকর্ষময়, তাহার ফল কথনই মন্দ হয় না। প্রতিভা ও প্রেম,—শব্দের নামান্তর মাত্র; ইহা ভিন্ন বস্তু নহে,—এক। কেবল আধার ভেদে এই এক,—দুই হইয়া দাঁড়ায়।

সাধনার উৎকর্ষফল,—প্রতিভা ও প্রেম। অল্প হোক আর অধিক হোক, সাধনা সকলেরই আছে; কিন্তু তা' বলিয়া সকল

মানুষই প্রতিভাবান্ বা প্রেমিক নয়। এ সাধনার বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব যাঁহার যে পরিমাণে ঊর্দ্ধগামী হয়, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিভা বা প্রেম লাভ করেন।

প্রতিভা ও প্রেমের প্রধান লক্ষণ,—অসাধারণত্ব ও বিশেষত্ব। জড়-জগৎ বা জীব-জগতের যেখানে কিছু অসাধারণ ও বিশেষ গুণ দৃষ্ট হইবে, সেই খানেই বুঝিতে হইবে, প্রতিভা ও প্রেম কিছু না কিছু আংশিক ভাবে নিহিত আছে। প্রতিভাবান্ ও প্রেমিক, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই, সাধারণ হইতে এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করেন।

প্রতিভা অনেক বিষয়ে হইতে পারে; প্রেমও নানা আধারে জন্মিতে পারে। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালনে,—নশ্বর বিষয়ের পর্য্যালোচনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রতিভা ও প্রেমপদ বাচ্য নহে। অসৎবুদ্ধি চরমোৎকর্ষ লাভ করিলেও, কখন না কখন তাহা হ্রাস পায়, কোন না কোন কারণে তাহা অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ধড়িবাজ্, লম্পট, প্রবঞ্চক, শঠ বা অন্য কোন দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি, সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি সত্বেও, কিছুতেই আত্মোন্নতি তথা জগতের উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ প্রতিভা ও প্রেম অতি পবিত্র বস্তু,—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি বিশেষ, এমন অপার্থিব ধন, অপাত্রে ন্যস্ত হইবে কেন ?

অতএব বুঝিতে হইবে, যেখানে প্রতিভা ও প্রেমের বিকাশ, সেইখানেই ধর্ম্ম। এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই ভগবানের করুণা। তাই প্রতিভাবান্ ও প্রেমিকের অভ্যুদয়ে, পৃথিবী পবিত্র ও ধন্য হয়; সংসার স্বর্গধামে পরিণত হয়। প্রতিভার বিকাশ

প্রেমে; আর প্রেমের স্ফূর্ত্তি প্রতিভায়। দুই বস্তু এক না হইলে, দুয়েরই অস্তিত্ব লোপ হয়, শিব গড়িতে বানর বানিয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, উভয়ের একীকরণেই একটা খাঁটি জিনিসের উৎপত্তি হয়। সেই খাঁটি জিনিসের নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন প্রতিভা ও প্রেম,—কর্ম্মহীন গৃহীর গার্হস্থ্য আশ্রমের তুল্য; তাহার প্রাণ নাই,—সে মৃত।

প্রতিভা ও প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ,—অসমতা বা সংগ্রাম। যেন জগতের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতেই তাহার জন্ম। জলন্ত আগুনে দগ্ধ হইয়া খাঁটি সোণাই টিকিয়া যায়; প্রকৃতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে প্রতিভা ও প্রেমের জয় হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রতিভাবান্ ও প্রেমিকের উপর দিয়া, যত ঝড়, যত তুফান বহিয়া যায়! এইজন্যই ধার্ম্মিকের ভাগ্যেই যত বিপদ, যত হাহাকার, যত বিঘ্ন বাধা সংঘটিত হইয়া থাকে! প্রতিভা ও প্রেমের এই দ্বিতীয় লক্ষণ,—পৃথিবীর ইতিহাসে আবহমানকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পদে পদে শত সহস্র প্রকার,—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিঘ্ন-বাধা, অশান্তি বিপদ অতিক্রম করিয়া, সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতেই যেন প্রতিভাবান্ ও প্রেমিকের জন্ম।

প্রতিভা ও প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ,—আত্মপ্রাধান্য। বস্তুতঃ, যখন যেখানে যেমন অবস্থাতেই হোক, প্রতিভাবান্ ও প্রেমিক, ইচ্ছা করিলে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন। প্রকৃতি আপনা হইতেই যেন তাঁহাকে প্রধানত্ব প্রদান করে।

প্রতিভা ও প্রেমের চতুর্থ লক্ষণ,—বিকাশ। প্রতিভাবান্ ও প্রেমিক, সহস্র প্রকার বিঘ্ন-বাধা সত্বেও কোন না কোন প্রকারে,

কখন না কখন জগতে ফুটিয়া উঠিবে। কালের বশে আর অদৃষ্টের দোষে, যদি সে মহাপুরুষের নশ্বর জীবন অল্পকাল মধ্যে লোপ পায়, তথাপি একটি অতি সামান্য ঘটনা হইতেই, সেই মৃত-মহাত্মার রোপিত অক্ষয়-বীজ, ধীরে ধীরে উপ্ত, অঙ্কুরিত ও কাণ্ডযুক্ত হইয়া, অক্ষয় ফল প্রদান করিবে।

প্রতিভা ও প্রেমের পঞ্চম লক্ষণ,—ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ। প্রতিভাবান্ ও প্রেমিকের সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যই অতি সামান্য ঘটনা হইতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণের নিকট যে বিষয় বা যে কথা অতি তুচ্ছ, সামান্য ও নগণ্য,—প্রতিভা ও প্রেম, অনেক সময়, তাহার উপরই ভিত্তিস্থাপন করে।

প্রকৃত প্রতিভাবান্ প্রেমিকপুরুষ,—কালে ভদ্রে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতিফলে এবং ইহজন্মের কঠোর সাধনায়, মানুষ প্রতিভা ও প্রেমের অধিকারী হয়। সংসারে, এরূপ ভাগ্যবান্ লোকও অতি বিরল।
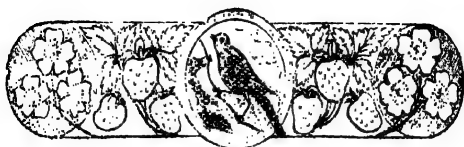
সাপ ও সয়তান

বলিহারী বাইবেলের কবি!—তোমার অনেক অনুশীলন ও সাধনার ফল,—সয়তান-চিত্রের অবতারণ। যে পাপ করে, সে তো পাপী; কিন্তু যে মূর্ত্তিমান পাপ,—পাপে যে গঠিত, পাপে যে বর্দ্ধিত, পাপেই যে লয়-প্রাপ্ত,—সুতরাং পাপই যার প্রাণ, তাহাকে তো পাপী বলিলে চলিবে না,—তাহার জন্য নূতন আখ্যার প্রয়োজন।—নহিলে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষার সৃষ্টি, সে ভাষা যে অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়!—তাই বাইবেলের কবি অনেক ভাবিয়া, অনেক চিন্তিয়া, অনেক অনুশীলন ও সাধনা করিয়া, সেই মূর্ত্তিমান পাপের নামকরণ করিলেন—সয়তান। *

এই সয়তান-চিত্র কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব, এবং এই চিত্রটিতে কবির অপূর্ব্ব ও অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য কবি মহামতি মিল্টন বাইবেলের এই সয়তান-চিত্রের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-তুলিকা বুলাইয়া, কাব্য-জগতে কি অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন,—ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠকের তাহা

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত "ভ্রস্তধর্ম্মী মানব"—নবজীবন।

অবিদিত নাই। * ফলতঃ, বাইবেলের কবি ও প্যারাডাইস্ লষ্টের কবি,—সয়তান সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ, তাহারই ছায়া অবলম্বনে প্রকটিত।

মহাকবির সৃষ্ট সয়তানের 'ছক'টি এইরূপ ;—

ঈশ্বর আলোক, সয়তান অন্ধকার। ঈশ্বর সুখ, সয়তান দুঃখ। ঈশ্বর শান্তি, সয়তান অশান্তি। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, সয়তান তাহার বিপরীত করিয়াছে। সয়তানের তাহাতে অন্য লাভ না থাকুক, সে তাহা দেখিবে না। ঈশ্বরের উজ্জ্বল চিত্রফলকে ঘন কালিমা ঢালিয়া দিয়াই সে পরিতৃপ্ত। সয়তান হিংসা, পাপ ও কামের সংমিশ্রণ। অথবা তাহার স্বরূপ, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা, একান্ত দুঃসাধ্য।

• •

ঈশ্বর এই পরিদৃশ্যমান্ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। মনুষ্যের আদি-পুরুষ,—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ হইলেন। তেমন রূপ—অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ও সৌকুমার্য্যে সমুজ্জ্বল—তেমন রূপ কেবল মনোমধ্যে অনুভব করিতে পারা যায়। আর সেই রূপের ভিতর কি অপূর্ব্ব সুন্দর হৃদয়!—পাপের মলিনতার অস্তিত্বও সেখানে নাই,—পুণ্যে ও পবিত্রতায় সে হৃদয় পরিপূর্ণ। আর সেই হৃদয়ের সেই যে সরলতা—তাহা কি নির্ম্মল, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ ও আবিলতা-শূন্য! এই 'কহকছুরিতপূর্ণ' সংসারে, তেমন সরলতা, তেমন পবিত্রতা, বুঝি, কল্পনারও অতীত। সন্ধ্যা-সমীরণ-কম্পিতা শ্যাম-পল্লবিনী কুসুমিতা লতিকার ন্যায় যেন সেই সরলতা মধুর সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করিতেছে। সেই আদি-পুরুষ নির্ব্বাক্ নির্নিমেষ

* Milton's Paradise Lost.

নেত্রে,—তাঁহারই যোগ্যা তাঁহার সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যময়ী, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। সেই লাবণ্যময়ী রমণীও, সেই অপূর্ব্ব রূপপ্রভায়-প্রদীপ্ত,—তাঁহার স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। সেই চারি চক্ষুর পলক বুঝি আর পড়ে না! সেই আদি-রমণীর কি সুন্দর নয়ন! নয়নে কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি! দৃষ্টিতে কি সারল্য ও প্রীতি-পবিত্রতা! প্রীতি-পবিত্রতায় কি নিরবচ্ছিন্ন বিমল প্রেম! মধুকর গুন্ গুন্ রবে, কমল-ভ্রমে, সেই সৌন্দর্য্যময়ীর মুখপানে ধাবিত হইতেছে; কুসুমিত তরুশাখায় বসিয়া, সেই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গ মধুর গান করিতেছে;—সে সকলই সুন্দর। সম্মুখে স্রোতস্বতী প্রবাহিতা; সেই স্বভাব-সুন্দরী আদি-রমণী স্রোতস্বতীর স্বচ্ছসলিলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন; দেখিতে দেখিতে আপন সৌন্দর্য্যে আপনি আত্ম-হারা হইতেছেন! সেই আদি-পুরুষের ললাটে প্রতিভার কিরণ সমুজ্জ্বল;—নয়নে পবিত্রতা, মুখে দিব্য জ্যোতি, অধরে মৃদু হাসি, হৃদয়ে পুণ্য!—আবার সেই শোভাময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সেই আদি-রমণীর সমগ্র অবয়বে প্রেম ও পবিত্রতা, শান্তি ও করুণা, দয়া ও ধর্ম্মজ্যোতি যুগপৎ প্রকটিত!—কি অপূর্ব্ব মিলন!

আবার দেখ;—সন্ধ্যার ক্রোড়ে নব-রবি অস্তগত হইল। স্বামী ও স্ত্রী আকাশপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য নাই,—অন্ধকার। ভাবিলেন, "এ আবার কি হইল! ঐ প্রখর আলোক সহসা নিবিল কেন? হায়, আর কি দেখিতে পাইব না?" তারপর রাত্রি শেষ হইল। প্রভাতে আবার পূর্ব্ব-গগনে রবির উদয় হইল। মহা উল্লাসে, প্রীতিপূর্ণনেত্রে,—স্বামী ও স্ত্রী সূর্য্যোদয় দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"ইহা কি সেই সূর্য্য,

না নূতন ?” আবার সন্ধ্যা হইল,—সূর্য্য অস্ত গেল ;—যথা সময়ে আবার প্রভাত আসিল,—প্রভাতের সহিত সূর্য্যও দেখা দিল।—তখন স্বামী স্ত্রী বুঝিলেন, সেই একই সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতেছে ;—কেবল দিবা ও রাত্রিতে দিন বিভক্ত হইতেছে মাত্র।

তখন মৃত্যু, জরা, শোক, তাপ—কিছুই নাই।

তারপর কবি দেখাইতেছেন, ঈশ্বরের এই মধুর সৃষ্টি দেখিয়া, সয়তানের হিংসা হইল। হিংসা তাহার পূর্ব্বাবধিই ছিল। ঈশ্বর স্বর্গের রাজা, সর্ব্বশক্তিমান্ ; সয়তান তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সুতরাং সে স্বর্গে এক মহা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। কিন্তু বিদ্রোহে পরাস্ত হইল। পরাস্ত হইয়া, কিসে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। যখন ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, সয়তান হিংসা চরিতার্থ জন্য ঈশ্বরের সেই সৃষ্টি বিলোপ করিতে সঙ্কল্প করিল। সৃষ্টির ধ্বংস না হউক,—আলোকে অন্ধকার, পুণ্যে পাপ, সরলতায় কপটতা মিশাইয়া দিয়া সয়তান আনন্দ অনুভব করিতে যত্নবান্ হইল। এই অপূর্ব্ব কুসুম-উদ্যান মরুভূমিতে পরিণত করিবার জন্য তাহার বড়ই জিদ্ বাড়িল। সৃষ্টির এই আলো ও শোভা তাহার চক্ষে অসহ্য হইল। যেমন শরতের আকাশ, অতি নির্ম্মল ও শুভ্র,—কোথাও কিছু নাই,—সহসা এক খণ্ড কালো মেঘ আসিয়া একটু একটু করিয়া সমগ্র আকাশ গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে,—সয়তানের গভীর হিংসা-দাবাগ্নিতেও তেমনি একটু একটু করিয়া এই পবিত্র কুসুম-উদ্যান দগ্ধ হইতে লাগিল। সয়তান সর্পের আকারে, সেই সরলতাময়ী আদি-রমণীকে ভুলাইয়া পাপ-স্পর্শ করাইল ; আদি রমণীও স্বামীকে সেই পাপে প্রলোভিত করিলেন।

কবি দেখাইলেন, সেই হইতেই মনুষ্য মধ্যে পাপ, অশান্তি, জরা ও মৃত্যু!

সয়তানের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

তারপর, কবি আরও দেখাইতেছেন;—

সয়তান ইহাতেও ক্ষান্ত নহে। মানুষ পাপের অন্ধকারে ডুবিয়াও এক একবার পুণ্যের আলোক দেখিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকে,—সয়তান সেই সুযোগে,—নিবিড় অন্ধকারে 'আলেয়ার' মতো আলো দেখাইয়া, মানুষকে আরও প্রলুব্ধ করে;—তাহাকে ঘোর অন্ধকারে—অধঃপতনের চরম সীমায় লইয়া যায়;—শেসে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

কবি শেষে বলিতেছেন,—এই সয়তান সর্ব্বদাই মানুষের মনের ভিতর উঁকি-ঝুকি মারিতেছে; সময় ও সুবিধা পাইলেই মানুষকে দংশন করে।

তাই বলিতেছিলাম, সয়তান-চরিত্রের উদ্ভাবনায়, প্রকৃতই বাইবেলের কবির বাহাদুরী আছে। মহাকবি মিল্‌টনের যে আজ জগৎ জুড়িয়া নাম, তাহার মূলে এই অমর কবি।—বাইবেলোক্ত সয়তানের ছায়া লইয়াই তাঁহার কাব্যচিত্র সম্পূর্ণ।

এইরূপ সয়তানধর্ম্মী জীব, এই সংসারক্ষেত্রের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। সয়তানকে কবিগণ সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সর্পের ন্যায় খল,—এই অনন্ত প্রাণিজগতে আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু সর্প-হৃদয় সয়তানধর্ম্মী মানুষ,—বুঝি, সেই সর্প অপেক্ষাও ভীষণ!—সয়তানের খলতা, বুঝি সর্পকেও পরাভব করে!

বুদ্ধিকৌশলে সর্পকেও বশীভূত করা যায়, কিন্তু সর্প-হৃদয়

মনুষ্যকে বশীভূত করা বড় শক্ত কথা। সাপের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, মন্ত্রগুণেও তাহাকে মুগ্ধ করা যায় ;—কিন্তু সর্প-হৃদয় সয়তানধর্ম্মী মানুষকে তুমি কি ঔষধে, কোন্ যাদুমন্ত্রে বশ করিবে? তা ছাড়া, এমনও শুনা গিয়াছে, কোন অত্যাচার না করিলে বা হিংসার উত্তেজক কোন লক্ষণ না দেখাইলে, কোন কোন কালসর্পও সময় বিশেষে জীবহিংসা করে না। সর্পের জীব-হিংসা,—অনেক সময় তাহার আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য। প্রাণভয়েই সে অনেক সময় অপরের প্রাণ হনন করে। বিশেষ, হিংসার আকরেই সর্পের জন্ম; সুতরাং হিংসাই তাহার স্বধর্ম্ম। এ হিসাবে, সাপের 'সাত খুন' মাপ আছে। কিন্তু তুমি মনুষ্যদেহ-ধারী, জ্ঞানবিবেকের অধিকারী, ভগবানের রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব,—তুমি কি কারণে, কোন্ যুক্তিতে সর্প অপেক্ষাও শতগুণ ভীষণ ও ভয়াবহ হও,—বলো দেখি? সাপের তো একটা 'নিশানা' আছে; সাপ বলিলেই লোকে সাত হাত তফাতে যায়; কিন্তু তুমি সয়তানধর্ম্মী মনুষ্য,—সর্প অপেক্ষাও শতগুণ হিংস্রক ও খলস্বভাব তুমি,—তোমাকে চিনিব কি প্রকারে? সর্পদংশনে ঔষধ আছে, মন্ত্র আছে, রোজাও আছে;—কিন্তু হে সয়তানধর্ম্মী নর-সর্প! তোমার দংশনে ঔষধ কৈ, মন্ত্র কৈ, রোজাই বা কৈ? সর্প যতই খল হউক, মনুষ্য-বুদ্ধির নিকট তাহাকে মাথা নোঙ্গাইতেই হইবে;—কিন্তু তুমি সয়তান-ধর্ম্মী মনুষ্য,—তোমাকে কি উপায়ে, কোন্ বুদ্ধিবলে মনুষ্য-সমাজ আঁটিয়া উঠিবে বলো? সাপ—সকলেরই জানা কথা যে, সাপ; কিন্তু তুমি যে সাপ + সয়তান,—দুই-ই। সুতরাং তুমি যথায় বিষবহ্নি উদ্গীরণ করো,—সেখানে আর কিছুতেই রক্ষা নাই,—সেখানকার সকলই জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হয়।

ঘা না খাইলে লোকে তোমাকে হঠাৎ চিনিবে কিরূপে বলো? বিশেষ তুমি কখন সাপ হইয়া কামড়াও, আবার কখন রোজা হইয়া ঝাড়াও;—তোমার ঐ সূক্ষ্মবুদ্ধির ভিতর সহসা প্রবেশ করে, সাধ্য কার? সত্য বলিতেছি, যদি তুমি শুধু সাপ হইতে, তাহা হইলে পৃথিবীর বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না; কিন্তু একাধারে তুমি সাপ+সয়তান হইয়া,—সাপের ষোল আনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া,—বেশীর ভাগে সয়তানের যাবতীয় বৃত্তিগুলি আয়ত্ত করিয়াছ!—সুতরাং চাই কি, আমি সাপকেও এক দিন কাল বিশ্বাস করিলেও করিতে পারি,—কিন্তু হে চৌদ্দপুয়া দেহধারী সয়তানধর্ম্মী মনুষ্য!—তোমার নামে আমি শিহরিয়া উঠি!

তুমিই দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া বারনারীর কেলিগৃহ নির্ম্মাণ করো; শান্তিময় সোণার সংসারকে তুমিই শ্মশানে পরিণত করিয়া থাকো; আর হে জগতের প্রভা-শোভা-আভা-বিভা-আলোক-অসহিষ্ণু,—শ্রী-কাতর,—সর্প+সয়তান-ধর্ম্মী মনুষ্য,—তুমিই বড় সাধের নন্দনকানন শুকাইয়া মারিয়া ফেলিয়া, তথায় মরুভূমির অনন্ত বালুকাস্তূপ সঞ্চয় করতঃ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকো!—তোমাকে আমরা কোন্ নামে অভিহিত করিব, বলো?

দেখ, সোণার সীতা বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন,—তোমার মহিমায়; রামরূপী নারায়ণ রাজতক্তে না বসিয়া জটাবল্কল পরিধান করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন,—মূলে তোমার শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়া; পাঞ্চালনন্দিনী রজস্বলা-দশায় কেশাকর্ষণ সহকারে পাপ কৌরব-সভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তাহার মূলেও তুমি; পঞ্চপাণ্ডব যে অজ্ঞাতবাসে অতি কষ্টে প্রতিপল যুগসম অতিবাহিত

করিয়া জীয়ন্তে মরিয়া ছিলেন,—তাহাতেও তোমার প্রভাব দেখিতে পাই! তুমি কখন পুরুষবেশে মারিচ হইয়া, 'মায়ামৃগ' সাজিয়া, লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকনন্দিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করো; আবার কখন নারীবেশে মন্থরা সাজিয়া কৈকেয়ীর হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালিয়া দাও!—কখন তুমি শকুনিরূপী মন্ত্রী হইয়া মতিচ্ছন্ন নৃপতিকে পাপ-মন্ত্রে দীক্ষিত করো; আবার কখন বা পুতনা-রূপিণী রাক্ষসী হইয়া মোহিনী বেশে হেসে হেসে পৌরস্ত্রী কুল-কামিনীগণকে মুগ্ধ করো! তাহাতেই বলিতেছিলাম, হে সয়তানধর্ম্মী উদ্ভট জীব!—তুমি পুরুষ কি নারী, দেবতা কি দানব, ডাকিনী কি সাপিনী,—তোমায় আমি চিনিলাম না!

কবিগণ কাব্যে ও সাহিত্যে তোমাকে লইয়া অশেষপ্রকারে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন;—তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই; তাই তোমার যথোচিত আখ্যাও দিতে পারেন নাই। সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতে পাই। সেই বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ হইতে অধুনাতন নব্য-তন্ত্রের এই 'উন্নতির' যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে তোমার একটি ইতিহাস আছে। হিন্দুর অধঃপতন, ম্লেচ্ছের উত্থান, ম্লেচ্ছের পতন, পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয়,—সকলই অল্পবিস্তর তোমার সাহায্যেই হইয়াছে। কথাটা এই যে, যখনই কোন দেশ বা রাজ্য এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে গিয়াছে, প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইয়াছে,—আত্ম-প্রতিষ্ঠা-অভিলাষী, অকৃতজ্ঞ, নীচাশয় কোন ব্যক্তি অতি গোপনে তাহার মূলে সহায়তা করিয়াছে! হয়ত পরিণামে তাহার ইষ্টলাভ হয় নাই, তথাপি সে সেই কার্য্যে সহায়তার জন্য আনন্দ অনুভব ভিন্ন অনুতাপ করে নাই। যে কেবল পাপের জন্য পাপ করে,

সে সয়তান ভিন্ন আর কি? | কিন্তু—এ হিসাবে, তুমি একের বন্ধু, অন্যের শত্রু। অপরেরও যে বন্ধু হও, তাহা স্বইচ্ছায় নহে, এবং অপরের বন্ধু হওয়াও তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তুমি যে মনে-জ্ঞানে জানিয়া-শুনিয়া কাহারও ইষ্টসাধন করিতে পারো,—কাহারও শ্রী সহিতে পারো,—এ কথা তুমি হলপ করিয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না। তুমি আপনার আলোকেই আপনি শঙ্কিত হও; আপনার ইষ্টসাধন করিতে গিয়া পাছে অন্যের এক চুল ইষ্ট হয়, এই ভাবনায় তুমি অনেক সময় আত্মইষ্টও সিদ্ধ করো না;—এমত অবস্থায় যে, তুমি লোকের বন্ধু হও, তাহা কেবলমাত্র আপন মতলব-সিদ্ধির জন্য। যাই সে মতলব সিদ্ধ হয়, অমনি তুমি সেই বন্ধুর বুকের রক্ত চুষিয়া খাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকো!—এমনই তোমার বন্ধুত্বের বালাই!

পাঠক, সয়তানধর্ম্মী, সেই "দুই ভায়ের" গল্প কি শুন নাই?—একদিন গুমটগ্রীষ্মে, ঠিক দ্বিপ্রহরে, দুই ভাই একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি পার হইয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে একটিমাত্র জলপূর্ণ কলস। যখন উভয়েই পিপাসায় বড় কাতর হইয়া পড়িল, তখন উভয়েই একটু একটু জলপান করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই বচসা উপস্থিত হইল যে, কে অগ্রে জল-পান করিবে? বচসা যখন বড়ই বাড়িয়া উঠিল, তখন হঠাৎ, সেই যত্নসঞ্চিত,—বড় আশার সামগ্রী,—গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে মরুভূমি মাঝে সেই পূর্ব্বসঞ্চিত তৃষ্ণার জলটুকু,—কলসী গড়াইয়া পড়িয়া গেল! চক্ষের নিমেষে সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি সেই জলটুকু শুষিয়া হইল।—সে শোষণে একটু চোঁ শব্দও হইল না। তখন দুই ভায়ের চৈতন্য হইল। 'কে অগ্রে পান করিবে'

এই লইয়াই বিবাদ ;—কিন্তু এখন মূলে, সে পানের আশাই লোপ পাইল ! তখন উভয়ে অতি কাতরভাবে, সঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই জলপতিত স্থানটুকু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বুঝি, তাহাদের মনে হইতে লাগিল,—"এই বালুকাভ্যন্তর হইতে কি পুনরায় সেই হারানিধি পাওয়া যায় না ? কি করিলে এখন এই বালির রাশি নিঙ্গাড়িয়া জল বাহির করিতে পারা যায় ?"

যখন দুই ভায়ের মনের অবস্থা এইরূপ, তখন সেই জল-পতিত স্থানটুকু হইতে ঈষৎ ধূম উত্থিত হইল। ক্রমেই সে ধূম ঘন আকার ধারণ করিল। তখন দুই ভাই ভীত, চকিত ও বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেই বালুকা স্থান সহসা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি গহ্বরে পরিণত হইল, এবং সেই গহ্বর হইতে এক প্রকাণ্ড ভয়াবহ-মূর্ত্তি দৈত্য উত্থিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, দুই ভায়ের আত্মাপুরুষ একেবারে উড়িয়া গেল ; প্রাণভয়ে তাহারা বাত্যান্দোলিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। দৈত্য তাহাদিগের ভয় দূরীকরণার্থ, যতদূর সম্ভব, ধীরভাবে,—পরন্তু সেই দৈত্যের গলার আওয়াঁজে কহিল, "তোমাদের কোন ভয় নাই ; আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি,—যথা ইচ্ছা বর গ্রহণ করো। কিন্তু দেখ, আমার বরের বিশেষত্ব এই,—তোমাদের দুই ভায়ের মধ্যে, যে অগ্রে আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ করিবে। তা প্রথম ব্যক্তি তার মনের যতখানি বাসনা,—সবটাই প্রার্থনা করিতে পারে ;—সে প্রার্থনা যতই দুঃসাধ্য হউক, আমি তাহা পূর্ণ করিব ; কিন্তু এ কথা মনে রাখিও, 'দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় প্রথম প্রার্থনাকারীর দ্বিগুণ ফল পাইবে।"

মহা সমস্যা পড়িয়া গেল। উপায় কি! হ'লো কি!—তাইতো, এখন 'দুই ভাই' করে কি? কে আপনার দুনো গণ্ডা ছাড়িয়া, প্রথমে বর প্রার্থনা করে বলো? চাহিলেই,—এক, আর না চাহিলেই যে দুই! এখন উপায় কি? বড় ভাই ভাবিতেছে, "আচ্ছা, দৈত্য যখন বলিতেছে, যা প্রার্থনা করিব, তাই দিবে,—তা ভালো,—আমি কেন আগে যে-কোন-একটা খুব বড় বর লই না?" পরমুহূর্ত্তেই ভাবিতেছে, "উঁহুঁ! তা হইবে না,—আমি আগে চাই, আর ছোট ভাই আমার কিনা অমনি না চাহিয়া, ধাঁ করিয়া আমার দুনো লাভ করিয়া বসেন!—না, তা হইবে না! ভালো, দেখি না কেন, ভায়াই আমার আগে কি চান!"

বলা বাহুল্য, সেই ছোট ভাইও জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভাবিতেছে,—"বেশ তো, ধাঁ করিয়া আমি কেন সাত রাজার ধন চাহিয়া বসি না! (একটু ভাবিয়া) উহুঁ, তাহা হইলে দাদা যে চৌদ্দ রাজার ধন পাইয়া বসিবে!—না, তা হইবে না। তবে কি চাই?—রাজ্য, রাজকন্যা, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব, বা আর কিছু? উঁহু, দাদা যে তা হ'লে, না চাঁহিয়া দুনো লাভ করিয়া বসিবে! না,—আমার চাওয়া হইল না!"

কনিষ্ঠ তো দাদার ভাই বটে; সুতরাং সেও জ্যেষ্ঠের মুখ চাহিয়া রহিল। তখন দুইজনে আকাশ পাতাল অনেক ভাবিল,—কিছুতেই কেহ অগ্রে বর প্রার্থনা করিতে পারিল না! পারিবে কিরূপে? অগ্রে প্রার্থনা করিলেই যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় দ্বিগুণ লাভ করিয়া বসিবে!

দৈত্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল; উভয়কে ভাবিতে অনেকক্ষণ সময় দিল; শেষ যখন দেখিল, উভয়ের মনের ভিতর সমুদ্র-

মন্থনের হলাহল উত্থিত হইয়াছে, তখন অন্তরে একটু হাসিয়া, অথচ মুখে কিছু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া কহিল, "তবে, তোমরা কেহই কিছু চাহিলে না ?—আমি চলিলাম। কি আশ্চর্য্য ! লোকে কত সাধ্যসাধনা করিয়া তবে একটুকু মাত্র বর লাভ করে, আর আমি অযাচিত ভাবে তোমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিতেছি, 'যথা ইচ্ছা বর গ্রহণ করো ;—সে বর যত দুর্লভ হউক, আমি পূরণ করিব ;'—তা তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেহই, এতক্ষণের মধ্যেও কোনরূপ বর চাহিলে না ?"

বলা বাহুল্য, দৈত্য পরমুহূর্ত্তেই আবার বর-প্রার্থনার নিয়মটা পুনরুল্লেখ করিয়া কহিল, "কিন্তু একথা অবশ্য তোমাদের মনে আছে, যে কিছু না চাহিবে, সে প্রথম-প্রার্থনাকারীর দ্বিগুণ বস্তু বিনা প্রার্থনায় লাভ করিবে !"

নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে, সেই মধ্যাহ্নকালীন নিদাঘতপনতাপঝলসিত মরুভূমির সেই অনন্ত বালুকারাশি, আর সহোদরদ্বয়ের মনের ভিতরও সেই ভীষণ জ্বালাময়,—সর্প হইতেও বিষম ক্রূর হিংসার আগুন ;—দুই আগুনে মিশিয়া নরকের আগুন সৃষ্টি করিল !—তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দৈত্যকে কহিল, "দেব ! আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই,—কেবল আমার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া আমাকে কাণা করিয়া দাও !—আমার এক চক্ষু নষ্ট হইলে দাদার তো দুই চক্ষু নষ্ট হইবে ?"

দৈত্য মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া, অথচ একটু চমকিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু তাহার মনে চিরদিন এই ঘোর সন্দেহ রহিয়া গেল যে,—"সাপ কি মানুষ অপেক্ষা অধিকতর হিংস্রক ?"

দেখ, যে স্বার্থের খাতিরে অর্থাৎ আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য, অন্যের একটু অনিষ্ট করে, সয়তান-ধর্ম্মী মানুষের হিসাবে,—সে দেবতা! আপনারই হউক আর পরেরই হউক, তার তো একটা 'ইষ্ট'-সিদ্ধির কল্পনাও থাকে;—কিন্তু সর্প-হৃদয়, সয়তান-ধর্ম্মী, মানুষের-চামড়া-গায়ে-দেওয়া জীবগুলা যে, আত্ম-ইষ্ট তথা জগতের ইষ্ট-সাধনের ধারণাও করিতে পারে না;—কাজে করা তো দূরের কথা! বস্তুতঃ, আপনার ইষ্টানিষ্টের প্রতিও সয়তানধর্ম্মীর দৃষ্টি থাকে না, এবং সে দৃষ্টি সে রাখেও না। পরের অমঙ্গল সাধনই,—সয়তানের একমাত্র কার্য্য। নিজের যদি তাহাতে কিছু লাভ থাকে, তো সে এই যে, পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে!

এ শ্রেণীর জীবের একজনের একটিমাত্র কাহিনী এখানে উল্লেখ করিব। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,—নিজের কোন লাভালাভ নাই,—কিন্তু কোথাও কাহারও বিবাহের কথা শুনিলেই, যে কোন উপায়ে হউক, তাহা ভাঙ্গিয়া দিত। অধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইলে, পীড়িতা কন্যার পথ্য বিক্রয় করিয়াও, রাহা-খরচ জুটাইয়া সেখানে গমন করিত, এবং কল্পিত মিথ্যা কথা আরোপ করিয়া বরপক্ষে বা কন্যা-পক্ষে কোনরূপ একটা কুৎসিত কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ করিত, তাহার ফলে সহজেই সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইত। ব্রাহ্মণের মৃত্যু-কালে আমরা তাহাকে তাহার এই স্বভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল, "কি জানি, বাবা! কেহ বিবাহ করিয়া সুখে ঘর-সংসার করে, তাহা আমার প্রাণে সহিত না;—তাই সকল স্থানে ঐরূপে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বেড়াইয়াছি।"

ব্রাহ্মণের ন্যায় অনেকেই যে, এমন "নিষ্কাম পরোপকারী"

জীব এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহা সংসার-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তির অবিদিত নাই।

দেখ, দেখ,—ঐ যে কুঞ্চিত কটাক্ষ, বক্র-দৃষ্টি,—কু-চিন্তায় মুখখানা সদাই বিরক্তিপূর্ণ,—'ত্রিবক্র'রূপী জীবটি,—মুখে মধু হৃদে বিষ লইয়া, মিছরির ছুরিখানি শানাইয়া, ঈষৎ মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া, তোমার সঙ্গ লইয়াছে,—যদি তোমার একটুখানিও সংসারাভিজ্ঞতা থাকে, তবে তুমি ও-জীবটিকে তোমার ত্রিসীমানায়ও আসিতে দিবে না! সত্য বলিতেছি, উহার নিশ্বাসে বিষের বাতাস বহে; উহার ঈষন্মাত্র চোখ-মুখের ইসারায় নরকের আগুন জলিয়া উঠে; আর উহার অন্তস্তলস্পর্শী, অগাধ অর্থসমন্বিত,—ঐ "হুঁঃ" "না" "উঃ" প্রভৃতি এক আধটি কথায় বিষম অনর্থ,—মনস্তাপ, রক্তপাত, অপঘাত পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। সংসার, সমাজ, সাহিত্য,—স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে।

প্রকৃতিদত্ত কি একটা মহাব্যাধি লইয়া ইহারা পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সয়তান-ধর্ম্মী মানবের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব,—পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। অদৃষ্ট বড় বক্র না হইলে, মানুষ বক্র হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাপ যে এত বক্র, তাহারও একটা সাফাই আছে; কিন্তু সয়তানধর্ম্মী জীবের সাফাই, বোধ করি তুমি কিছুতেই দিতে পারিবে না। তাই বলিয়াছি, আমি সাপকেও বরং বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু সয়তানধর্ম্মী মানুষকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

কবিতা

প্রকৃত কবিত্ব স্বর্গীয় বস্তু। খাঁটী কবিত্ব-সুধাপানে মানুষ অমর হয়। আর যিনি এই পরম পদার্থের উপাসক, সংসারের শত দুঃখেও তিনি বিচলিত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। কবিতা—শোভাময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী, প্রাণময়ী। কবিতা—শক্তিময়ী, আনন্দময়ী, করুণাময়ী। কবিতা—মায়াময়ী, দয়াময়ী, প্রেমময়ী। কবিতা—আলোকময়ী, লীলাময়ী, বৈচিত্র্যময়ী। এত গুণ ও এত শক্তি যাতে, সে জিনিস হেলা-ফেলার জিনিস নয়,—সে জিনিসের আদর ও গৌরব করিতে হইলে, নিজেরও অন্ততঃ কতকটা সুশিক্ষিত, উন্নত-হৃদয় ও সৌভাগ্যবান্ হইবার আবশ্যক হয়।

যে যত বড় 'পতিত' বা পাষণ্ড হউক না কেন,—আংশিকরূপেও তাহাকে কবির হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। হৃদয়ের, যে কোন একটা কোমল বৃত্তি,—স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, মানুষমাত্রেরই একটু-না-একটু থাকিবেই থাকিবে।—হাঁ, থাকিতেই হইবে। নহিলে, বিধাতার সৃষ্টি থাকিত না। তবে যে, সকলে প্রকৃত কবি হইতে পারে না, তাহার কারণ, সকলেরই কিছু পূর্ব্বজন্মের বিশেষ সুকৃতি ও ইহজন্মের দুর্জ্জয় সাধনা থাকে

না;—সকলেরই কিছু তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সার্ব্বজনীন সহানুভূতি, প্রচুর আন্তরিকতা, গভীর প্রেম-প্রবণতা এবং বহুভাবপূর্ণ লিপিকুশলতা থাকে না। একাধারে এই সকল গুণ, যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি সেই পরিমাণে কৃতিত্বলাভ করিয়া কবি-পদবাচ্য হন।

নহিলে, সোজা কথায় বলিতে হইলে, এ সংসারে কবি নয় কে? এই হাসি-কান্নাময় সংসারে, জন্মিয়া অবধি, কে না এক দিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছে, কিংবা মন খুলিয়া হাসিয়াছে? হাসিটাও না হয় বরং তর্কের খাতিরে একদিনকাল চাপা থাকিতে পারে,—কিন্তু কান্না? তা সে কথাটা আর আমাকে বড় বেশী পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে না,—পাঠক মহাশয়গণ একবার নিজ নিজ জীবনের পানে তাকাইয়া দেখিবেন।

অহো! এই জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল,—আধি-ব্যাধি-পাপ-তাপময় সংসারে, জন্মাবধি, না কাঁদিয়াছে কে? কে সে ভাগ্যবান্,—যে একদিন না অরুন্তুদ ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়া, আপন দুর্ব্বহ জীবনের অবসান প্রার্থনা করিয়াছে? যদি এ হেন ভাগ্যবান কেহ থাকেন, তিনি মানুষ নহেন—দেবতা, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

সেদিন একখানা কাগজে পড়িতেছিলাম,—একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—"মানুষ যে মরে,—সে কেবল মরণ কামনা করে বলিয়া,—মৃত্যুর ভাবনা ভাবে বলিয়া;—নহিলে মানুষ অমর হইতে পারিত।" কথাটার আর কোন মূল্য না থাক্, ইহা ঠিক যে, মানুষ চিরদিন পুরাতন লইয়া থাকিতে ভালবাসে না,—এক-ঘেয়ে, একটানা জীবন ক্রমেই তাহার কাছে বড় বেশী ভারবহ বোধ হয়,—'নূতন দেখিব, নূতন পাইব, মরণেই বুঝি সুখ'—এই রকম একটা ভাবনা বুঝি তাহার মনের মধ্যে কখন

উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে, আর সেই অবস্থায় সে তখন আপনমনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে থাকে,—'কোথা তুমি, হে জীব-জীবন!—কোথা তুমি, নিখিল-নির্ভর! কোথা তুমি, হে মহাদর্শ! চির-দিন কি তোমায় আমায় প্রভেদ থাকিব? এ অভেদে প্রভেদ কি ঘুচিবে না? তোমার সহিত কি আমার মিলন হইবে না?"—এই রকম একটা কান্নার সুর, কখন জ্ঞাতসারে এবং কখন বা অজ্ঞাত-সারে, মানুষের মর্ম্মস্থলে বাজিতে থাকে। ইহাকে যা খুসি বলিতে হয় বলো,—কিন্তু কথাটা খাঁটী।

দেখ, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়, জীবনের সেই প্রথম মুহূর্ত্তের সেই প্রথম কান্না,—আর শেষ দিনে, বিদায়ের কালে—সেই শেষকান্না,—ভালো করিয়া, 'ছকে' মিলাইয়া দেখ,—মধ্যকার ঘটনাগুলি যেন একটা দুর্জ্ঞেয় যাদুমন্ত্র!—অথচ আবার একটু ভালো করিয়া দেখ,—বুঝিবে, সেই একই সারি-গান,—সেই একই কান্নার সুর,—সারাটা জীবন ব্যাপিয়া, তোমার হৃদয়ের উপর কি প্রবল আধিপত্য করিয়া গেল!

সেই জন্যই না আদিকবি—মহাকবির মুখনিঃসৃত—করুণরস-পূর্ণ সেই আদি শ্লোক,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

মহাকবি মানসনেত্রে যেন মূর্ত্তিমতী করুণাকে দেখিয়া,—চরাচর বিশ্বের ক্রন্দনের সুর সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া,—হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে, যেন এই প্রথম কান্না কাঁদিলেন, এবং তারপর সেই সুরে অপূর্ব্ব রামচরিত লিখিয়া, জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন!

আর হাসি?—যে হাসিতে সুধা ক্ষরে,—যে হাসি দেখিয়া

স্বর্গের কথা মনে পড়ে,—যে হাসিতে অনাবিল, শুভ্র, শান্ত, পবিত্র হৃদয়জ্যোতি ফুটিয়া উঠে;—ভগবদ্ভক্ত পরম প্রেমিক যে হাসির গুণে সেই রসরাজ, শ্রীরাসশেখর সচ্চিদানন্দের অপূর্ব্ব লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হন;—জীবন্মুক্ত পুরুষ যে হাসিতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে একটা মায়ার খেলা ভাবিয়া, সদানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন,—সেই স্বর্গীয় আসক্তিহীন হাস্যও কি, এই কবিতা হইতে উদ্ভূত নহে? এই কবিতার মূলে কি, ভগবৎ-প্রেমের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না?

বড় দুঃখ হয়,—এ হেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বস্তুকে, লোকে এখন হেলা-ফেলার জিনিস মনে করে! প্রখর বিজ্ঞানালোকে পাশ্চাত্য-জগতে রব উঠিয়াছে যে, বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত কবিতাও ক্রমে ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবে;—আমরা 'শিক্ষিত' বাঙ্গালী,—কথাটা না বুঝিয়া, হৃদয়ে সবটা ধারণা না করিয়া, অম্লানবদনে অমনি তাহার প্রতিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়াছি! কিন্তু, কথাটা কি ঠিক?

না, এ কথা আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কবিতার উৎপত্তি, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও অনন্তকাল-স্থায়িনী হইবে। মানুষ যত দিন মানুষ থাকিবে, অথবা মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বলাভ করিবে, তত দিন কবিতাও সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতে থাকিবে। এবং সেই সঙ্গে তাহার শোভা, শ্রী, সৌন্দর্য্য ও স্ফূর্ত্তি—সম্যক্‌রূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা সত্য ও সুন্দর, যাহা সার ও শুভপ্রদ, তাহাই কবিতা,—এবং তাহার অনুশীলন করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এই অনন্ত জীবজন্তুপরিপূরিত প্রাণি-জগৎ,—এই অসংখ্য নদ-

নদী-সাগর-ভূধর-অরণ্যময় জল ও স্থল,—এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র পূর্ণ উদার আকাশ,—এই অপূর্ব্ব শোভার ভাণ্ডার শস্যশ্যামলা মেদিনী,—এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—যতদিন ইহার স্থিতি, ততদিন কবিতারও স্থিতি। ইহাও ছাড়িয়া দাও,—একবার ভাই তোমার অন্তর্জ্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করো,—তোমার অন্তর্নিহিত স্নেহ প্রেম ভালবাসা,—পক্ষান্তরে শোক বিরহ মর্ম্মকাতরতা,—তোমার ধর্ম্ম,—তোমার মনুষ্যত্ব,—কোন্ দিকে তুমি কবিতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে ভাই? ভাবময়ী এই পৃথিবীতে বাস করিয়া,—কখন মহত্ত্বের উচ্চশিখরে উঠিয়া, কখন বা অবস্থাধীনে অবনতির গহ্বরে লুটিয়া,—ভাবময়ী কবিতার অস্তিত্বলোপের কল্পনাও তুমি করিতে পারো না,—এ কথা নিশ্চিত জানিও।

তার পর ধরো,—তোমার সমাজ, বৈষয়িক ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় ইত্যাদি;—বেশ কথা। কিন্তু ভাই! কবিতা ভিন্ন সর্ব্বাগ্রে কে তোমায় মানুষ করিবে? কে তোমায় দয়া, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মোহনমন্ত্রে আহ্বান করিবে? এবং কে-ই বা তোমাকে প্রকৃত পুরুষ-সিংহের ন্যায় মহৎকার্য্যে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিতে অগ্রসর হইবে? অগ্রে, তুমিই যদি না মানুষ হইলে, তো তোমার সমাজ, ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায়—টিকিবে কি প্রকারে? তাই বলি ভাই, প্রকৃত কবিতাকে পূজা করো, এবং সেই গৌরবে তুমি গৌরবান্বিত হও। তোমার বহির্জ্জগৎ,—তোমার বাহিরের ঐ কল-কব্জা, বেলুন-বাষ্পরথ প্রভৃতি খুটীনাটী এবং কড়া-ক্রান্তি-সন-তারিখ-হিসাববিশিষ্ট কেতাবতীবিদ্যা,—জীবিকা-অর্জ্জনের একটা প্রধান পন্থা বটে, কিন্তু চিত্তের পরিতুষ্টি করিতে, আত্মার আহার যোগাইতে, তোমাকে কবিতার

অনুশীলন করিতেই হইবে। ছন্দোময় সুরলয়ে-গাঁথা কেতাবী-কবিতা না পড়ো,—তোমাকে মনে মনে সেই বিশ্বেশ্বরের বিশাল কার্য্য-কবিতার,—এই অনন্ত বিশ্বের মহিমা,—ধ্যান করিতেই হইবে। নহিলে, ভাই! তুমি মানুষই থাকিবে না,—দেবত্বলাভ তো দূরের কথা!

এইরূপ কবিতার যিনি আলোচনা করেন, তিনিই প্রকৃত কবি। তাঁহার সৃষ্টি,—সেই বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টির অন্যতম অংশ। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া, কবি নিজেও কৃতার্থ হন এবং জগতকেও কৃতার্থ করেন। সুতরাং কবিই প্রকৃত লোকশিক্ষক, এবং কবিতার অনুশীলনই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।—এ ধর্ম্ম কি কখন লোপ পায়?

স্বপ্ন ও জাগরণ

একবার হৃদয়ে এস, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখি। তুমি কেমন, তোমার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিলাম না; তোমায় কখন পাইব কিনা, তাহা জানি না; তোমায় পাওয়া যায় কিনা, তাহাও জানি না;—তবু সাধ, তুমি হৃদয়ে এস, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি! এ হৃদয় বড় অশান্ত, বাত্যান্দোলিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ নিতান্ত অস্থির;—এ উদ্বেলিত, তরঙ্গায়িত, আন্দোলিত হৃদয়ে তুমি একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য অধিষ্ঠিত হও;—দরিয়ার এ তুমুল তুফান মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষান্ত হউক;—আমি সেই অবসরে একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই!

তোমায় কেবল দেখিতে সাধ, অন্য সাধ মিটিবে না জানিয়া, সে আশা করি নাই। এ চর্ম্মচক্ষে তোমায় দেখিতে পাইব না; অন্তরের চক্ষু তুমিই ফুটাইয়া দাও, সেই দিব্যচক্ষে তোমায় দেখিয়া কৃতার্থ হই। তোমায় দেখিতে হয়, কি হৃদয়ে রাখিয়া প্রাণ জুড়াইতে হয়, তাহা ভালো করিয়া বুঝি নাই। কিন্তু মনে হয়, তোমায় দেখা যায়; তোমায় দেখিতে দেখিতে চিত্ত তোমাতে ভরিয়া উঠে; তখন তোমাতে ডুবিয়া আত্মহারা হই। তখন এই

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-ভরা, এই বৃক্ষবল্লরী-ফুল-পত্র-সুশোভিতা, এই অরণ্য-জীবজন্তু-সঙ্কুলা, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে লাবণ্যময়ী এই পৃথিবী ভুলিয়া যাই! তখন জননীর অযাচিত স্নেহ, ভ্রাতা-ভগিনীর অপার্থিব ভালবাসা, প্রেমময়ী প্রিয়তমার মধুর প্রেম-সম্ভাষণ,—সকলই বিস্মৃত হই! তখন পৃথিবীর যশ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের উন্মত্ত আবেগ—সকলই ভুলিয়া যাই! তখন বাহিরের চক্ষু অন্ধ, বাহিরের কর্ণ বধির,—বাহিরের যদি কিছু চেতনা থাকে, তবে তাহা সমস্তই বিলুপ্ত! তেমনই অবস্থায়,—সুখ কি দুঃখ, আশা কি ভয়, আবেগ কি উচ্ছ্বাস—কিছুই বুঝি না; কেবল প্রাণের অতি নিভৃত প্রদেশে বিমল আনন্দ উপভোগ করি! সেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া, যখন আবার এই পৃথিবী পানে চাহিয়া দেখি,—দেখি, যেন পৃথিবী আরও সুন্দরী, আরও শোভাময়ী, আরও করুণাময়ী!

আজি আর পৃথিবীর সে হাসিমুখ দেখিতে পাই না;—স্বপ্নে যেন সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে! যেখানে কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য, কত অব্যক্ত ভাবরাশি দেখিয়াছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি,—সেখানে আজি আর সে সকল দেখিতে পাই না! কোথায় গেল, কেন গেল, গেল তো আবার কবে আসিবে, তাহাই ভাবি। ভাবি, কিন্তু ভাবিতে ভাবিতেই দিন ফুরাইল;—যেটি যেমন দেখিয়াছি, সেটি আর তেমন দেখা হইল না!

যখন দেখিয়াছিলাম, তখন কি সে জীবনের উষাকাল?—সে উষা কি নির্ম্মল, কি প্রশান্ত, কি শান্তিপূর্ণ! তখন উদার হৃদয়ে কি বিশ্বব্যাপী মহাপ্রেম, হিংসাশূন্য সরল নয়নে কি প্রীতি-পবি-

ভ্রতা, চিন্তাহীন নির্ম্মল ললাটে কি প্রতিভা-কিরণ, ভক্তিপূর্ণ সরল প্রাণে কি প্রগাঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল! কাহিনী শুনিতাম;—কত দেবলোক, কত ইন্দ্র-সভা, মন্দাকিনী-তটে কত পারিজাত-তরু কত অমরাপুরী, কত দেববালা, কত গান, কত হাসি, কত ফুল;—সে সকলই সুন্দর, সকলই মধুর, সকলই অপূর্ব্ব! একে একে মিলাইয়া দেখিতাম;—দেখিতাম, এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবীও অপূর্ব্ব ও অলৌকিক শোভায় শোভাময়ী! পরিস্ফুট বসন্ত-পূর্ণিমা-নিশীথে সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র, গভীর অমানিশায় অগণ্য অসংখ্য তারকা শ্রেণী, সতীর ললাটে সিন্দূর-বিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল উষার ললাটে বালার্ক-কিরণ,—এ সকলই সুন্দর! সুনীল আকাশতলে সুনীল সফেন মহাকায় মহাসমুদ্র, তটপ্রদেশে তুষার-মণ্ডিত গগনস্পর্শী মহাকায় পর্ব্বতশ্রেণী, পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পাদপ-সঙ্কুল গহন বন,—এ সকলই সুন্দর! স্তবকাভিনম্র অশোক-তরু, সহকার-আশ্রয়িণী মারুত-দোদুল্যমানা নব-কুসুমিতা মাধবী-বল্লরী, কল্লোলিনী স্রোত-স্বতী, কুমুদ-কহ্লার-পরিব্যাপ্ত সরোবর, বিহগ-সঙ্গীত-মুখরিত কুসুমকুঞ্জ,—এ সকলই সুন্দর! অগণ্য-প্রাসাদ-পরিপূর্ণ নগর, অসংখ্য জীবজন্তুর অপূর্ব্ব নিনাদে পরিপূর্ণ দেশ-প্রদেশ, অগণ্য অসংখ্য লোকের একত্র বিরাট সম্মিলন,—এ সকলই সুন্দর! শত শত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে শত শত শাসনপ্রণালী, শাসনে বিচার, বিচারে ন্যায়,—রাজার প্রজা-বাৎসল্য, প্রজার রাজভক্তি, শিল্প-বাণিজ্যে দেশ উন্নত, দেশহিতৈষিতায় মানুষ আত্মত্যাগী, ধর্ম্মে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কাব্যে মানুষ অনুরক্ত,—এ সকলই সুন্দর! সর্ব্বত্রই প্রেম, প্রেমে প্রতিদান, প্রতিদানে আত্মবিসর্জ্জন;—সর্ব্বত্রই সখ্য ও প্রীতি, ভক্তি ও দয়া, ধর্ম্ম ও দান;—এ সকলই সুন্দর!

এই এমনই সৌন্দর্য্যের হাটে থাকিয়া কিছুই কুৎসিত দেখিতাম না। চক্ষু যাহা দেখিত, তাহাই সুন্দর; হৃদয় যাহা পাইত, তাহাই সুন্দর;—তখন একটা সৌন্দর্য্যের নেশায় মাতোয়ারা ছিলাম। বাহ্য-জগতে অন্তরের প্রতিকৃতি দেখিতাম। যদি হাসিতে হাসিতে চাহিতাম, দেখিতাম, সমগ্র জগতে সেই হাসির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে; পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই হাসির লহরী ছুটিয়াছে! যদি কাঁদিতাম,—অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিতাম, সর্ব্বত্রই বিষাদের চিহ্ন দেদীপ্যমান! তখন অন্তরে বাহিরে কি একটা মহাযোগ ছিল। আজি সে যোগ ভাঙ্গিয়াছে; তাই সে হাস্যময়ী, করুণাময়ী, শোভাময়ী পৃথিবী আর দেখিতে পাই না; তাই এ মৃণ্ময় আধারে সে চিন্ময়ী মূর্ত্তি আর দেখিতে পাই না!

অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্য-জগতের মাঝে একটা সেতু ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই উভয়ে আজ এত পৃথক হইয়া পড়িয়াছি! পার্থক্য এতদূর বাড়িয়াছে যে, উভয়ে যেন উভয়ের একান্ত অপরিচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই বৃক্ষ, সেই লতা, সেই গিরি, সেই নদী, সেই হাসি, সেই গান,—সেই সবই, কিন্তু সেই অন্তর আর নাই;—যে চক্ষে সে সকলই সুন্দর দেখিতাম, সে চক্ষু আর নাই; যে সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইতাম, সে সৌন্দর্য্য-বোধ আর নাই!

বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে; সারল্য অন্তর্হিত হইয়াছে; ভক্তি বিশুষ্ক হইয়াছে;—সেতু ভাঙ্গিয়াছে!

দরিয়ায় আজি তুমুল তুফান! হু-হু-হু বাতাস বহিতেছে,—হৃদয় আলোড়িত, উৎক্ষিপ্ত, উন্মথিত করিয়া তরঙ্গ ছুটিয়াছে!

প্রাণ আজি ভক্তিশূন্য, বিশ্বাসহীন!

এমন দুরবস্থায় আজি যাহা দেখিতেছি, তাহাই কুৎসিত! অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে, করুণাময়ী সে প্রকৃতি আজি কৈ? সে জড়-প্রকৃতি, আমাকে দেখিয়া আজ নিষ্ঠুররূপে উপহাস করিতেছে! ভক্তি, প্রীতি, শান্তি—সকলই গিয়াছে; অনাবৃত-দেহে কঠিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর সংসারে তাই আজ সংগ্রাম করিতেছি!

অতীতের সেই মধুর স্মৃতি আজি মনে পড়িতেছে। এই পৃথিবীকে তখন কত মমতাময়ী দেখিয়াছি! প্রতি রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, প্রতি পাদপে পুষ্প, প্রতি নরমস্তিষ্কে প্রতিভা-কণা, প্রতি রমণী-হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেম,—এমনই সর্ব্বত্র দেখিয়াছি। প্রতি হৃদয়ে দয়া, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস,—প্রতি আঁখিতে প্রীতি ও করুণা, প্রতি মানবে ধর্ম্ম ও আত্ম-বিসর্জ্জন,—এমনই সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়াছি। হায়, আজি সে সকল কোথায় অদৃশ্য হইল?

সেই যে জ্ঞানতৃষ্ণা—সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করিয়া, আকাশ-পাতাল অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইত; সেই যে বিশ্বাস—এ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হৃদয়-পিঞ্জরে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিকেও আবদ্ধ করিতে পারিত; সেই যে বাসনা—ধর্ম্মাত্মা উশীনরের ন্যায় পরোপকার-ব্রতে আত্মবিসর্জ্জন করিত; সেই যে আকাঙ্ক্ষা—আত্মপরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে পূর্ণ না করিয়া, উদার প্রেমে সমগ্র জগৎ আপনার করিত; সেই যে আশা—গভীর উদ্দীপনায় তেজোহীনা মাতৃ-ভাষা পরিপূর্ণ করিয়া, সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত করিতে উদগ্রীব হইত,—সে আশা, সে সাধ, সে বাসনা, সে বিশ্বাস—আজি কোথায় অন্তর্হিত হইল?

সে দিন গিয়াছে। সে আশা, ভরসা, উল্লাস,—সে সকলের

দিন গিয়াছে। তখন শিক্ষার অবস্থামাত্র, এখন কঠোর কার্য্য-ক্ষেত্র!—তখন স্বপ্ন, এখন জাগরণ!

কিন্তু এমন নিরাভরণে জাগিতে হইল কেন? অর্দ্ধপথে আসিতে-না-আসিতে, নিষ্ঠুর সংসার, দস্যুর ন্যায় হৃদয়ের সকল আভরণ কাড়িয়া লইয়া, আপনার পথে আমাকে ডাকিয়া লইল! কণ্টকশূন্য বৃন্তচ্যুত কুসুমের উপর দাঁড়াইয়া, সৌন্দর্য্যের হাটে কি অপূর্ব্ব শোভাই দেখিতেছিলাম,—আজি হায়, সহসা নিঃসম্বল হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে!

কাব্য-চক্ষু মুদ্রিত হইল। বাহিরের এই চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম,—সংসার অন্যরূপ! চারিদিক হইতে শত অভাবের কোলাহল ও মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিলাম;—কাব্যের তন্দ্রাটুকু নিমেষে টুটিয়া গেল!

নয়নে অশ্রু বহিল না, কেবল বিস্ময়ে সংসারপানে তাকাইয়া ভাবিলাম,—"সেই স্বপ্ন, ইহাই জাগরণ! হায়, সেই স্বপ্ন সত্য হইয়া, এই জাগরণ মিথ্যা হইল না কেন?"

শত অভাবের কোলাহল শুনিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কে জানিত, এ জীবনব্যাপী-সংগ্রামে চিরদিনই পরাজিত হইতে হইবে? কে জানিত, সংসার-সমুদ্রে এত ভয়ঙ্কর তরঙ্গতুফান উঠিতে পারে? ডুবিতেছি—ডুবিতেছি—অনবরত ডুবিতেছি, মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছি না! এতটুকু দয়া-মায়া কোথাও নাই, এতটুকু বিচার-বিবেচনাও কোথাও নাই! সারাটা জীবন-ব্যাপী কঠিন সংগ্রাম! সংগ্রামে জয় পরাজয় উভয়ই বিধি, কিন্তু এ দগ্ধ অদৃষ্টে সর্ব্বত্রই পরাজয়!

সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি? কেবল অভাব মোচন। কিন্তু কোন

অভাব তো দূর হইল না,—সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, নিষ্পেষিত ও মৃত-প্রায় হইতেছি! স্বার্থান্ধ সংসারে এতটুকু সমবেদনা নাই, এতটুকু আন্তরিকতা নাই, এতটুকু স্নেহ নাই! ধর্ম্ম কৈ?—বিচার কৈ?—ন্যায় কৈ? নর-হৃদয়ে সে দয়া-ধর্ম্ম কৈ? পৃথিবীর বুকে সে উৎসাহ আশাই বা কৈ? হায়, সংসার-সংগ্রাম যদি এতই কঠিন, তবে সে প্রাণপণ শক্তি-সামর্থ্য পাইলাম না কেন?

মহাপাপী আমি,—মনের এই অবস্থায় মনে হয়—কে বলে এ পৃথিবী দেবতার লীলা-ভূমি? দেবতা!—দেবতা—মূর্খের কল্পনা; কর্ত্তব্য—অর্থহীন অসার বাক্য মাত্র; ধর্ম্ম—প্রতারণার প্রতিবাক্য! স্বার্থ—দেবতা, আত্মসুখ—কর্ত্তব্য, পরপীড়ন—ধর্ম্ম! এখানে গুণের আদর নাই, ধর্ম্মের পূজা নাই, প্রেমের প্রতিদান নাই,—আছে রসনাগত ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রীতি!

তুমি গৃহত্যাগী বনবাসী টাইমন্! আজি তোমার কথা স্মৃতি মাঝে জাগিতেছে। স্বপ্নের মোহে, তুমি মনুষ্য-হৃদয় দেবতার মন্দির ভাবিয়াছিলে, আর স্বপ্নের অবসানে তাহা পিশাচের আবাস জানিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়াছিলে!—আমি কেবল লোকালয় নহে, এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া জুড়াইতে চাই!

বিশ্বাস গিয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, ভক্তি হারাইয়াছি; শান্তি—জীবনের আধার, প্রাণের সঞ্জীবনী সুধা,—তাহাও গিয়াছে! অভাব দূর করিতে আসিয়া, যাহার অভাব ছিল না, তাহাও হারাইলাম! ভক্তি, প্রীতি, শান্তি—সকলই গেল, রহিল কি? রাখিলাম কি?

তবে মরি না কেন? কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব? সুখ! সে তো মিথ্যা কল্পনা! বাঁচিয়া থাকিয়া করিলাম কি, করিতেছি কি,

এবং করিবই বা কি ? এই যে জীবন-ধারণ, ইহাই কি মৃত্যু নহে ? তবে প্রকৃত মরণে সুখ আছে, জ্বালা জুড়াইবে !

পৃথিবীর আলো ভালো লাগে না ; অন্যের সুখে সুখী হইতে পারি না ; সর্ব্বত্রই যেন অবিচার ;—মনের এখন এই অবস্থা ! কিছুতেই আর তৃপ্তি নাই, আসক্তি নাই, মায়া নাই ! কোন রকমে দিন কয়টা ফুরাইলেই যেন বাঁচি ! প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছি !

হায় মানব-জীবন ! কয়টা দিনের সমষ্টি মাত্রেই তুমি গঠিত ?

কবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি ভাবময়ী তুমি শকুন্তলা, সেই মালিনী-নদী-তীরে, সেই আশ্রম-দ্বারে দুষ্মন্তময়ী হইয়া আপনায় আপনি ডুবিয়া গিয়াছ, ক্রোধোন্মত্ত দুর্ব্বাসার অভিশাপ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল না ! সেই বজ্রগম্ভীর স্বরে বুঝি ব্রহ্মাণ্ডও বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তুমি তখনও অন্তরের অন্তরে বিলীন হইয়া প্রিয়-চিন্তায় আত্মহারা !—তোমার সেই মূর্ত্তি আজিও আমার অন্তরে জাগিতেছে ! কিন্তু আর তেমন 'নিতুই নব' উল্লাসে তোমার সে 'নিতুই নব' সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি না ! মন্দভাগিনী দেস্‌দিমনা ! মনে পড়ে, সেই প্রথম দিন যখন তোমার কাহিনী পড়িয়াছিলাম, কি ভীষণ দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলাম ! বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কাঁদিতেও পারিলাম না ! আজিও তোমার অদৃষ্টের কথা ভুলি নাই ; কিন্তু জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া আর তোমাদের কথা ভাবিবার বড় অবসর পাই না ! উন্মত্ত লিয়র ! দুর্ভাগ্য হাম্‌লেট ! মহাপাপী ম্যাক্‌বেথ ! এ জীবনের উপর তোমরা একদিন কি রহস্যই অভিনয় করিয়াছ !

হায়, আজি সে হৃদয় আর আমার নাই! জয়দেবের সেই "ললিত-লবঙ্গলতা," শেলির সেই করুণ গীতি,—কিন্তু কেন আর সে সকল স্মরণ করি? সেই দর্শন শাস্ত্র, পড়িতে পড়িতে মনে হইত,—

> How charming is divine philosophy!
> Not harsh and crabbed, as dull fools suppose;
> But musical as is Apollo's lute,
> And a perpetual feast of nectared sweets,
> Where no crude surfeit reigns."——

পড়িতে পড়িতে মনে হইত, সত্যের যতই সন্ধান পাইব, আরও ছুটিব, কিন্তু সত্য একেবারে করতলগত করা হইবে না। বালকে যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে,—কখন ছাড়িয়া দেয়, ছাড়িয়া দিয়া আবার ধরিতে যায়, সেই ধরিবার চেষ্টাতেই তাহার কত আনন্দ, কত উৎসাহ!—আমিও তেমনি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-পালনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ধরিব,—একেবারে ধরিব না, ধরা দিলেও ধরিতে চাহিব না, কেবল পিছু পিছু ছুটিয়া জন্ম জন্ম তাঁহাকে ধরিতে থাকিব!—সেই আকাঙ্ক্ষা, সরল প্রাণের সেই সরল বিশ্বাস—হায়! সকলই আজ গিয়াছে!

কিন্তু এতটা হাহাকারের কারণ কি? সত্যই যদি সেই অবস্থা স্বপ্ন হয় এবং এই জাগরণের অবস্থাতেই এমন কঠিন সংগ্রামে, এমন জীবনব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? মানস-চক্ষের উপর একটা সুন্দর আবরণ ছিল, তাহাতেই সকল সুন্দর দেখিতাম। সে মোহ-আবরণ ঘুচিয়াছে; এখন পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছি। যদি বুঝিলাম, পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি

বা ভাবিয়াছি, তাহা ভুল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পূর্ব্বে যাহা অবলম্বন করিয়াছিলাম,—তাহা প্রকৃত অবলম্বন নহে; মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই সংগ্রামকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

সংগ্রাম অবলম্ব্য হউক, ইহাতে তৃপ্তি কৈ? সকলেই সংগ্রামের মধ্যে, কিন্তু সকলেই কৃতী নহে; এবং সকলে সেজন্য এমন দুর্দ্দশা-গ্রস্থ নহে! যে বিশ্বাস হারাইয়াছে, দুর্দ্দশা তাহারই!

আমি বিশ্বাস হারাইয়াছি, তাই এ হাহাকার! ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়াছি, অভাবের প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছি, দুঃখ-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়াছি,—তবু যদি বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম! হাহাকার করিয়াছি, কাঁদিয়াছি, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি,—হায়, তবু যদি বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম! কত ঘুরিয়াছি, তৃপ্তি পাইতে কত না করিয়াছি, অবশেষে সার বুঝিলাম,—ভগবানে বিশ্বাস ব্যতীত তৃপ্তি নাই!

কিন্তু কিরূপে বিশ্বাস হারাইলাম, বলিতে পারি না। এক-দিনে ইহা যায় নাই। দিনে দিনে, অতি অল্পে অল্পে এ অপার্থিব রত্ন হারাইয়াছি। জগতের সর্ব্ব পদার্থে যাঁহাকে বিদ্যমান দেখিতাম, জগতের সর্ব্বত্রই যাঁহার মঙ্গল-হস্ত প্রকাশিত দেখিতাম,—একদিনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাই নাই, একদিনে তাঁহাকে হৃদয়-মন্দির হইতে বিচ্যুত করি নাই! হায়, এ শূন্য মন্দিরে আর কি সে দেবতা আসিবেন না?

যদি বিশ্বাস না হারাইতাম, এই হাহাকার, এই মর্ম্ম-কাতরতা কিছুই থাকিত না!

"—For man's well-being, Faith is properly the one thing needful; how, with it, Martyrs, otherwise weak, can cheerfully endure the shame and the cross; and without it, worldlings puke up their

sick existence, by suicide, in the midst of luxury. The loss of religious Belief is the loss of everything."

বিশ্বাস গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও গিয়াছে। যাঁহার প্রতি বিশ্বাস রহিল না, তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকিবে কেন? ভক্তি-শূন্য হইয়াই জগতের সর্ব্বত্র অবিচার দেখিলাম। অশান্তিতে প্রাণ পূর্ণ হইল।

সুখ কৈ?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সুখ নাই। আপনার হৃদয়ে সুখ নাই, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সুখ কোথায় পাইবে? সুখের জন্য লালায়িত হইলাম, এই প্রাণান্তপণ কঠিন সংগ্রামে সুখই লক্ষ্য,—হায়, সুখ তো মিলিল না!—

কবি বলিলেন;—

"সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ;
দিবানিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে,
ক্রন্দনের নাহি অবসান।"

তাই কি সুখ মিলিল না?

কিন্তু আমার এ সুখের মূলে কি? আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

—"I asked myself: What is this that, ever since earliest years, thou hast been fretting and lamenting and self tormenting, on account of? Say it in a word: is it not because thou art not Happy? Because the Thou (sweet gentleman) is not sufficiently honoured, nourished, soft-bedded, and lovingly cared for? Foolish Soul! What Act of Lagislature was there that thou shouldst be Happy? What if thou were born and predistined not to be Happy, but to be unhappy! Art thou nothing other than a Vulture, then,

that fliest through the Universe seeing after somewhat to eat; and shrieking dolefully because carrion enough is not given thee?"

কেনই বা এ সংগ্রাম, কেনই বা এ হাহাকার?—সুখের জন্য। কৈ, তেমন সম্মান পাইলাম না, তেমন খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইল না, তেমন বিলাস-বৈভব হইল না;—সুখ কৈ? হায় নির্ব্বোধ! ইহা বুঝ না যে, আমি কেন সুখী হইব? বিধাতার এমন কি বিধান আছে যে, আমি সুখী হইবই হইব! যদি সুখী না হইয়া, চিরদুঃখী ও চির-অসুখী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি এবং যদি সেই ভাবে থাকিবার জন্যই এ পৃথিবীতে আসিয়া থাকি? সুখ মিলিল না বলিয়া এতই অশান্তি ভোগ করিব কেন? শকুনি, গৃধিনি, উদরের চেষ্টায় মাংসলোলুপ হইয়া ঊর্দ্ধে উড়িতে থাকে, আহার্য্য না পাইলে বিকট চীৎকারে দিক্ পূর্ণ করে;—আমিও কি তাই?

এই সুখ মানবের লক্ষ্য নহে। ধর্ম্ম হইতে যে সুখ, সেই সুখই লক্ষ্য। সংসারের তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করিয়া, সেই মহান্ সুখের জন্য লালায়িত হইতে হইবে। সেই সুখ বা তৃপ্তির কথা বলিবার জন্যই, কত প্রচারক, কত দার্শনিক, কত ভক্ত, কত কবির অভ্যুদয় হইয়াছে! যুগে যুগে সেই সুখের আস্বাদ চলিয়া আসিয়াছে, যুগ-যুগান্তরেও সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা মানুষের থাকিবে!

তবে এ সংগ্রাম কিসের?

হায়, সোণার হৃদয় ভাঙ্গিয়া, মৃৎ-ভাণ্ডের আশায় হাহাকার করিতেছি! সে ধন্বন্তরি-সুধা ত্যাগ করিয়া, তুচ্ছ সুখের আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তির বৃশ্চিকদংশন ভোগ করিতেছি!

এ বিশ্বাসহীন, ভক্তিশূন্য, অশান্ত-হৃদয়ে আবার তুমি এস! এ শূন্য-মন্দিরে আবার তুমি অধিষ্ঠিত হও!

তখন স্বপ্নের অবস্থায় ছিলাম, না জানিয়াও তোমায় জানিয়াছিলাম; আজি এ জাগ্রৎ অবস্থায়, জীবনের এ কঠিন সমস্যায়, তোমায় বুঝিতেছি, তোমার অতুল মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। এস তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতি! অনন্ত অসীম হইয়াও, সান্ত ও সসীম এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! আবার তোমায় বিশ্বাস করিয়া তোমায় ভক্তি করি। তোমাতে ভক্তি করিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি করি। সেই প্রীতিনেত্রে আবার দেখি, সর্ব্বত্রই সেই শোভা ও সৌন্দর্য্য! তখন স্বপ্নের মোহে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, এই জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা অপেক্ষা অধিক শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হই! সে শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে প্রাণের সকল সাধ মিটিবে, হৃদয় শান্তির সাগরে প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

তোমাতে ভক্তি, সর্ব্বজীবে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি,—সে তিনের কি অপূর্ব্ব যোগ! গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—ত্রিধারা সংমিশ্রণে যেমন পবিত্র প্রয়াগ; তেমনি ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি—তিন মিলিয়া আমার হৃদয় পবিত্র হইবে; সেই পবিত্র হৃদয়ে,—পবিত্রতার আধার তুমি,—তোমাকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব।

ঝটিকা থামাইয়া দাও! দরিয়ার এ মহা তুফান শান্ত হউক!

ঘোম্‌টা

সুন্দরকে যদি ভালবাস, তবে ঘোম্‌টা ভালবাসিও। ইহলোকে থাকিয়া যদি স্বর্গসুখ উপভোগে অভিলাষ থাকে, তবে ঘোম্‌টার অনাদর করিও না। জ্যৈষ্ঠের নিষ্ঠুর নিদাঘে, শ্রাবণের প্রবল প্রাবৃটে, পৌষের দারুণ শীতে, যখন কাতর-প্রাণ হইবে, তখন যদি সুনির্ম্মলা শান্তি, স্বর্গীয় সুখ পাইতে চাও, তবে পবিত্রচক্ষে ঘোম্‌টার পানে তাকাইও। দারিদ্র্যে, ভগ্নমনোরথে, নিরাশায়, বিড়ম্বনায়, ঘোম্‌টা চিত্ত স্থির করিয়া দেয়, ব্যথিত প্রাণ শীতল করে। কুচক্ষে ঘোম্‌টার পানে তাকাইও না; পবিত্রচক্ষে দেখিয়া ঘোম্‌টার পূজা করিও।

দেখ, কচি সবুজ পাতার ভিতর মুখখানি লুকাইয়া ফুট-ফুট কুসুমকলিকার কি মধুর শোভা! মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া, চন্দ্রের যে হাসি, তাহা কত সুন্দর! ভূরি-কুসুমিতা মাধবীবল্লরীকে লইয়া, অস্ফুট চন্দ্রালোকে সমীরণের যে ক্রীড়া, সে ক্রীড়া অস্ফুট চন্দ্রালোকে বলিয়া কি মনোহর! চিন্তার আলোকে লুকায়িত

কবির মূর্ত্তি * কি হৃদয়গ্রাহিণী! আর ঘোম্‌টার অন্তরালে, সংসারে অতুলনীয়, জগতে সর্ব্বসৌন্দর্য্য-সমষ্টি যে রমণী-মুখচন্দ্র—তেমন শোভা আর কি আছে? পৃথিবীর ভাষায় তেমন শব্দ নাই, মানবের তেমন সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা নাই, জগতে উপমা দিয়া বুঝাইবার তেমন কিছু নাই, তাই এ শোভা কেবল দেখিবার, দেখিয়া উপভোগ করিবার,—পরন্তু দেখাইবার বা বুঝাইবার নহে।

যে কেহ প্রভাতে বা সন্ধ্যায়, ঈষদুন্মুক্ত ঘোম্‌টার অন্তরালে, একখানি নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রমা দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে—এ জগৎ বড় পুণ্যতীর্থ। যে কেহ দেখিয়াছে, ঘোম্‌টার ভিতর হইতে দুইটি বিশাল চক্ষু তাহার চক্ষুর উপর সংস্থাপিত, সেই মজিয়াছে। যে কেহ দেখিয়াছে, অতি প্রত্যূষে, একখানি হাসিমুখ, শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া, তাহার মুখপানে চাহিয়াছে, আর চারিটি চক্ষুর আকস্মিক মিলনে, সে লজ্জাবতী, রক্তিম মুখমণ্ডলের উপর ঘোম্‌টা টানিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে—মানুষের যে স্বর্গজ্ঞান, তাহা এইখান হইতেই! যে কেহ কখন ঘোম্‌টার ভিতর মুখখানি লইয়া গিয়া, সেই লজ্জাবনত মুখখানির হাসি দেখিয়াছে, সে সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়াছে! আবার যে কেহ তদবস্থায় সেই ব্রীড়াময়ীর প্রফুল্ল মুখকমল হইতে ঘোম্‌টাখানি অপসৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, সেই বুঝিয়াছে—তাহাই জগতের কবিত্ব! জয়দেবের সঙ্গে কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে গিয়া কিংবা তমসার সহিত পঞ্চবটীবনে গিয়া, রাম ও ছায়া-সীতার কথোপকথনে শ্রবণে, বুঝি সে কবিত্ব নাই! কিন্তু—

ঘোম্‌টা এত সুন্দর ও মধুর কেন? যে মুখমণ্ডল দেখিবে

* "Like a poet hidden in the light thought."—Shelley.

সংসারে স্বর্গ দেখার সাধ মিটিয়া যায়, ঘোম্‌টা রাত্রিদিন তাহা তৃষিত আঁখি দুটির দূরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। যে চক্ষু দুটি, যতবার দেখ, ততবারই নূতন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন, যাহা এ কুহক-দূরিত-পূর্ণ সংসারে পবিত্রতা শিক্ষা দেয়, তাহা নিয়তই ঘোম্‌টার অন্তরালে লুক্কায়িত। চাঁদমুখের যে হাসি দেখিলে, এ দুঃখের সংসার অনন্ত সুখপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, সে হাসি, আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া দেখা হয় না, ঘোম্‌টা আসিয়া তাহা তখনই ঢাকিয়া ফেলে। দেখ, এত প্রকারে ঘোম্‌টা শত্রুতা করে, তবু ঘোম্‌টা সুন্দর।

বুঝি এই শত্রুতা করে বলিয়াই ঘোম্‌টা সুন্দর! আবার ঘোম্‌টার এ শত্রুতা—তাই কি অল্প? দেখ, রাহু আসিয়া যখন পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করিতে থাকে, জ্যোৎস্না নিবিয়া যায়, পৃথিবীর হাসিমুখে অন্ধকার-ছায়া পড়ে, তখন চারিদিকে অন্ধকার!—সেই অন্ধকারে, মনে ভাবিলে, চাঁদের হাসিমুখ আরও ভালো করিয়া মনে পড়ে; * বাহিরে যখন অন্ধকার, হৃদয়ের ভিতরে তখন পূর্ণচন্দ্রের সেই পূর্ণমূর্ত্তি। রাহু কিছুকাল পরেই আবার চাঁদকে ছাড়িয়া দেয়, আবার সেই জ্যোৎস্না—সেই হাসি, পৃথিবীর উপর তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। কিন্তু ঘোম্‌টা যে মুখচন্দ্র ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহা তো একবারও ছাড়িয়া দেয় না; কাছে বসিয়া, হাত দুখানি ধরিয়া, অনেক সাধনা করিলেও, তাহা তো একটি বারের জন্যও ছাড়িয়া দেয় না! † কথা শুনে না, অনুরোধ রাখে না, মিষ্ট কথায়

---

* Association by Contrast.

† কবি বলেন,—

> "রাহু যে চাঁদেরে ছাড়ে, শুধু চাঁদ ব'লে,
> সেও না ছাড়িত বুঝি চাঁদমুখ হ'লে।"

ভুলে না, তবুও কিন্তু ঘোম্‌টার উপর রাগ হয় না! এত সত্ত্বেও ঘোম্‌টাকে সুন্দর মনে হয়। কেন, সেই কথাই বলিতেছি।

দেখ, "মেঘমধ্যে যেমন বিদ্যুৎ, মনোমধ্যে যেমন প্রতিভা, মরণের ভিতর যেমন সুখ", ফুলের মধ্যে যেমন সৌরভ, রমণীর বুকের ভিতর যেমন স্নেহ, তেমনই ঘোম্‌টার অন্তরালে একখানি পবিত্র মুখ। সেই মুখখানি ঢাকিয়াই না ঘোম্‌টার এত সৌন্দর্য্য? নহিলে, ঘোম্‌টা আর কি? বস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্তদেশ বৈ তো নহে! কিন্তু এমন করিয়া ব্যাখ্যা করিও না। এমনই সূক্ষ্ম করিয়া দেখিতে গিয়া, আমরা আসল জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলি।* ঘোম্‌টা অতি সামান্য উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও, এবং স্বয়ং অতি সামান্য হইলেও, স্থান-মহিমায় সে গৌরবান্বিত। স্থানমহিমায় অতি কুৎসিতও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়। বারাণসী বা শান্তিপুরে, ঢাকাই কিংবা বিলাতী অতি সামান্য দরের বস্ত্রের হউক,—ঘোম্‌টা যখন গৃহলক্ষ্মীর পুণ্য হাসিভরা মুখখানি ঢাকিয়া রাখে, তখন কে মনে করিয়াছে, ঘোম্‌টাখানি বারাণসী চেলির কি বিলাতী সাড়ীর প্রান্তভাগ? গৃহলক্ষ্মীর মুখমণ্ডল হইতে ঘোম্‌টা অপসৃত করিয়া লইয়া দেখ, ঘোম্‌টার কোন সৌন্দর্য্য নাই, তখন আর ঘোম্‌টাই বা কি? ঘোম্‌টা নিজে কালো হউক, কুৎসিত হউক, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে থাকে, সে নাকি চিরদিনই সুন্দর, তাই ঘোম্‌টা নিজে কুৎসিত হইয়াও সুন্দর; ভালোর সংস্রবে থাকিয়াই ভালো।—"দেখ, কালো জল কালো বলিয়া সুন্দর নহে। কালো জলে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের ছবি উঠে

* "We murder to dissect."

বলিয়া, কালো জল সুন্দর। তেমনি কালো মেঘ অমৃতবৎ বারিবর্ষণ করিয়া, কালো জলের সহিত কথা কয় বলিয়া, অর্থাৎ কালোকে ভালবাসে বলিয়া সুন্দর। আর কালো চুল সুন্দরী সতীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। কালো বলিয়া ভালো কেহই নয়;—ভালোর সম্পর্কে থাকিয়াই কালো ভালো।”

ঘোম্‌টার গড়ন লইয়া অত নাড়াচাড়া করিও না। ঘোম্‌টা সুন্দর। সুন্দর মুখখানি ঢাকে বলিয়াই সুন্দর। দেখ, সৃষ্টিরহস্য আমাদের অজ্ঞাতে আছে বলিয়া কত সুন্দর! জ্ঞানের উন্নতিক্রমে সৃষ্টির মুখ হইতে আবরণখানি ক্রমশঃ উন্মোচন করো, একএকটি রহস্যের পরিচয় পাইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিবে। ঘোম্‌টার অন্তরালে মুখখানি লুকাইয়া রাখাই একটা রহস্য, একটা সৌন্দর্য্য। একেবারে বাহির করিয়া ফেলিওনা, নূতনত্ব কিছুই থাকিবে না। নূতনত্ব না থাকিলে, তাহা লাভের জন্য প্রাণে তেমন পিপাসা জন্মে না। যাহাকে আমার বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহার মুখখানি ঘোমটা লুকাইয়া রাখিয়া, তাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দেয়। যত দেখ, মনে হইবে,—এখনও ভালো করিয়া দেখা হয় নাই, যাহা দেখিতেছি ইহা তো নূতন, আর কখন কি ইহা দেখিয়াছি? সৃষ্টির আবরণের মতো, মুখের আবরণ অতি সন্তর্পণে খুলিয়া দেখ, মনুষ্য-চিন্তার অতীত অনেক সৌন্দর্য্য তাহাতে দেখিয়া মোহিত হইবে। বসিয়া বসিয়া দেখ, দর্শন-পিপাসা ক্রমশঃ বাড়িবে। সে পিপাসা চক্ষের নহে,—আত্মার। আত্মার পিপাপা অমৃতের ভিখারী। * ঘোম্‌টার

* "The thirst that from the soul doth rise,
Doth ask a drink divine."

অন্তরালে, সে মুখমণ্ডলে অমৃতই আছে! সংসারের শোকে তাপে, দুঃখে, সে মুখ—শান্তি, সুখ ও সম্পদ।

লজ্জা, স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। ঘোম্‌টা, মুখখানি ঢাকিয়া, এই অলঙ্কার পরাইয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তুলে। কোন নবোঢ়া বধূ যখন গুরুজন-সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, দেখিয়াছ কি, সে মূর্ত্তিখানি কি মনোহারিণী? মুখখানি ভূমিপানে নত, চক্ষুদুটি আপন চরণপানে লক্ষীকৃত, আর ঘোম্‌টাখানি আসিয়া সমগ্র মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিয়াছে! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সে মূর্ত্তি!—না, পটে-আঁকা লক্ষ্মীর মূর্ত্তিও এমন ভাবে আবৃত নহে!

অসাবধানে যদি কখন ঘোম্‌টাখানি অপসৃত হইয়াছে, আর সেই সময় যদি সখীজন-ব্যতীত অন্য কাহারও চক্ষু সে মুখ-প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, অমনি চকিত হরিণীর ন্যায়, সে, ঘোম্‌টাখানি মুখের উপর ফেলিয়া দেয়। সে দৃশ্য কি মধুর! কোন রসিক কবি তাহা দেখিয়া বলেন,—এ চকোরনয়না নিশ্চয়ই ইন্দু-সৌন্দর্য্য কি কমলশোভা চুরি করিয়াছে। নহিলে, যে কেহ এ মুখপানে চাহিলে, তাড়াতাড়ি মুখ আবৃত করিয়া ফেলে কেন? * কিন্তু এ রসিকতা ছাড়িয়া, ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করো, বুঝিবে—ইহার উদ্দেশ্য আছে। হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী ইহা বুঝিয়া থাকেন যে, স্বামী ব্যতীত তাঁহার পরপুরুষের মুখ দেখিতে নাই, আর পরপুরুষকে মুখ দেখাইতেও নাই। এই নীতি অবলম্বন করাতেই হিন্দুর অন্তঃপুরে আজিও শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

* "অচূচুরচ্চারুচকোরলোচনা শ্রিয়ং কিমিন্দোরথবাম্বুজন্মনঃ।
যতো জনঃ কশ্চন বীক্ষতে যদা পিধায় গোপায়তি স্বাননং তদা।"

ঘোম্‌টার পানে তাকাইয়া দেখ, মনে হইবে—সেলির চাতক পক্ষীর মতো, সে গৃহলক্ষীর সংসার আকাশ-বিচরণ এইমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। হৃদয়ে কত আশা, কত আনন্দ, কত আকাঙ্ক্ষা; প্রাণ পুলকে পূর্ণ; সংসার-পথ যেন কোমল কুসুমাবৃত! যার হৃদয় এমন, তার মুখ হাসিভরা না হইবে কেন? ঘোম্‌টার আড়ালে, সেই হাসিমুখ দেখ, পৃথিবী আর স্বর্গ একাকার হইয়া যাইবে!

নবোঢ়া বধূর ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখের আবার আদর কত! বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, তাসের দওলার সহিত নবোঢ়া বধূর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—"বঙ্গ পরিবার মধ্যে নবোঢ়া বধূর আদর দেখিলে কাহার না ক'নে হ'তে ইচ্ছা হয়? বৌ-মা সর্ব্বদা অলঙ্কারে ভূষিতা, ভালো সাটী পরিহিতা, ধনীগৃহে—দাসীমণ্ডলী পরিবেষ্টিতা, কাঙালীর গৃহে—নিভৃত-দেশে গুণ্ঠনাবৃতাস্থিতা। * * * আহা! বঙ্গাঙ্গনাগণ! কেন তোমরা চিরকালই বৌ থাকো না? বাঙ্গলায় যতদিন ক'নে থাকিবে, ততদিনই তোমাদের সুখের দিন। অতএব শীঘ্র ঘোম্‌টা খুলিও না।"

আর যাঁহারা ঘোম্‌টার বালাই এড়াইয়াছেন?—সংস্কার-সম্পন্না বা শিক্ষিতা বলিয়া যাঁহারা ঘোম্‌টা দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় আমাদের কাজ নাই। বর্ষীয়সীগণ কেন যে ঘোম্‌টা খুলিয়াছেন, একবার তাহাই দেখিতে হইবে। লজ্জাটা যে তাঁহাদের কম্ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা এরূপ করেন, সে কথা বলিতে পারি না। সংসারে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণা, তাঁহাদিগের সংসার-জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অধিক; কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা নাকি তাঁহারা জানিয়াছেন, তাই আর কাহারও সাক্ষাতে মুখ লুকাইয়া তাঁহাদিগকে থাকিতে হয় না।

নিজের গুরুত্ব যেন কতকটা বুঝিয়াছেন, আপনার উপর আপনার কতটা শাসন চলিতে পারে তাহাও যেন বুঝিয়াছেন, অন্যের প্রভাব হৃদয়ের উপর কতটা আধিপত্য করিতে পারে,—এ সকল যেন শিখিতে আর বাকি নাই, তাই আর তাঁহারা ঘোমটা দেন না। এমন অবস্থায় ঘোম্‌টা দিলেও যেন কতকটা হাস্যকর ব্যাপার হয়। ঘোম্‌টা টানিতেই লজ্জা হয়—'আজিও কি তবে কচি খুকি আছি!'—এই ভাবই তাঁহাদের মনে হয়। তবে এই সংসার-জ্ঞানের সহিত ঘোম্‌টা যে, চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে অগস্ত্যযাত্রা করেন, তা নহে। আবশ্যক মতো তাহাও আবার দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে আর পূর্ব্বগৌরব থাকে না। যেন—'না দিলে নহে' রকমের হইয়া দাঁড়ায়!

সকলেরই একটা সময় আছে। কোন জিনিস ভালো হইলে, তাহা যে চিরদিন সমভাবে ভালো থাকিবে, সমভাবে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিবে, সমভাবে লোকের প্রীতিপদ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শিশুর হাসিমাখা প্রফুল্ল অধরে আধ-আধ কথা-গুলি কি মিষ্ট! কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তির মুখে তাহা শুনিলে কি হাসি পায় না? নবীনা যুবতীর প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ কি মধুর! তাই বলিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষীয়া কোন প্রাচীনার মুখে কি তাহা শোভা পায়? সকলের একটা সময় আছে।

কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলি না যে, বর্ষীয়সী হইলে, ঘোম্‌টা না থাকিলে, তাঁহাদের শ্রী বা সৌন্দর্য্য থাকিবে না। কোন নব-যুবক তাঁহার প্রেমময়ীর কতটুকু সৌন্দর্য্যই বা দেখিতে পান? তাঁহার পিতামহ বোধ হয়, তাঁহার ঠান্‌দিদিতে অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকেন। বয়স না হইলে বুঝি সৌন্দর্য্য-জ্ঞান জন্মে না।

তাই বয়স হইলেই ভালবাসা যায় না। যখন নানা দুঃখে প্রাণ কাতর, নানা কষ্টে হৃদয় সন্তপ্ত,—হয় ত বা জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য, রৌদ্রে ক্লিষ্ট হইয়া, দূর দূরান্তরে যাইতে হয়, মনে হয়—সংসার দুঃখের, আর এ পাপ সংসার-আশ্রমে কাজ নাই, গৃহত্যাগী হইয়া বনবাসে যাইব; কিন্তু তখন গৃহিণীর মুখখানি একবার মনে পড়িলে, আর বনবাসের কথা, সংসার-আশ্রমের দুঃখপূর্ণতার কথা বড় মনে থাকে না। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন গৃহিণীর সেবা-শুশ্রূষা দেখেন, তখন এক জন প্রবীণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখের কথা শুনিবে?—"বাড়ী আসিবা মাত্র যখন দেখিতাম, গৃহিণী দাবার উপর পীঁড়ে পেতে, পা-ধোবার জল, গামছা, তেলের বাটী সাজাইয়া রেখে, তামাকু সাজিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন যেন দুঃখের অনেক হ্রাস হইত। তারপর আহার করিতে বসিতাম, খাওয়া শেষ হয়-হয়, এমন সময় গৃহিণী যখন নথ নাড়িয়া বলিতেন,—"খাও না, কেবল খেটেই মরিবে? ভাল ক'রে পেটে দুটো ভাত দাও, আর একখানা ঝোলের মাছ দেবো?" তখন বোধ হইত, এই সংসারই বুঝি স্বর্গ। পরদিন প্রাতে পূর্ব্বের যন্ত্রণা একেবারে বিস্মৃত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে খাজনা আদায় করিতে যাইতাম।" কে বলে, বয়স হইলেই ভালবাসা যায়? বরং তখনই ভালবাসা প্রগাঢ় হইয়াই,—সৌন্দর্য্য বলো, রূপ বলো, প্রণয় বলো, প্রেম বলো, সবই ধরিয়া রাখে! কচি কচি রাঙ্গামুখখানি, নব অনুরাগোৎফুল্ল আঁখি-যুগল, সংসার-জ্ঞান-অনভিজ্ঞা মুগ্ধস্বভাবা বালিকার প্রেমপূর্ণ হৃদয়, সুন্দর বটে। কিন্তু ইহাই যদি সৌন্দর্য্যের সবটা হইত, তবে এ বয়স যাঁহাদিগের গিয়াছে, তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের প্রাণের টানটা যে কত আল্‌গা হইত, তাহা বুঝা যায়। হরদেব ঘোষাল যে প্রৌঢ়া

ভার্য্যায়ও সৌন্দর্য্য দেখিবে, তাহার বিচিত্র কি ? বয়স হইলেই কিছু সৌন্দর্য্য যায় না। সুন্দর বর্ণ অপেক্ষা সুন্দর মুখশ্রীর গৌরব অধিক ; সুন্দর মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব অপেক্ষা সুন্দর অঙ্গভঙ্গি বা 'চালচলনের' সৌন্দর্য্যই বেশী। যখন যৌবন, তখন দেহের পূর্ণতা কোথায় ? দেহ তখন সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে মাত্র। বেকনের ইহাই মত *। অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং, যখন দেখিবে, যৌবন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেহের আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তখন পূর্ণ-সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। সেটা কিন্তু নিতান্ত অল্পবয়সে ঘটে না।

যাহা হউক, বর্ষীয়সী হইলে, দৈহিক এ সকল সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইলেও, আর এক সৌন্দর্য্য থাকিবেই। বাহ্য সৌন্দর্য্যই কিছু সব নহে। বাহ্য সৌন্দর্য্য ছাড়া আরও কিছু আছে, তাহা চর্ম্মচক্ষের অগোচর বটে। কিন্তু চর্ম্ম-চক্ষে যাহা না দেখিতে পাইবে, তাহার অস্তিত্ব যে কাল্পনিক, এমন কোন কথা নাই। বাহ্য সৌন্দর্য্যই যাহার কাছে সর্ব্বেসর্ব্বা, আমি বলি, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান তার বড় অল্প, সৌন্দর্য্যের হাটে তাহার দোকান-পাট গুটানই ভালো। বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে, হও, তাহা ভালবাসিবে, ভালবাস ;—কিন্তু মনে রাখিও, তাহাই সম্পূর্ণ নহে। সেই চর্ম্মচক্ষে-দৃষ্ট সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াই আবার ভিতরের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে যাইতে হইবে। যাহার বাহিরে কোন রূপ

---

* In Beauty, that of favour is more than that of colour ; and that of decent and gracious motion, more than that of favour...... No youth can be comely but by pardon."—Bacon's Essay on Beauty.

নাই, বুঝিতে হইবে কি, তাহার ভিতরও রূপহীন? সকল সময়ে তাহা ঠিক নহে। ভিতরে যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা বয়সের পরিণতির সহিত আরও ঘনীভূত হইতে থাকে। সে সৌন্দর্য্য অন্তরের। অন্তরের হইলেও, বাহিরে কিন্তু তাহার ছায়া পড়ে। সেই ছায়া ধরিয়া অন্তরতম প্রদেশে গিয়া দেখ, দেখিবে—সে হৃদয়ে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, তুমি ছাড়া আর কিছু নাই। ইহাই অন্তরের সৌন্দর্য্য। ইহার বাড়া সৌন্দর্য্য তুমি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারো না। বাহিরের শোভা,—বাহিরের রূপ,—বাহিরের আলো দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হও, সে দেখার সমাপ্তি নাই, পরিতৃপ্তি নাই; তবে অবসাদ আছে বটে। কিন্তু যে বাহির দেখিতে দেখিতে অন্তরের এই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, তাহার সকল সাধ—সকল আশাই মিটিয়াছে।

যৌবনের সৌন্দর্য্যরাশি যেন কতকটা দোকানদারি। বিলোল কটাক্ষ আছে, মধুর হাবভাব আছে,—কত হাসি, কত রসালাপ, কত রঙ্গই আছে! যৌবনের প্রথম বেগটা যখন প্রশমিত, সে চাঞ্চল্য যখন তিরোহিত, জিনিসটা যেন তখন খাঁটি হইয়া দাঁড়ায়। আরও অগ্রসর হও, দেখিবে—খাঁটি আরও খাঁটি হইতেছে। তখন বিদ্যাদিগ্‌গজের সেই রসিকতা-পূর্ণ 'ভাণ্ডস্থ ঘৃতের' উপমাটা * একটু গভীর অর্থে বুঝিয়া মনে করিও। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য যত কমিতেছে, দেখিবে—চিত্তের জমাট তত বেশীরূপে বাঁধিতেছে। সে অবস্থায় ঘোম্‌টার আর প্রয়োজন থাকে না।

* তিলোত্তমাকে দেখিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজ বলিতেন,—ইনি যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত, যখন অনল বত শীতল হইতেছে, দেহখানির তত জমাট বাঁধিতেছে।"—

বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী।"

ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া যে সৌন্দর্য্য দেখিবে, তাহা অন্তরের উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যরাশির পরিপুষ্টি করিতে থাকে। সেই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যরাশির প্রথম দৃশ্য—ঐ ঘোম্‌টায়। ঘোম্‌টা হইতেই আরম্ভ। আরম্ভটা উৎকৃষ্ট হইলে, প্রথম হইতেই মন তৎপ্রতি বড় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া, আরও ভিতরে যাও, অনন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার দেখিবে। আরও যাও, আরও দেখিবে। দেখিতে দেখিতে দেখিবে, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। সেই অনন্ত-সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, অনন্ত সৌন্দর্য্যের জ্ঞানে মুগ্ধ হইবে। আরম্ভ ঐ সোম্‌টায়। এতএব ঘোম্‌টা অনন্ত সৌন্দর্য্য-রহস্যের সুন্দর আবরণ।

ঘোম্‌টার পানে তাকাইলেই মনে হয়,—এই অবস্থাই বড় ভাবময়, বড় কবিত্বপূর্ণ। সংসারের কেবল একটা দিক্, এই ঘোম্‌টার ভিতর উঁকি মারে। সে সুখ, সে শান্তি, সে সম্পদ। সংসারের যে আরও একটা দিক আছে, তাহা বড় শীঘ্র এখানে আসিতে পায় না। তাই বধূর হাসিমুখ বড় সুন্দর দেখায়। তাই সে সুন্দর হাসি-মুখখানি ঢাকিয়া ঘোম্‌টা এত সুন্দর! সংসারের আপদে-বিপদে, যখনই যেমনই করিয়া চাহিবে, ঐ ঘোম্‌টা-ঢাকা হাসিমুখ, তখনই তেমনই প্রফুল্ল দেখিবে! প্রাণ জুড়াইবে, হৃদয় শান্ত হইবে, অন্তর পুলকে ভরিয়া উঠিবে! যদি রমণীর পূজা করিতে চাও, তবে ঘোম্‌টার পূজা করিও।

৩য় ভাগ

চিত্র-দর্শন *

বৈশাখী জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নির্ম্মল নীলাকাশে পূর্ণ-চন্দ্র হাসিতেছে। প্রতি হাসি-বিন্দু হইতে অজস্র-ধারে সুধারাশি ঝরিতেছে। সুধাপানে বিভোর হইয়া, দুই একটা প্রফুল্লহৃদয় পক্ষী, সুধাকণ্ঠে, মধুর গানে, আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছে। গাছে গাছে ফুল, ফুলের উপর জ্যোৎস্না! মৃদুমন্দ সমীরণ আসিয়া কুসুমসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। নদীহৃদয় কি আর স্থির থাকিতে পারে?—চন্দ্র-সন্দর্শনে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আনন্দে উছলিয়া পড়িতেছে, বুঝি বা চন্দ্রের সহিত মিশিয়া যাইবে! পৃথিবী কিন্তু ছাড়িতে চাহে না,—কি আকর্ষণে সে নদীকে টানিতেছে। তাই লহরীগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে, আর বিফলমনোরথ হইয়া, আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে পুলিন-প্রদেশে ঢলিয়া পড়িতেছে।

---

* মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত "উত্তরচরিত" নাটকের প্রথম অঙ্ক। সেই প্রথম অঙ্কে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে, তাহারই দুই একটা কথা,—পাঠককে উপহার দিলাম।

একবার, এমনই সময়ে, এই কৌমুদী-বিধৌত নদীসৈকতে আসিয়া দাঁড়াও! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রজনীর এই মধুর সৌন্দর্য্য-রাশি অবলোকন করো!

সহসা ঝড় উঠিল। নক্ষত্র নিবিয়া গেল, মেঘের অন্তরালে চন্দ্র লুকাইয়া পড়িল। চারিদিকে অন্ধকার। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। নিবিড় মেঘরাশির ঘনছায়া নদীবক্ষে পড়িয়া আরও ভীষণ হইল। হু-হু-হু করিয়া গম্ভীর হুঙ্কারে বাতাস বহিল; নদীহৃদয় তোলপাড় হইতে লাগিল; ফেনরাশি মাথায় লইয়া তরঙ্গ ছুটিল। বজ্রের গম্ভীর নিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই ভীষণ অন্ধকার দেখিবে তো, উপরের ঐ স্নিগ্ধ আলোক দেখিয়া লও। এই অন্ধকার বড়ই গভীর,—বুঝি অতলস্পর্শ অপরিসীম। যদি এই অন্ধকারে, এই ভীষণতার, ভীষণ ছায় দেখিয়া ইহার পরিণাম জানিতে অভিলাষী হও, তবে অগ্রে ঐ হাস্যময়ী রজনীর প্রফুল্লচিত্র ভালো করিয়া দেখিতে হইবে। দু'য়ের পার্থক্যে দু'য়েরই চিত্র উজ্জ্বল। আলোক না দেখিলে, অন্ধকারের ভীষণতা বুঝিতে পারিবে না।

ভবভূতি তাঁহার উত্তরচরিত নাটকের মধ্যে, এমনিতর দুই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঝটিকাপূর্ণা আঁধার রজনীর ভীষণতা দেখাইবার অগ্রে, তিনি বড় সুন্দর আর এক চিত্র দেখাইয়াছেন তাহাতে বড় স্নিগ্ধ আলোক;—সে এত মধুর যে, বুঝি তাহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই ভীষণ ছবি এত ভীষণ দেখি!

সীতা-বিসর্জ্জন ও সীতাবিরহে রামের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা—সে ভীষণ চিত্র। আর, সীতা ও রামের সে মধুর প্রগাঢ় প্রণয়—এ

সুন্দর চিত্র। সীতাবিসর্জ্জন, রামের যে কি ভয়ানক হৃদয়বিদারক ব্যাপার, সেই কথা বুঝাইবার জন্য, কবি বড় অদ্ভুত কৌশলে তাহার অগ্রে সীতা ও রামের এই প্রগাঢ় প্রণয়-ব্যাপার প্রকটিত করিয়াছেন। এই প্রণয় বড় সহজ নহে, আর এই নির্ব্বাসন ব্যাপারটাও বড় সামান্য নহে। নির্ব্বাসনের এই অনন্ত যন্ত্রণা বুঝাইবার জন্যই, প্রণয়ের এই অলৌকিক মাধুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

বনবাস হইতে, অনেক দিন হইল, রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। যে মহোৎসবে অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণা ছিল, অভিষেক-সমাপনান্তে তাহাও মন্দীভূত হইয়াছে। কৌশল্যা প্রভৃতি সকল জননী, কুলগুরু বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই,—জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞদর্শনে গিয়াছেন। সীতা পূর্ণগর্ভা, তিনি যজ্ঞদর্শনে যাইতে পারিলেন না, অযোধ্যাতেই রহিলেন, তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য রামও রহিলেন। আর সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রণে বনে, সর্ব্বত্রই ছায়ার মত যিনি রামের অনুগামী হইয়াছেন,—সেই ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও অযোধ্যায় রহিলেন।

কিছুদিন হইল, রামের অভিষেক উৎসবে, রাজর্ষি জনক, বাৎসল্য বশতঃ জামাতার অভিষেক দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন। পিতৃবিরহে সীতা কাতরা; রাম, পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ একখানি চিত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সীতার চিত্তবিনোদন জন্য সেই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই চিত্রদর্শন হইতে, এই প্রথম অঙ্কের নামকরণ হইয়াছে—"চিত্রদর্শন"।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লক্ষণ, চিত্র কতদূর পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে?" লক্ষ্মণ বলিলেন,—"আর্য্যার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত।"

সেই অগ্নিপরীক্ষা! সীতার সতীত্বের সেই ভীষণ পরীক্ষা! শুদ্ধস্বভাবা, নির্ম্মলচরিত্রা, অকলঙ্কসতী সীতাদেবীর সেই অগ্নি-পরীক্ষার কথা রামচন্দ্রের মনে পড়িল। তখন তিনি আপনাকে আপনি বড়ই ঘৃণা করিলেন, সীতার সেই প্রেমপরিপূর্ণ স্বর্গীয় মুখ-পানে চাহিয়া মরমে মরিয়া গেলেন, আত্মতিরস্কার করিতে লাগিলেন;—

> নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
> মূর্দ্ধি স্থিতির্ন চরণৈরবতাড়নানি।

"সুরভি-কুসুম মস্তকে রাখিবার উপযুক্ত; তাহা চরণে দলন করিবার কখনই যোগ্য নহে।"

রামের কাতরতা দেখিয়া, সীতা বলিলেন কি?—"হোদু অজ্জউত্ত! হোদু, এহি পেক্‌খম্ক দাব দে চরিদং।"—"তা হোক্, আর্য্যপুত্র! তা হোক্; এখন এস, তোমার চরিত্র-লেখাটি কেমন হইয়াছে দেখি।"

"তা হোক্, আর্য্যপুত্র! তা হোক্"—এই কথাটি কত মধুর সীতা নিরপরাধা, তথাপি তাঁহাকে সেই ভীষণ পরীক্ষা দিতে হই-য়াছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁহার কোন কষ্ট নাই।

সীতা জানিতেন, পরীক্ষা প্রদান ব্যতীত লোকাপবাদের হস্ত হইতে তিনি আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। লোকানু-রঞ্জনই রামের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। লোকানুরঞ্জনের জন্য তিনি কি না করিতে পারেন?—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।"

"লোকানুরঞ্জনের নিমিত্ত যদি আমাকে স্নেহ, দয়া, সকল প্রকার সুখ, এমন কি, সীতাকেও পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাহাতে আমার দুঃখ নাই।"

লোকাপবাদ-পরিহার-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই রাম, ভার্য্যার বিশুদ্ধতা জানিয়াও, তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরীক্ষায় সতী জয়ী হইলেন। রামও লোকানুরঞ্জন করিয়া, সুখী হইলেন।

স্বামী সুখী হইয়াছেন, স্বামীর সুখেই তাঁহার সুখ। স্বামীর প্রতি সেজন্য তাঁহার অভিমানও নাই, রাগও নাই।—"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী; রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ।"

লক্ষ্মণ, চিত্রসন্নিবেশিত মিথিলা-বৃত্তান্ত দেখাইলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চারি ভ্রাতায় বিবাহ করিতে বসিয়াছেন। চিত্রের সেই স্থানটি দেখিয়া সীতার সেই বিবাহব্যাপার মনে পড়িল; মনে হইল যেন, তিনি আবার সেই স্থানে, সেই বিবাহ সময়েই বসিয়া আছেন। রামের মনেও তাহাই হইল; মনে হইল, যে সময়ে সীতার সেই কঙ্কনশোভিত কোমল করপল্লবে কর মিশিয়াছিল, আজও যেন আবার সেই সময় আসিয়াছে। দম্পতিপরস্পরের সে মনোভাব কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর!

তার পর লক্ষ্মণ দেখাইতেছেন,—"এই আর্য্যা সীতা বসিয়া আছেন, এই আর্য্যা মাণ্ডবী এবং এই কল্যাণী শ্রুতকীর্ত্তি।" লক্ষ্মণ আর উর্ম্মিলাকে দেখাইলেন না। তাঁহার লজ্জা হইল; বুঝিলেন, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে তাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হয়। কিন্তু সীতা ছাড়িবেন কেন? তিনি উর্ম্মিলার চিত্রপানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলি-

লেন,—"বচ্ছ! ই অং বি অবরা কা?" বৎস! এই আর একটি এখানে কে রহিয়াছে?" লক্ষ্মণ লজ্জায় ঈষৎ হাস্য করিলেন।

কেমন মধুর কৌতুক!

মিথিলা হইতে অযোধ্যার পথে, লক্ষ্মণ দেখাইলেন, "আর্য্যে! এই দেখুন, ভার্গব দাঁড়াইয়া আছেন।"

সীতা। আমার ভয় হইতেছে।

লক্ষ্মণ। এই দেখুন, আর্য্য রামচন্দ্র কর্ত্তৃক—

রাম বাধা দিয়া বলিলেন, "অয়ি বহুতরং দ্রষ্টব্যমস্তি অন্যতো দর্শয়"—লক্ষ্মণ! দেখিবার অনেক জিনিসই আছে, চিত্রের অন্যত্র দেখাও।"

পাঠককে একবার সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, রামচন্দ্র ও ভার্গবের সেই পরস্পর সন্দর্শন ব্যাপারটা স্মরণ করিতে হইবে। আত্ম-শ্লাঘাবিমুখ রামচন্দ্রের কি মধুর চরিত্র! এইখানে সেই চরিত্র কি উজ্জ্বলরূপেই ফুটিয়াছে! এমন আর দেখিব কি?

সীতার মতো আমরাও বলি,—"সুট্‌ঠু সোহসি অজ্জউত্ত! এদিণা বিণঅমাহপ্পেণ।" এই বিনয়াতিশয্যে আর্য্যপুত্র! কি সুন্দর শোভাই পাইতেছ!"

আর সীতার এই কথাতেই বা কি ভালবাসা!

মিথিলার পর অযোধ্যায় আগমন। রামের সেই পূর্ব্বের দিন মনে পড়িতে লাগিল। তখন রাজা দশরথ জীবিত ছিলেন। রাম, সীতাকে লইয়া, নববিবাহের নূতন নূতন আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেছেন; জননী, লাবণ্যপ্রতিমা পুত্রবধূ সীতাকে কত যত্ন, কত আদর, কত স্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন;— একে একে সেই সব রামের মনে পড়িতে লাগিল। সীতা তখন

বালিকা, রূপের রাশি দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে, কুন্দ-নিন্দিত দন্তগুলিতে সুন্দর মুখের কি সুন্দর শ্রী বর্দ্ধিত হইতেছে, অলকাগুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া নির্ম্মল মুখমণ্ডলের উপর আসিয়া পড়িতেছে; সেই সকল দেখিয়া কৌশল্যা প্রভৃতির প্রাণে কি আনন্দলহরী নাচিয়া উঠিত!—সেই সব, বাল্যের অতীত স্মৃতি, রাম ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

তাহাতেই বা কত প্রেমের পরিচয়।

লক্ষ্মণ দেখাইলেন,—"এই মন্থরা।" রাম যেন তাহা শুনিতেই পাইলেন না, চিত্রের অন্যদিকে সীতার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। লক্ষ্মণ অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে, ইচ্ছা করিয়াই রাম সে প্রসঙ্গ তুলিতে দিলেন না। মন্থরার কথা হইতেই কৈকেয়ীর বৃত্তান্ত মনে আসিবে। বিমাতার সেই রাজ্যলাভেচ্ছা, বৃদ্ধ পিতার সেই কাতরতা, অযোধ্যাবাসীর সেই হাহাকার,—আবার তো সেই সব মনে পড়িবে। বিমাতার প্রতি ঘৃণায় নহে,—পরন্তু সে বড় দুঃখের কথা,—তাই তাহা চাপা দিবার জন্যই রাম মন্থরার প্রসঙ্গে মনোযোগ করিলেন না।

তারপর, তাঁহাদের বনবাস চিত্রিত হইয়াছে। গঙ্গার পবিত্র শোভা দেখিয়া সীতা মুগ্ধ হইলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতের পথে, লক্ষ্মণ দেখাইলেন, কালিন্দী নদী-তীরে সেই শ্যামবট রহিয়াছে। রাম, সস্পৃহলোচনে সেই বৃক্ষপানে চাহিয়া রহিলেন। কেন জানো? সেই বৃক্ষতলে পথশ্রান্তা কোমলাঙ্গী সীতা, প্রিয়তমের বক্ষে শয়ন করিয়া, পথশ্রান্তি দূর করিতেন! যেমনই পথশ্রান্তি, তেমনই সে শ্রান্তিবিনোদনের উপযুক্ত স্থান! সীতার যে তাহাতে কত আনন্দ, কত সুখ হইত, তাহা সীতা ভিন্ন আর কে বুঝিবে! সীতা

কি তাহা ভুলিতে পারেন? তিনি ভুলেন নাই। রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যপুত্রের কি এ স্থানটা মনে পড়ে?"

রাম বলিলেন,—"অয়ি কথং বিস্মর্য্যতে?

অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসম্পাতখেদা-
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥"

—"প্রিয়তমে, এস্থান কি ভুলিতে পারি? এইস্থানে তুমি পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া, তোমার আলস্য-শিথিল, মৃদিতমৃণালীর তুল্য দুর্ব্বল অঙ্গ সকল আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলে এবং গাঢ় আলিঙ্গনে আমি তোমার গাত্রমর্দ্দন করিয়াছিলাম,—তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে?—এ সকল কি ভুলিবার?"

এই কথাতে কত প্রেম! প্রাণের কত ভাবই এই কথাতেই পরিব্যক্ত হইয়াছে!

আবার দেখ। গোদাবরীতট স্মরণ করিয়া রাম, প্রিয়াকে বলিতেছেন,—"এই স্থানে আমরা দুইজনে কপোলে কপোল, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া পরস্পরে পরস্পরের আলিঙ্গন-সুখে কেমন মগ্ন থাকিতাম, মৃদুমন্দস্বরে প্রাণের কত কথাই বলিতাম! কোথা দিয়া রাত্রি পোহাইয়া যাইত, বুঝিতে পারিতাম না!"

প্রেমের কতখানি ভাব এখানে প্রকাশিত হইয়াছে! সেই বনবাসক্লেশ, সেই পথশ্রান্তি, সেই অনাহার—অর্দ্ধাহার, সেই আত্মীয়স্বজন-বিরহ,—সে সকলের মাঝেও এমনই আনন্দ, এমনই সুখ ছিল!

লক্ষ্মণ এবার দেখাইলেন,—"এই পঞ্চবটী বন, এই শূর্পণখা।"

শূর্পণখার চিত্র দেখিয়াই সীতার ভয় হইল! তিনি যে চিত্র দেখিতেছেন, সে কথা মনে রহিল না। সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন,—"হা অজ্জউত্ত! এত্তিঅং জ্জেব দংসণং!"

"হা নাথ! এই বুঝি তোমার সহিত শেষ-দেখা!" রাম বলিলেন,—"প্রিয়ে! বিরহের এত ভয়?—এ যে চিত্র!"

বালিকার মতো সীতার এই ভীতিভাবটি বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। ভয় হইবে না? একবার সে কাণ্ডটা মনে করিয়া দেখ দেখি!

কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা'কথাও আছে। কবি, সীতার এই আশঙ্কাটা দেখাইয়া, অতি শীঘ্রই যে বড় একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, এখন হইতে অল্পে অল্পে তাহার সূচনা করিতেছেন। নির্ম্মল আকাশের এক প্রান্তে একটু একটু করিয়া মেঘ জমিতেছে!

রাম চিত্রপানে চাহিয়া আছেন। চিত্রদর্শনে জনস্থানের বৃত্তান্তটা যেন বর্ত্তমানের ন্যায় তাঁহার বোধ হইতেছে। পাপ রাক্ষস সুবর্ণ মৃগের বেশ ধারণ করিয়া কি অনর্থই ঘটাইয়াছিল,—সেই সকল স্মরণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের মন অস্থির হইতেছে। রাম, সীতাবিরহে, আকুল ক্রন্দনে, পাষাণও বিগলিত করিয়াছিলেন,—লক্ষ্মণ সেই সকল বলিতেছেন। তাহা শুনিয়া সীতা বলিতেছেন,—"হা নাথ! আমার জন্য কি কষ্টই না তুমি ভোগ করিয়াছ!"

রামের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ! লক্ষ্মণ দেখিলেন, রাম উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। এ ক্রন্দন, এ আঁখিজল,—কেন বলো দেখি?

এখন আর দুঃখ কি? রাম তো এখন রাজা, বনবাস-জনিত

সকল ক্লেশই তো গিয়াছে। জীবনের জীবনস্বরূপিণী, সংসার-সঙ্গিনী, হৃদয়ের অমূল্যনিধি প্রিয়তমা সীতা,—যাঁহার বিরহে এক-দিন তিনি পৃথিবী শূন্য দেখিয়াছেন, হাহাকারে চারিদিক্ পূর্ণ করিয়াছেন, আজ সেই সীতাও—তাঁহার পার্শ্বে! রামের এখন তো আর কোন দুঃখ নাই। তাঁহার সুখ এখন পূর্ণমাত্রায়। তবে এ আঁখিজল কেন?

দেখ, সুখে থাকিয়া যাহাকে কখন দুঃখের ছায়া স্পর্শ করিতে হয় নাই, তাহার সুখ সম্পূর্ণ সুখ মনে করিও না। যে বড় সুখী, সুখের সময় একবার তাহাকে, অন্ততঃ অতীতের কোন দুঃখময় ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। দুঃখ ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা নাই। আর সুখের সময় বিগত দুঃখের যে স্মৃতি, তাহা সুখীকে যত অধিক পরিমাণে সুখী করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পরে না।

রামের এখন দুঃখ নাই, বরং সুখ আছে। কিন্তু এই সুখের মাঝে প্রিয়াবিরহজনিত সেই অতীত দুঃখ সকল তাঁহার স্মৃতিমাঝে বিশেষরূপে জাগিতেছে। জাগিয়া জাগিয়া একটু যন্ত্রণাও দিতেছে বৈকি! কিন্তু সে যন্ত্রণা, এ সুখের মাঝে বড় মধুর! এই বর্ত্তমান সুখের পূর্ণমাত্রা দেখাইবার জন্যই, কবি এমন সুখের মাঝেও আঁখিজল দেখাইলেন।

আর রামের এ আঁখিজল,—সীতার চক্ষে কি সুন্দর! সে অশ্রুবিন্দুতে কি রামের সীতাময় জীবনের সমস্ত ভাগটাই প্রতি-বিম্বিত হইতেছিল না?

তারপর একে একে চিত্রের আরও কত স্থান দেখিলেন। পম্পা-সরোবরের রমণীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাম মুগ্ধ হইলেন। সরোবরবক্ষে রাজহংসী মনের আনন্দে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি-সন্তাড়িত হইয়া মৃণালফুল ঈষৎ কাঁপিতেছে,—বড় সুন্দর শোভা! সীতাহারা হইয়া, অশ্রু-পরিপ্লুতনেত্রে রাম এই সরোবর পানে চাহিয়া, তখন ইহার অতি সামান্য সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছিলেন। সীতাকে সেই সকল বলিতে লাগিলেন।—কথায় কথায় কত প্রেম!

মাল্যবান্ পর্ব্বত-পানে চাহিয়া সীতা চিনিতে পারিলেন না,—এ কোন্ পর্ব্বত। লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! এই যে পর্ব্বত, যাহার উপর কুসুমিত কদম্বশাখায় বসিয়া ময়ূরগণ নাচিতেছে,—এই পর্ব্বতের নাম কি? দেখিতেছি, বৃক্ষতলে বসিয়া, আর্য্যপুত্র আকুলপ্রাণে কাঁদিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আর তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।—আহা! আমার আর্য্যপুত্রের আর সে শরীর নাই, সে লাবণ্য নাই, তাঁহাকে যেন আর চেনাই যাইতেছে না!"

কি সুন্দর সুমিষ্ট কথা! যাহার জন্য রামের এই দশা, সেই আজ বিরহক্লিষ্ট রামের সেই তাৎকালিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছে! স্নেহময়ীর প্রাণে কি ভাব জাগ্রত হইতেছে, ভাবিয়া দেখ দেখি! রাম আবার সেই মুখপানে চাহিয়া কি আনন্দ উপভোগ করিতেছেন,—তাহাও একবার ভাবো দেখি!

অরণ্যবাসের প্রত্যেক ঘটনাই চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। রাম আর দেখিতে পারিলেন না, পদে পদে তাঁহার সীতাবিরহ মনে পড়ে, হৃদয় আকুল হয়!

সীতা পূর্ণগর্ভা। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্র দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্রান্তি হইল। লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার এই ভাব দেখিয়া চিত্র দেখাইতে বিরত হইলেন।

কি মধুর চিত্রই দেখিলাম! এমন আর কোথায় দেখিব? এমন অপূর্ব্ব বর্ণে রং ফলাইয়া, এমন চিত্র আর কে দেখাইয়াছে? এই চিত্রে কেবল সীতার চিত্তবিনোদন হয় নাই, যে কেহ এ চিত্র দেখিয়াছে, সেই-ই মুগ্ধ হইয়াছে! দুঃখে, দারিদ্র্যে, শোকে, সন্তাপে যে কোন অবস্থায় পড়িয়া, যে কেহ এ চিত্র দেখিয়াছে, সে সেই মুহূর্ত্তেই সে অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে!—দুঃখ ভুলিয়া, সুখ পাইয়াছে, শোক ভুলিয়া, শান্তি পাইয়াছে; মর্ম্মকাতরতা ভুলিয়া, নির্ম্মল আনন্দ পাইয়াছে! ভাবো দেখি একবার,—কি চিত্র-নৈপুণ্য!

আবার এই চিত্রদর্শনের ভিতর দিয়া, কি প্রগাঢ় প্রণয়-ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে, ভাবো দেখি! কথায় কথায় প্রেম উছলিতেছে! তীর অতিক্রম করিয়া, সাগরবারি যেমন উছলিয়া পড়ে, হৃদয় উন্মুক্ত পাইয়া, প্রেমরাশিও আজ তেমনই করিয়া উছলিয়া পড়িতেছে! বাল্যকাল হইতেই এই প্রেমের বীজ; কালসহকারে সে বীজ হইতে কি অঙ্কুর, সে অঙ্কুর হইতে কি বৃক্ষ, সে বৃক্ষে কি ফুল ফল, সে ফুল ফলে কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্যে পরস্পরের হৃদয় কেমন মুগ্ধ, কত দৃঢ় বন্ধনে জড়িত,—এই চিত্রদর্শনের ভিতর দিয়াই সে সকল কেমন ফুটিয়াছে,—একবার ভাবো দেখি! ধন্য চিত্রকর, ধন্য তোমার লিপিচাতুর্য্য!

চিত্রের আর একটা সৌন্দর্য্য দেখ। একের পর একটি করিয়া কত দৃশ্যই দেখিয়া গেলাম। নয়ন এক দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে যাইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাণের অতি নিভৃতদেশে, একটু একটু তরঙ্গ উঠিতেছে! চিত্র হইতে নয়ন অন্যদিকে ন্যস্ত করি, হৃদয়োত্থিত তরঙ্গ কিন্তু থামে না। ইহাই চিত্রকরের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, অলৌকিক নৈপুণ্য, অমানুষী প্রতিভা!

চিত্রদর্শনে সীতার মনে এক অভিলাষ জন্মিল। তাঁহার ইচ্ছা, আবার একবার সেই নির্জ্জন ও মনোহর বনস্থলে যাইতে পান! অরণ্যানীর সেই শ্যামশোভা, গাছে গাছে, লতায় লতায় সেই মনোহর সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের পদপ্রান্তে সেই স্বচ্ছহৃদয়া নদী সকল, ভাগীরথীর সেই শীতল, সুস্নিগ্ধ, নির্ম্মল সলিলে অবগাহন,—সে সকল স্মরণ করিয়া, আবার একবার সেই সকল দেখিতে সীতার বড় সাধ!

কবির কৌশলটাও বুঝিও। এই সুনির্ম্মলা, জ্যোৎস্না-পরিপূর্ণা হাস্যময়ী রজনী, ভয়ঙ্করী করিবার জন্য, অতি নিকটেই যে নিবিড় মেঘের সঞ্চার হইতেছিল,—এখন হইতে কবি কেমন করিয়া তাহার আভাষ দিতেছেন! কিন্তু এখন সেদিকে চাহিও না।

সীতার অভিলাষ শুনিয়া, রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে রথ সজ্জিত রাখিতে বলিলেন।

সীতা। "অজ্জউত্ত! তুম্হেহিং বি তহিং গন্তব্বং।"—"আর্য্যপুত্র! তোমাদিগকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

রাম। "অয়ি কঠিনহৃদয়ে! ইহাও কি আবার তুমি বলিয়া দিবে?"

কি আদর, কি স্নেহ, কি প্রেম!

সীতার নিদ্রা আসিল। নিদ্রালসা সীতার বাহুলতা কণ্ঠে স্থাপন করিয়া, আনন্দ-নিমীলিতনেত্রে রাম বলিলেন,—

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতিবা"—"ইহা কি আমার সুখ, না দুঃখের অবস্থা? বুঝিতে তো পারিতেছি না!"

সীতার বাহুলতা কণ্ঠে জড়াইয়া, রামের যে আনন্দ,—সে আনন্দ, রাম না হইলে, অন্যের বুঝা কঠিন। রাম বুঝিতেই পারি-

তেছেন না—ইহা সুখ, কি দুঃখ! যখন আশার অতীত সুখে প্রাণ ভরিয়া যায়, তখন বুঝি এমনই মনে হয়!

সীতার ফুল্লাধরে মধুর হাসি খেলিল, সে হাসিই বা কি সুন্দর!

নিদ্রা-কাতরা সীতা, রামের বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিতা হইলেন। বাল্যবিবাহের পর, ঐ রামবাহুই সীতার উপাধান—আজও তাহাই সীতার উপাধান।

রামের বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, সীতা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। রাম, সেই ঘুমন্ত মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। চন্দ্রসন্দর্শনে সাগরবারি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, প্রেমময়ী সীতার সে পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে, রামের হৃদয়ও তেমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! সেই আনন্দোচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে রাম ভাবিতেছেন,—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥

——"প্রিয়তমা আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরূপ; চন্দনলেপন তুল্য ইহাঁর অঙ্গস্পর্শ আমার সুখপ্রদ, ইহাঁর বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল ও কোমল মুক্তাহারসদৃশ। প্রিয়ার আমার কোন্ বস্তুটি না সুন্দর? কেবল ইহাঁর বিরহই আমার অসহ্য!"

এখানে সম্পূর্ণ সুখের সম্পূর্ণ ভোগ!

কি সুখের অবস্থা,—একবার ভাবো দেখি! এত সুখ বুঝি কাহারও ভাগ্যে ঘটে না! প্রেমময়ী ভার্য্যাকে বুকের ভিতর করিয়া রাখিয়া, সে মুখপানে চাহিয়াই যে এত সুখ, তা নহে।

সীতা রামের কি অমূল্য নিধি,—একবার ভাবিয়া দেখ। বাল্যে, যৌবনে, গৃহে, বনে সকল সুখ পায়ে ঠেলিয়া, সকল দুঃখ বুকে চাপিয়া, সীতা কেবল রামের মুখ চাহিয়া কত না সহিয়াছেন! সীতার কষ্ট কি সাধারণ কষ্ট!—তেমন দুঃখ কি আর কাহারও ভাগ্যে কখন ঘটিয়াছে? সেই হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্যে বাস, পর্ণকুটীরে পল্লবশয্যায় শয়ন; অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিনপাত, পথ-শ্রান্তি;—সে সকল একবার মনে করো।—সীতা সে দুঃখে একদিনও ব্যথিতা হন নাই, একদিনও তাঁহার মুখে শুনি নাই,—"আর সহ্য হয় না।" রামের পার্শ্বে বসিয়া, রামের মুখ চাহিয়া, তিনি দুঃখকে কখনও দুঃখ বলিয়া বুঝিতেন না। তিনি জানিতেন, জগতে এমন দুঃখ কি আছে, যাহা পতির মুখ চাহিয়া সহ্য করা না যায়? এমন প্রেম-প্রতিমা কখন দেখিয়াছ কি? আবার সেই পতিই তিনি হারাইলেন! পতিহারা হইয়া সতী কি যন্ত্রণাই না পাইলেন! অশোকবনের সে মূর্ত্তিখানি, কেহ কি কখন ভুলিবে? তার পর, কতদিনের পর যখন পতির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল,—দুঃখরজনীর কি অবসান হইয়া গেল? আজন্ম-পবিত্রা, সতীর আদর্শস্থানীয়া,—সেই সীতাদেবীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইল! যেমন তেমন পরীক্ষা নহে,—অগ্নি-পরীক্ষা! পরীক্ষায় সতীর জয় হইল।—এত সত্ত্বেও, একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি তাঁহার মুখে কোন বিরক্তির কথা শুনিয়াছ? পুণ্য, পবিত্রতা ও পতি-প্রেমের এমন সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আর কোথায় দেখিব? বুঝি, সমগ্র পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্য একদিকে রাখিলেও, সীতার সহিত তুলনা হয় না! এমন না হইলে কি ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তস্তলে এ মূর্ত্তি এমন করিয়া বসিতে পারিত?

এখন একবার ভাবিয়া দেখ, রামের বুকের ভিতর এই প্রেম-প্রতিমা নিদ্রিতা, আর রাম সে প্রতিমার পানে চাহিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখ উপভোগ করিতেছেন! কিন্তু হায়! সকল সুখেরই সীমা আছে! এত সুখ উপভোগ করা বুঝি বিধাতার বিধান নহে!

সীতা ঘুমাইতেছেন। আকাশেও বড় ঘন কালো একখানা মেঘ উঠিল! পাঠক, সে মেঘের পানে চাহিয়া চিনিতে পারিয়াছেন,—সে মেঘ দুর্ম্মুখ! দুর্ম্মুখ আসিয়া রামকে সীতাপবাদ শুনাইল।

মেঘে আকাশ ছাইল, চন্দ্র মেঘান্তরালে লুকাইল, তারা নিবিয়া গেল, সহসা ঝড় উঠিল!

চিত্রদর্শনের ভিতর দিয়া, সুখের চূড়ান্ত দেখিয়াছি, এখন তাহার বিপরীত দেখিতে হইবে! হায়! পৌর্ণমাসীর পর আবার অমাবস্যার আবির্ভাব!

দুর্ম্মুখের কথায়, রামের মস্তকে বজ্রপাত হইল! অথবা বজ্রাঘাতেও বুঝি সে যন্ত্রণা নাই—সীতার চরিত্রে অপবাদ! যাঁহার পবিত্র-চরণস্পর্শে ত্রিভুবন পবিত্র, তিনি লোকাপবাদের আধার হইলেন! রামের সে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা, সে অরুন্তুদ ক্রন্দন,—বর্ণনার জিনিষ নহে। সে যে কি কষ্ট, কি দুঃখ, বুঝি ভাষায় সে কথা নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্রও লোককে বুঝানো যায়!

রাম চারিদিকে চাহিলেন,—চারিদিকেই অন্ধকার! বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেমন প্রবল জলের স্রোত চলিয়া যায়, সীতাপবাদ তেমনি করিয়াই লোকমুখে বিস্তৃত হইতেছে;—রাম চারিদিক্ হইতে তাহা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল!

শেষ ঐখানেই নহে। ও-বা কি দেখিলে? দেখিবে তো, এইবার দেখ! রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন!—সোণার প্রতিমা, বুকের ভিতর হইতে বনে বিসর্জ্জন করিলেন!—নিদ্রিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন!

সীতা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হা নাথ! কোথায় চলিয়া গেলে?"

সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে তো কেহ নাই;—তিনি একাকিনী! রাম তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছেন?—"হৌক, তাঁহার উপর রাগ করিব; কিন্তু যদি তাঁহাকে দেখিয়া ভুলিয়া না যাই।"

সীতার কি রাগ আছে? না রামের প্রতি চাহিলে রাগ আর তাঁহার মনে থাকে?

রাম সীতাকে বনে পাঠাইলেন। সীতা তখন জানেন না যে, রাম তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করিলেন!

এই ঘটনা যে কি হৃদয়-বিদারক, তাহা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুদক্ষ কাব্য-চিত্রকর বড় সুন্দর আঁকিয়াছেন;—"সীতার নির্ব্বাসন সামান্য ব্যাপার নহে। স্ত্রী বিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন,—ভাল বাসুক, বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, নয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক, বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে

বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা,—ভাল বাসুক, বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল-বাসে? পত্নী-বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে? তাহার কি কষ্ট, কি জীবন-সর্ব্বস্ব ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা।"—বুক যে ফাটিল না, সে কেবল রামের বুক বলিয়া! প্রাণ যে গেল না, সে বুঝি এই শিক্ষা দিবার জন্য যে, সমুদ্র ভিন্ন বাড়বানল আর কে ধারণ করিবে?

সীতা রথারোহণ করিলেন। "ণমো ণমো তবোধণাণং ণমো ণমো অজ্জউত্তচরণকমলাণং ণমো ণমো সঅলগুরুঅণাণং"—তপো-ধনদিগকে নমস্কার, আর্য্যপুত্রের চরণ-কমলে নমস্কার, সকল গুরুজনদিগকে নমস্কার।" সকলকে নমস্কার করিয়া, পূর্ণগর্ভা সতী রথারোহণে বনগমন করিলেন। আর কি ফিরিয়া আসি-বেন? রাজপুরী কি আর সে পবিত্র-চরণস্পর্শে কৃতার্থ হইবে? আর কি সে লক্ষ্মী-হাস্যে অযোধ্যা হাসিতে থাকিবে? হা রাম! অকলঙ্ক-চরিত্রা নিষ্পাপ-হৃদয়া, পতিগত-প্রাণা জানিয়াও তুমি গর্ভিণী,—স্নেহময়ী ভার্য্যাকে কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন করিলে?

পাঠক, ইতিপূর্ব্বে "চিত্র-দর্শন" সময়ে, যে সুখ উপভোগ করিয়াছ, এইবার একবার তাহা স্মরণ করো। এই মহাদুঃখ কি মর্ম্মভেদী, বুঝিতে চেষ্টা করো!—কি নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাত্রে, নির্ম্মল আকাশতলে দাঁড়াইয়া, চন্দ্রকরোজ্জ্বল গঙ্গাশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, সহসা কি ঘনমেঘেই আকাশ ঢাকিয়া দিল! প্রকৃতির হাসিমুখে কি ভীষণ বিষাদছায়া পড়িল! এই দুঃখের

গম্ভীরতা বুঝাইবার জন্যই কবি, তেমন সুখের ছবি দেখাইয়াছিলেন!—হায় রে! কে না জানে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ-শিখা যে এত উজ্জ্বল, সে কেবল আপন জীবনাবসানে অন্ধকারের গাঢ়তা বৃদ্ধি করিবার জন্য!

কবি এইখানেই নিরস্ত হন নাই। তার পরের কথা, পর-প্রবন্ধে বিবৃত হইল।

ছায়া-সীতা *

অগ্নিই কেবল স্বর্ণের দোষ বা গুণ পরীক্ষা করিতে সমর্থ। জগতের যত শোক, যত দুঃখ, যত কষ্ট,—তাহাতেই মানব-চরিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে। দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া, যাহাকে কখন চলিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলেও, সম্যক্‌রূপে তুমি তাহাকে বুঝিতে পারিবে না,—কিছু বাকি থাকিবেই। শোক, তাপ, দুঃখ যন্ত্রণা,—মানুষের হৃদয় খুলিয়া দেয়। যদি কাহারও হৃদয় দেখিতে চাও, তো সুখের কিরণে তাহা দেখিও না; দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই তাহা দেখিও। আমাদিগের আর্য্যকবিগণ তাঁহাদিগের কাব্য মধ্যে এত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, এত দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, আর কোন দেশের কোন কবি সেরূপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা তাঁহাদিগের কাব্য-চিত্রিত নায়কনায়িকাগণের প্রকৃতহৃদয় পাঠকের চক্ষে ধরিবার জন্য, পৃথিবীর যত ক্লেশ, যত যন্ত্রণা, তাঁহাদিগের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন অগ্নি-

* "উত্তরচরিত" নাটকের' তৃতীয় অঙ্ক।

পরীক্ষা হইতে আপন উজ্জ্বল কিরণে প্রকাশিত হইয়া, আপনার নির্ম্মলত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, উন্নত ও মহৎ হৃদয়ও তেমনি শত শত দুঃখের ভিতর দিয়াও কাহারও এবং কোনও অবস্থার দ্বারা অনুশাসিত না হইয়া, আপনার বলে, আপনি চলিয়া যায়।

ইউরোপীয় কাব্যেও দুঃখ-যন্ত্রণার অনেক চিত্র আছে। কিন্তু দুঃখভোগে তেমন সহিষ্ণুতা, তেমন ধৈর্য্য, তেমন সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস,—আর বলিব কি, তেমন আনন্দ, ইউরোপীয় কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ! আর্য্যকবি, দুঃখের উপর দুঃখের মাত্রা চড়াইয়া দিয়া, অন্ধকারের উপর আরও অন্ধকার ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার নায়ক-নায়িকাকে উজ্জ্বলতর আলোকে প্রকাশিত করেন। তখন সেই নায়ক নায়িকাকে এমনই দেখিতে হয় যে, যেন কোন বাহ্য ঘটনা তাঁহাদিগকে অণুমাত্র অনুশাসিত করিতে সমর্থ হয় নাই!

রামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সীতার সহিত মিলিত হইলেন, রাজ্যলাভ করিলেন; কিন্তু সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এত দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর দিয়া, এত কঠোর পরীক্ষার মাঝে ফেলিয়া দিয়াও, কবি তাঁহাকে ছাড়িলেন না;—কবির বুঝি এখনও আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তিনি আবার এক যন্ত্রণার মধ্যে রামচন্দ্রকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এ কঠোর যন্ত্রণা—এ ভীষণ পরীক্ষা দেখিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইল! রামচন্দ্র নিরপরাধা সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিলেন! কি দারুণ আঘাত যে তাঁহার বুকে লাগিল,—তাহা আর কে বুঝিবে? কিন্তু মর্ম্মাহত হইলেও কি রামচন্দ্র কোন দিন কর্ত্তব্যসাধনে, রাজকার্য্য-পালনে,

প্রজাশাসনে, কোন দিন কোন প্রকার অবহেলা করিয়াছেন? সীতাবিরহ তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিয়াছে, সীতাশোকে তাঁহার বুকে দিবানিশি আগুন জ্বলিতেছে, কিন্তু তখনও তিনি শরণার্থীর আশ্রয়, পাপের দণ্ডকর্ত্তা, প্রজামণ্ডলীর রক্ষক! তখনও তিনি সেই কর্ত্তব্যব্রত মহাবীর রামচন্দ্র! কবি দেখাইলেন, এত দুঃখেও তাঁহার রামচন্দ্রের ভাবান্তর হইল না!—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল!

রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিলেন। সে সব কথা বলিয়াছি। তাহার পর বলিয়াছি, কবি সেইখানেই নিরস্ত হন নাই। এখন সেই সব কথা বলিব।

সীতা, বনে পরিত্যক্ত হইলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন অসহায়া, গর্ভিণী সীতা আপন অবস্থা বুঝিলেন, হাহাকারে অরণ্যানী পূর্ণ করিলেন। পাঠক, কল্পনার চক্ষে, সেই নিবিড় অরণ্য মাঝে সেই অসহায়া, পূর্ণগর্ভা, সীতাদেবীর সেই করুণ-মূর্ত্তিখানি দেখ,—কখন কি তাহা ভুলিতে পারিবে? রাজনন্দিনী, রাজপত্নী,—আজ তাঁহার এই দশা! অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই কি বিধাতা তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন?

প্রসব-বেদনায় অস্থির হইয়া, নিদারুণ মনঃক্ষোভে, সীতা গঙ্গাপ্রবাহে ঝাঁপ দিলেন। সেখানে তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মিল। ভগবতী পৃথিবী ও ভাগীরথী, সীতাকে সেই অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া দুইটি সন্তান সমেত সীতাদেবীকে পাতালে লইয়া গেলেন। পরে সন্তান দুইটি স্তন-দুগ্ধ পরিত্যাগ করিলে, বাল্মীকির আশ্রমে রক্ষিত হইল।

এদিকে, সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রেমময়ী সীতার মূর্ত্তি কি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল? তাহাও কি সম্ভব? প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি সীতার কথা ভাবিতেন, সীতার বিরহ-যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে দগ্ধ করিত; কর্ত্তব্যব্রত রাম তথাপি আপনার রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই; সীতা শোকে, রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই। সামান্য জনের ন্যায় শোকে মুহ্যমান হওয়া রামের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

যথাসময়ে রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু যজ্ঞাশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। একদিন, দৈবাদেশে, রাম অবগত হইলেন, শম্বূক নামে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে। শূদ্রের তপস্যায়, রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। রাম, সেই শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদমানসে নানাদেশে ভ্রমণ করিলেন। শেষে পঞ্চবটী বনে আসিয়া, শম্বূকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; রাম, শম্বূককে বিনষ্ট করিলেন।

শম্বূক দিব্য পুরুষ। রামের হস্তে নিধন প্রাপ্তিতে শাপমুক্ত হইলেন। তখন উভয়ে পঞ্চবটীর নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে, অনেক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। *

এ সেই পঞ্চবটী! এইখানে, রাম, সীতাকে লইয়া, কত সুখেই অরণ্যবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন! এইখানে, তাঁহাদের

* রামায়ণপাঠে অবগত হই, রামচন্দ্র পঞ্চবটীবনে শম্বূককে বিনষ্ট করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে চলিয়া যান। কিন্তু কবি ভবভূতি রামচন্দ্রকে পঞ্চবটী বনে পাইয়া, অমনি-অমনি বিদায় করিতে পারিলেন না। তিনি পঞ্চবটীবনে রামচন্দ্রকে লইয়া, যাহা যাহা দেখাইলেন, তাহারই বিকাশ—এই "ছায়া" নামে তৃতীয় অঙ্কে। এই তৃতীয় অঙ্ক কবির অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

জীবনে, কি মহাঘটনাই ঘটিয়াছিল! আজ কতদিনের পর, রামচন্দ্র সেই পঞ্চবটী-বনে! নির্ব্বাপিত অতীত-স্মৃতি, আজ সহসা, জীবন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার হৃদয়-দ্বারে জাগিয়া উঠিল। তিনি পঞ্চবটীর চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন।

যেখানে যেমনটি ছিল, তেমন আর সকল স্থানেই নাই। পূর্ব্বে যেখানে সরোবর দেখিয়াছিলেন, এখন সেস্থান অরণ্যানীতে ভরিয়া গিয়াছে। যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল দেখিয়াছিলেন, সে সব ক্ষুদ্র বৃক্ষ এখন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, ফুলেফলে পূর্ণ হইয়াছে। কোন স্থান পাদপশ্রেণীর ঘনসন্নিবেশে সতত-শীতল ও শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কোন কোন প্রদেশ এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে যে, তথায় আর দৃষ্টি চলে না। কোথাও নির্ঝরিণীর শ্রুতিমধুর শব্দে চারিদিক্ পূর্ণ হইতেছে, স্থানে স্থানে পুণ্যতীর্থ মুনিগণের আশ্রমপদ, সুন্দর শৈলমালা, পুণ্যতোয়া নদী সকল, লক্ষিত হইতেছে। হায়! একবার যেমন দেখিয়াছি, তেমন কি আর দেখা যায়! কালের হস্তে সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেবল অতীতের সে ছবি হৃদয়মাঝে যে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে, কালের সাধ্য কি, হৃদয় হইতে সে ছবি মুছিয়া ফেলে?

অরণ্যমাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বস্মৃতি রামের মনে জাগিতে লাগিল। হায়! সীতাকে লইয়া, এই অরণ্যবাসেই তিনি গৃহী হইয়াছিলেন। এই অরণ্যবাসে থাকিয়াও তাঁহার প্রিয়তমা স্বর্গসুখের অধিকারিণী ছিলেন। হায়! আজ সে লক্ষ্মী নাই, সে লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে সকলই গিয়াছে! বিজয়াদশমী দিনে আনন্দময়ী মহামায়া-প্রতিমা গঙ্গাবক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া, গৃহে যখন শূন্য

চণ্ডীমণ্ডপে তাকাই, প্রাণ ফাটিয়া যায়! রামচন্দ্রও আজ স্বীয় হৃদয়পানে তাকাইয়া, তেমনই দেখিলেন। কতদিনের কত কথা, রামের মনে পড়িতে লাগিল। কোথায় প্রিয়াকে লইয়া বসিয়া থাকিতেন, কোন্ নদী-সৈকতে বৃক্ষমূলে বসিয়া, প্রিয়তমার সহিত কত গল্প করিতেন; কোন্ লতিকার কুসুমরাশি চয়ন করিয়া, স্নেহ-ময়ীর কেশদাম সাজাইয়া দিতেন; পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, পরস্পরের আলিঙ্গনসুখে কোন্ স্থানে বসিয়া, শ্রান্তিদূর করিতেন,—কত ভাবনাই আজ তাঁহার হৃদয় মাঝে জাগিতে লাগিল। সন্ধ্যার আকাশে একটি একটি করিয়া, যেমন নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া উঠে, তাঁহার হৃদয়-প্রদেশেও তেমনি করিয়া, কতদিনের কত ঘটনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সীতা-বিরহ তাঁহার পদে পদে মনে পড়িতে লাগিল; তিনি শোকে অধীর হইলেন। ব্রণের মুখ ফাটিয়া, শোণিতধারা যেমন বাহির হয়, রুদ্ধ শোকপ্রবাহও আজ অবসর বুঝিয়া, তেমনি অপ্রতিহতবেগে ছুটিল। হায়! মহাবীর রামচন্দ্র আজ শোক-প্রবাহে ভাসিলেন! কোথায় সীতা? সীতা মিলিবে কি?

শম্বুক বিদায় হইলেও পুনর্ব্বার আসিয়া রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামের আগমন শুনিয়া, তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিয়াছেন। রাম অগস্ত্যাশ্রমে চলিলেন।

আজ দ্বাদশ বৎসর হইল, রাম, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদিন হইলেও কি সীতা-বিসর্জ্জন-শোক তিনি ভুলিতে পারিয়াছেন?—"বৎসরে কি কালের মাপ!" সে আগুন কি কখন নিবিবে? রামের শোক কিরূপ?—

"অনির্ভিন্নোগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥"

কোন পাত্রের মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলে, তন্মধ্যস্থিত পাবক যেমন অবস্থায় থাকে, রামের হৃদয়ে, সীতা-শোকও তেমনিভাবে অবস্থান করিতেছে। প্রচণ্ড শোকানল দিবানিশিই তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। তিনি নাকি নিতান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি, তাই বাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। এতদিন রাজ্যে থাকিয়া, রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহার শোক কিছু প্রশমিত ছিল। আজ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া, পূর্ব্বস্মৃতি-পীড়িত হইয়া, তাঁহার শোকপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল! আজ কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? হায়! সীতা কি মিলিবে না? জীবনের জীবন-স্বরূপিণী সীতা ভিন্ন, এ উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কে প্রশমিত করিবে?

জনস্থান-প্রবাহিনী নদী সকল দেখিল, আজ বড় বিপদ। সীতা-বিরহে, না জানি, রামের আজ কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হয়! তখন মুরলা-নাম্নী নদী গোদাবরীকে বলিতে চলিল,—"দেবি, আজ রামের বড় বিপদ, তুমি তাঁহাকে সাবধানে রক্ষা করিও। সীতা-শোকে, যখন যখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িবেন, সেই সেই সময় তুমি সলিলপূর্ণ কমল-কেশর-সুরভি-সুশীতল তরঙ্গ-বায়ু দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দিও।"

এদিকে, সীতাদেবীও জনস্থানে আসিয়াছেন। ভগবতী-ভাগীরথী শুনিয়াছেন, শম্বূকবধের নিমিত্ত রাম জনস্থানে আসি-বেন। রাম জনস্থানে আসিলে, সীতাশোকে মুহ্যমান হইবেন;— তখন কে জানে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে!—তাই কোন গৃহকর্ম্ম-চ্ছলে, সীতাকে সঙ্গে লইয়া, তিনি সরিদ্বরা গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

সীতা জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। তিনি

জানেন, আজ লব-কুশের দ্বাদশ বার্ষিকী জন্মতিথি-উৎসব; দেবী ভাগীরথী তাঁহাকে রঘুকুল-দেবতা সূর্য্যদেবের পূজা করিতে এই জনস্থানে পাঠাইয়াছেন। ভাগীরথীর প্রভাবে, সীতা সকলের অদর্শনীয়া হইলেন, পরন্তু তিনি সকলকে দেখিতে পাইবেন।

তখন সেই ছায়ারূপিণী সীতা জনস্থানে চলিলেন। তমসা-নাম্নী নদীকে সীতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। ভাগীরথীর আদেশে, তমসা, সীতার পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিলেন। এই ছায়াময়ী সীতা হইতে, কবি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের নামকরণ করিলেন,—"ছায়া"। এই ছায়া, পাঠক কি চিনিয়াছ?—"এই ছায়া, সেই বহুকাল বিস্মৃতা, পাতাল-প্রবিষ্টা, শীর্ণদেহ-মাত্রবিশিষ্টা, রাম-মনোমোহিনী সীতার ছায়া।" শোকসন্তপ্ত রামকে রক্ষা করিবার জন্য, ভাগীরথী এই ছায়া-সীতাকে জনস্থানে পাঠাইলেন।

সীতাকে ছায়াময়ী করিয়া, কবি, আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। সীতা ও রামের এ স্থানে সাক্ষাৎ হওয়া বিধি নহে; মূল-রামায়ণেও তাহা নাই। অথচ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া, জনস্থান দর্শনে, রামের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—কবি তাহাও দেখাইতে যেমন ব্যগ্র; রাম-বিরহে, আজন্ম-দুঃখিনী সীতাদেবীর কারুণ্যে-ও-মধুর মূর্ত্তিখানি দেখাইতেও তেমনি ব্যগ্র। আবার কেবল তাহাই নহে;—রাম ও সীতা, দুইজনকে পাশাপাশি রাখিয়া, দুইজনের মূর্ত্তি দেখাইতে তিনি অধিকতর ব্যগ্র। রামকে আজ দ্বাদশ বৎসরের পর দেখিতে পাইলে, সীতার হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিবে, কবি তাহাও দেখাইতে চাহেন। কিন্তু তাহা হইবে কিরূপে? দেখা তো হইতে পারে না! এইজন্য

রামের দর্শন হইতে দূরে রাখিতে, তিনি সীতাকে ছায়াময়ী করিলেন। ছায়া-সীতা সকলকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আবার শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্রকে রক্ষা করারও প্রয়োজন। কে তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে? দশানন-বিজয়ী মহাবীর রামচন্দ্র আজ সীতা-শোকে এমনই হইবেন যে, সীতা ভিন্ন সে শোকানল কেহই নিবাইতে পারিবে না! কবি, সেইজন্য, এই ছায়াময়ীকে জনস্থানে আনিলেন। আশ্চর্য্য কৌশলে, তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিলেন।

রামচন্দ্রকে তিনি অন্য মূর্ত্তিতে আনিতে পারেন না। তাহা হইলে সবই গোলমাল হইয়া যাইত। আর আনিতে পারা সম্ভব হইলেও, কবির হয়ত মনে হইয়াছিল—"বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই!" ইহা ব্যতীত আর একটা কথা আছে। আমার বোধ হয়, সেইটিই প্রধান কথা। এই "ছায়া" রূপক বলিয়া মনে করিলে, কবির অন্য উদ্দেশ্য বুঝা যাইতে পারে। রূপকচ্ছলে কবির বুঝাইতে প্রয়াস যে, রামচন্দ্র সীতা বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপ অনুতপ্ত এবং কি নিদারুণ যন্ত্রণা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আর সতী-প্রতিমা সীতা-চরিত্রে ইহাই উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়াছেন যে, সীতা নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা হইয়াও নিজের দুঃখকষ্টে যত না আকুল, স্বামী যে তাঁহার বিরহে একান্ত কাতর, সেই ভাবনাই সতীর যন্ত্রণাদায়ক। সাধ্বীর হৃদয়ে যে নির্ব্বাসনজনিত একটা দারুণ ক্ষোভ ও অভিমান আদৌ ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু সে ক্ষোভ ও অভিমান তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক না হইয়া বরং স্বর্গীয় গুণে শোভিত হইয়াছে। সতী সাধ্বীর চরিত্রে সে অভিমান শ্লাঘনীয়। সেরূপ অভিমান ব্যতীত সে নির্ম্মল চরিত্র সম্পূর্ণ

হয় না। কবি সেদিকে লক্ষ্যচ্যুত হয়েন নাই বরং এমন একটু রং ফলাইয়া সে অভিমান অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহাতে উজ্জ্বলে মধুর হইয়াছে। কবি, রূপকচ্ছলে সেই হৃদয় ও হৃদয়ের নানা ভাবের অবতারণা করিয়া এই ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। উত্তর চরিতের শেষ অঙ্কে রাম ও সীতার যে মিলন ঘটাইয়াছেন, তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। রাম যখন কেবলমাত্র লোকরঞ্জনের জন্যই নিরপরাধা সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাকে বিবিমত যন্ত্রণা অনুভব না করাইয়া একেবারে মিলন ঘটানো যুক্তিযুক্ত নহে। তাহা সাধারণ লোকের প্রীতিপ্রদ হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু যে মিলনের চিত্র দেখিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায় এবং অন্তরের অন্তরে যে যুগলমূর্ত্তি চির-অঙ্কিত হইয়া যায়, কবি সেইরূপ সৃষ্টিচাতুর্য্য দেখাইবার জন্যই রূপকচ্ছলে ছায়াসীতার সৃষ্টি করিলেন। এ "ছায়াসীতা"—রামেরই আত্মহৃদয়েরপ্রতিবিম্ব ; এমন কি ছায়াসীতার উক্তিগুলিও রামেরই কাতর প্রাণের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। অথচ রাম তাহার কিছুই জানিতেছেন না।—এ হিসাবেও, কবির "ছায়াসীতাকে" গ্রহণ করা যায়। কিন্তু রূপক অপেক্ষা, বাস্তব আমাদের প্রাণে অধিক আনন্দ দিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের লীলা রূপক বলিলে, ভক্তের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না ; ভক্ত প্রত্যক্ষভাবে—সত্যজ্ঞানে, ঐশ্বরিক-লীলা দেখিতে অভিলাষী। সুতরাং আমরা ছায়া-সীতাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিব।

সীতা যে কারণে ছায়া-রূপিণী হইলেন, তাহা বলিয়া আসিয়াছি। এখন একটা কথা এই,—ছায়া বলিলে, আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, এখানে তাহা বুঝিলে চলিবে না। যাহা অসার, অনিত্য, অস্থায়ী, তোমরা তাহাকেই বলো ছায়া। কিন্তু ছায়ার প্রকৃত

অর্থ, ছায়ার আকৃতিতে লুকানো আছে! দার্শনিকের চক্ষু লইয়া, ছায়ার আকৃতি পানে তাকাইও, প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বুঝিতে পারিবে, আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, ছায়া হওয়া যায় না! অতএব ছায়াকে, অসার পদার্থ ভাবিও না।

সীতা আজ ছায়াময়ী হইয়াছেন। ছায়াময়ীর কথাগুলি শুনাইবার জন্য, কবি, সীতার পার্শ্বে, তমসাকে রাখিয়া দিয়াছেন। পাঠক সেই পূর্ণগর্ভা সীতাকে চিত্রদর্শন করিতে করিতে নিদ্রালসা দেখিয়াছেন; বাল্যে, বিবাহের পর যে রামবাহু সীতার উপাধান; যৌবনে, অরণ্যবাসে, বৃক্ষতলে—পর্ণকুটীরেও যে রামবাহু সীতার উপাধান, সেই চিত্রদর্শন সময়ে, সেই রামবাহুই উপাধান করিয়া, যে নিদ্রিতা সীতামূর্ত্তি দেখিয়াছ,—তাহার পর আজ দ্বাদশ বৎসর গিয়াছে,—সেই সীতাকে একবার স্মরণ করো! সীতার তখনকার সেই মূর্ত্তি, আর আজ? আজ আর সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে কিছুই নাই!—

পরিপাণ্ডু দুর্ব্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

সীতা, জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। রামবিরহে তাঁহার মনোহর কপোলদেশ নিতান্ত পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে; কবরী বিলোল হইয়া, মুখের উপর পতিত হইয়াছে; তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ করুণরসের আকৃতি, অথবা শরীরধারিণী বিরহব্যথা বলিয়া বোধ হইতেছে!

পতিবিরহে সতীর কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে:—

কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকীগর্ভপত্রম্॥

—শরৎকালের সুতীব্র রবিকিরণ যেমন কেতকী পুষ্পের হৃদয় বিশোষিত করে, সেইরূপ সুদারুণ দীর্ঘ শোক সীতার সুকোমল হৃদয়-কুসুমকে বিশোষিত করিয়াছে, এবং বৃন্তবিচ্ছিন্ন মনোহর কিসলয়ের ন্যায় ইহাঁর বিরহকৃশ পাণ্ডুবর্ণ শরীরকে নিতান্ত বিশীর্ণ করিয়াছে!

এ মূর্ত্তি কি কখন ভুলিবার?

সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যদেবের পূজার জন্য, তিনি কুসুমচয়নে ব্যগ্রহস্তা; কিন্তু ইহা যে সেই জনস্থান! এইখানে না সীতা রামসমভিব্যাহারে কতদিন অতিবাহিত করিয়াছেন? রাজলক্ষ্মী বনবাসিনী হইয়া, পতির সোহাগে থাকিয়া, কি সুখেই না সকল দুঃখ-যন্ত্রণা কাটাইয়াছিলেন? সে এই জনস্থান! তাঁহার জীবননাটকের এক অপূর্ব্ব অঙ্ক,—এই থানেই অভিনীত হইয়াছে! আজ আবার কতদিনের পর, সীতা সেই জনস্থানে আসিলেন!

বনদেবী বাসন্তীও আজ জনস্থানে রহিয়াছেন! তিনি সীতার সেই পূর্ব্ব অরণ্যবাসের সখী! বাসন্তীর সহিত কত আমোদ প্রমোদেই তিনি দিন কাটাইতেন। ইতিপূর্ব্বে বাসন্তী, সীতা-নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তিনিও জানেন না যে, সীতা জনস্থানে আসিয়াছেন, কিংবা তিনিও সে ছায়া-সীতা দেখিতে পাইবেন না।

পূর্ব্ব অরণ্যবাসকালে, সীতা এই জনস্থানে থাকিয়া, একটি করিশাবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সেই করিশিশু আজও সেইখানে আছে। সে এই মাত্র আপন বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছিল; এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। বাসন্তী তাহা দেখিতে পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সেই চীৎকার, সীতার কর্ণে গেল। বাসন্তীর কণ্ঠস্বর তিনি চিনিলেন। মহাভ্রমে পতিতা হইলেন। সেই জনস্থান, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, সেই তাঁহার যত্নপ্রতিপালিত করিশিশু, চারি-দিকে সেই পূর্ব্বস্মিতি,—সীতার ভ্রম হইল! তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া গেলেন। আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্র! আমার পুত্রকরিশাবকটিকে রক্ষা করো!"

কি ভ্রান্তি!

স্নেহময়ী সীতা, হৃদয়গুণে বনের পশুপক্ষী গুলিকেও আপন করিয়া লইয়াছিলেন! আহা! সীতার হৃদয় কত ভালবাসাই বাসিতে পারে,—কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! করিশিশুর জন্য তিনি ব্যথিতা হইলেন, ব্যথিতপ্রাণে আর্য্যপুত্রকেই ডাকিয়া ফেলিলেন! আর্য্যপুত্র ভিন্ন, সীতা আর কি জানেন? আর্য্যপুত্রই তাঁহার জপ, তপ,—তাঁহার ধ্যান ধারণা,—তাঁহার সব। আবার সেই জনস্থান, সেই প্রিয়সখী বাসন্তীর কণ্ঠস্বর,—ভ্রান্তি হইবে না তো কি?

কিন্তু হায়! আর্য্যপুত্র কোথায়? আজ দ্বাদশ বৎসর হইল, দেখা নাই! সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন তমসা সীতার সুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে রাম অগস্ত্যাশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পঞ্চ-

বটী-ভ্রমণ করিবার ইচ্ছায় তিনি সারথিকে একস্থানে রথ রাখিতে বলিলেন।

মূর্চ্ছিতা সীতার কর্ণে রামের কণ্ঠস্বর পহুঁছিল। সে চিরপরিচিত মধুরকণ্ঠ, সীতার কর্ণকুহর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিল,—সীতা জাগিয়া উঠিলেন।

"অজ্জ হে! জলভরিদমেহত্থণিদগম্ভীরমংসলা কুদো ণু এস' ভারদী? ণিগ্ধসভরন্তকণ্ণবিবরং মংপি মন্দভাইণীং ঝত্তি উস্সাবেদি।"

—"আহা! জলপূর্ণ মেঘের শব্দের ন্যায়, এই গম্ভীর কণ্ঠস্বর কোথা হইতে আসিল? এ স্বর যে কর্ণবিবরে প্রবেশ মাত্র এ হতভাগিনীকে আনন্দিত করিয়া তুলিল!"

আজ কতদিনের পর রামের কণ্ঠস্বর, সীতা শুনিলেন। সে কণ্ঠে কি সুধা ছিল, তৃষিতহৃদয় সীতার প্রাণ যেন জুড়াইল! তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

এ ভাব দেখিয়া, তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি সাশ্রুনয়নে, অথচ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"অয়ি বৎসে!

"কিমব্যক্তেঽসি নিনদে কুতস্ত্যোঽপি ত্বমীদৃশী।
স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা।"

"মেঘের ডাকে ময়ূরী যেমন চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, কেন বাছা, তুইও তেমনি একটা অপরিস্ফুট শব্দ শ্রবণে তেমনি ব্যাকুলা হইলি?"

সীতা বলিলেন,—"কি বলিলে ভগবতি! এ শব্দ অপরিস্ফুট? আমি যে কণ্ঠস্বরেই বুঝিয়াছি, এ আমার আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর!"

সীতার কি ভুল হইতে পারে? সীতা কি রামের কণ্ঠস্বর

কখন ভুলিতে পারেন? শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও রামচিন্তাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। হৃদয়ের মধ্যে যাহাকে দিবানিশি ধ্যান করা যায়, তাহার কোন-কিছু কি কেহ ভুলিতে পারে? তোমায় আমায় নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া অনেক জিনিষ ভুলিয়া যাই; কিন্তু রমণীহৃদয়ে যে কখনও বিন্দু পরিমিত স্থান পাইয়াছে, সে আর সে হৃদয় হইতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। ভালবাসার পদার্থকে রমণীর ন্যায়, কয় জন ভালবাসিতে পারে? তেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া, জগৎ বিস্মৃত হইয়া, ভালবাসার পদার্থকে অন্তরে ভাবা,—পুরুষের সাধ্য নহে! প্রিয়জনের কথাটি, হাসিটি, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত, রমণী এমনই করিয়া চিনিয়া রাখে যে, তোমার আমার সে সাধ্য নাই যে, চিনিয়া বুঝিতে পারি। কথাটা এই যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অন্তর্লীনতা বড় বেশী। স্ত্রীলোক স্নেহের বস্তুকে কেবল চোখের উপর রাখিতে চাহে, দূরে রাখিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাই যখন প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, প্রিয়জন যখন প্রবাসে, রমণী তখন অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া, কেবল কল্পনার বলে প্রিয়জনকে প্রত্যক্ষ করেন। সে কল্পনা বড় সাধারণ কল্পনা নহে। পুরুষকে সে কল্পনা লইয়া থাকিতে হইলে, পুরুষের সংসার করিতে হইত না। অন্তর্লীনতা স্ত্রীজাতির বেশী বলিয়াই, তাহারা প্রিয়জনের চিন্তায় একেবারে তন্ময়ী হইয়া থাকিতে পারে, আর তাই তাহার কিছুই ভুলে না। তেমন করিয়া ভাবিতে, মনে রাখিতে, অল্প ইঙ্গিতে চিনিতে কি বুঝিতে,—পুরুষ কস্মিন্‌কালেও পারে না। সীতা, কণ্ঠস্বরেই রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বুঝিবেন, বিচিত্র কি?

তখন তমসা দেখিলেন, আর লুকানো বৃথা; তিনি বলি-

লেন,—"শুনিয়াছি, শূদ্রতপস্বী শম্বূক বধের নিমিত্ত রামচন্দ্র এই জনস্থানে আসিয়াছেন।"

রামচন্দ্র জনস্থানে আসিয়াছেন, সীতাও সেই জনস্থানে! আজি দ্বাদশ বৎসরের পর! আবার কেবল কালের পরিমাণ নহে, এই দ্বাদশ বৎসর সীতাকে বনবাস দিয়াছেন। বনবাস দিয়াছেন, তাহাও বিনাপরাধে! রামচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়া সীতার আনন্দও হইল না, দুঃখও হইল না, কিংবা অভিমানও হইল না। তিনি বলিলেন কি?

"দিট্‌ঠিআ অপরিহীণরাঅধর্ম্মো কৃখু সো রাআ।"

"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজা রাজধর্ম্মে অবিচলিত আছেন।"

এমন কি আর শুনিব? দ্বাদশ বৎসরের পর, স্বামী নিকটে, আবার সে দ্বাদশ বৎসরই বা কেমন! এতদিনের পর, রামচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়াও ঐ কথা!—এমন আর শুনিব কি? তোমায় আমায় হয় তো মনে করিয়াছিলাম, রামের আগমন সংবাদে সীতা আনন্দে গলিয়া যাইবেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ছুটিয়া রামের কাছে যাইবেন; "কৈ প্রাণাধিক" বলিয়া রামের পদতলে পড়িবেন; নয় তো অভিমানে গর-গর করিতে করিতে বলিবেন,— "হা আর্য্যপুত্র! এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, তুমি আমাকে বনবাস দিলে?" কিন্তু সীতা এ সকল কিছুই করিলেন না। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া, বলিলেন কি না—'সৌভাগ্যক্রমে সে রাজা রাজধর্ম্মে অবিচলিত আছেন!' তাই বলিতেছিলাম, এমন আর শুনিব কি? আবার বলি, এমন না হইলে কি ভারতবাসীর বুক চিরিয়া এ সতী-প্রতিমা এমন করিয়া হৃদয়ে স্থান পাইতেন?

ছায়াময়ী সীতা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। কেমন দেখিলেন ?—

"হা কধং পহাদচন্দমণ্ডলাবণ্ডুরপরিক্খামদুব্বলেণ আআরেণ, অত্তং সোম্মগম্ভীরাণুভাবমেত্তপচ্চভিঞাণিদো অজ্জউত্তো জ্জেব।"

—"আহা! প্রিয়তমের শরীর প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় বড় কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছে; কেবল সেই সৌম্য ও গম্ভীর প্রভাব ইহাঁতে অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াই আর্য্যপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিতেছি।" রামের এই অবস্থা দেখিয়া, সীতার প্রাণ আকুল হইল, তিনি তমসার কণ্ঠ জড়াইয়া বলিলেন,—"আমায় ধরো!" এই বলিয়াই তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে আকুল হইলেন। সীতা-বিরহ তাঁহার পদে পদে মনে পড়িতে লাগিল। আকুল-ক্রন্দনে তিনি জনস্থান পূর্ণ করিলেন। "হা সীতা! হা রামের জীবনসর্ব্বস্ব!"—বলিতে বলিতে চারিদিকে ছুটিলেন। ভাগীরথী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। রাম বলিতে লাগিলেন,—"এই জনস্থানে আসিয়া, কি প্রবল মোহেই অভিভূত হইলাম! হৃদয়ের শোকানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল! হা সীতা, হা বিদেহরাজপুত্রি। তুমি কোথায় ?" বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন সীতা, কাতরা হইয়া তমসার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবতি! রক্ষা করুন, আমার আর্য্যপুত্রের জীবন-দান করুন।" তমসা বলিলেন,—"কল্যাণি! তুমি স্পর্শ করো; তোমারই স্পর্শে, তোমার স্বামী বাঁচিবেন।"

তমসা যথার্থই বলিয়াছেন, সীতার স্পর্শ ব্যতীত সীতা-বিরহে-

মূর্চ্ছিত রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন আর কে করিবে? হিমানীর প্রচণ্ড পীড়নে যে বৃক্ষবল্লরী মৃতপ্রায় হইয়াছে, বসন্তের কোমল স্পর্শ ব্যতীত কে তাহাতে সজীবতা আনিয়া দিবে?

সীতা বলিলেন,—"জং হোদু তং হোদু জহা ভঅবদী ভণাদি।"—"যা হৌক, তা হৌক, এখন ভগবতী তমসা যাহা বলিতেছেন, তাহা করি।" * এই বলিয়া, ছায়াময়ী, রামকে স্পর্শ করিলেন। সে স্পর্শে রামের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

---

* তমসার কথায় সীতা বলিলেন, "যা হোক তা হোক, ভগবতী তমসা বলিতেছেন, অতএব আমি স্পর্শ করি।"—এ কথাটার অর্থ কি? পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, সীতা ভাবিতেছেন 'আমার পাণি-স্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না জানি না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব'।" ইহাতে অবশ্যই ইহাই বুঝাইতেছে, পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, সীতার সেই সন্দেহ হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, এ অর্থে ওকথা ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহার মতে, "সীতা ভাবিতেছেন, 'রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনা অপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময় একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বারো বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মতো তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি তো মৃতপ্রায়। যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।"

রাম চৈতন্যলাভ করিলে, তমসা ও সীতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমরা ইহাই বুঝি যে, পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, সে সন্দেহ সীতার হয় নাই। সে হিসাবে বঙ্কিম বাবুর অর্থই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু সীতার কথার যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতে সীতার দুর্জ্জয় অভিমান প্রকাশ পাইতেছে। "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধি-

রাম বুঝিতে পারিলেন না, কি হইয়া গেল! কেহ কি তাঁহার শরীরে হরিচন্দন লেপিয়া দিল? না কেহ চন্দ্রকিরণ-রস তাঁহার শরীরে ঢালিয়া দিল? আহা হা! এমন স্পর্শ কি আর হয়! এ যে সেই চিরপরিচিত সীতা-কর-স্পর্শ! রামের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু এ স্পর্শসুখে বুঝি আবার নূতন মোহ উপস্থিত হয়।

তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, ইহা সীতারই করস্পর্শ! কিন্তু সীতা তো কোথাও নাই! তখন রাম আবার আকুল ক্রন্দনে জনস্থান পূর্ণ করিলেন।

ছায়াময়ী সীতাকে রাম তো দেখিতে পাইতেছেন না। কি যন্ত্রণা দেখ দেখি! যাহার জন্য প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় একান্ত উৎকণ্ঠিত, সে নিকটেই রহিয়াছে, তাহার করস্পর্শজনিত সুখলাভ হইতেছে,—অথচ সে থাকিয়াও নাই, নয়ন তাহাকে পাইতেছে না! এমনই-তর কষ্টের মাঝে ফেলিয়া দিয়া, আর্য্যকবি কি আনন্দই পাইতেছেন! যে বলিয়াছিল, এইরূপে সীতাকে কাছে

কার? তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আজি বারো বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মতো তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে!"—এ সকল দুর্জ্জয় অভিমানের কথা। এ অভিমান বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরেই খাটে, সীতায় খাটে না। সীতার নিম্নলিখিত রূপ ভাবাই আমাদের বিবেচনায় সমীচীন,—"আমারই জন্ত আর্য্যপুত্র মূর্চ্ছিত। আমি স্পর্শ করিলে ইনি বাঁচিয়া উঠিবেন। স্পর্শ করিলে, আর্য্যপুত্র রাগ করিবেন না তো? রাগ করেন করুন, আমি ইহাঁকে স্পর্শ করিব।" নিজেই সীতা যেন কত অপরাধিনী, তাই ভয়ে ভয়ে যেন রামকে স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন! পরিত্যক্তা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্র কুপিত হন হউন, সতী বুক পাতিয়া তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন; তাই বলিলেন,—"যা হউক, তা হউক, আমি স্পর্শ করিব।"

কাছে রাখিলে, সীতা-বিরহ-ক্লিষ্ট রামের অনেক যন্ত্রণার লাঘব হইবে, সে কি তবে ভুল বুঝিয়াছিল?

পাঠক, সীতার সেই করিশাবকটি ভুলিবেন না। সে আপন বধূ সঙ্গে জলপানে যাইলে, একটা মত্ত যূথপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; তাহার রক্ষার্থ, বনদেবী বাসন্তী চীৎকার করিয়াছিলেন,—সে কথা বলিয়াছি। এখন আবার বাসন্তীর সেই চীৎকার। করিশিশুটিকে রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র উঠিলেন। বাসন্তীর সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল, পরস্পর পরস্পরকে চিনিলেন।

রামচন্দ্র দেখিলেন, সীতার করিশিশুটি ইতিমধ্যে শত্রুজয় করিয়াছে; এক্ষণে স্বীয় প্রিয়তমা করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া, রাম বলিলেন,—"বৎস, সর্ব্বত্র বিজয়ী হও।"

বাসন্তীও ছায়াময়ী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। ভাগীরথীর প্রভাবে আজ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। সীতা, তমসাকে বলিলেন,—"দেবি! চলো, আমরাও আর্য্যপুত্রের অনুসরণ করি।"

রাম দেখিতেছেন, করিশিশুটি তাহার প্রিয়তমার সহিত কত ক্রীড়া করিতেছে। কখন সে মৃণালখণ্ড লইয়া প্রণয়িনীকে খাওয়াইতেছে, কখন বা শুণ্ডাগ্রে কমল-সুরভি-সলিল টানিয়া লইয়া তাহাকে পান করাইতেছে। কখন বা প্রণয়িনীকে স্নান করাইয়া দিতেছে এবং স্নানের পর রবিকিরণ হইতে প্রিয়তমাকে ছায়া দিবার জন্য মৃণালপত্রের ছত্র, তাহার মাথার উপর ধরিতেছে! রাম বাসন্তীকে বলিতেছেন,—"সখি! দেখ, এ কেমন প্রিয়ার মনোরঞ্জন করিতে শিখিয়াছে!"

সীতা, করিশাবকটিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এঁ্যা! এত বড়টি হইয়াছে?" এই অরণ্যবাসে থাকিয়া, সীতা পুত্রনির্ব্বিশেষে এই করিশিশুটিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন,—সে আজ কতদিনের কথা! সেই করিশিশুটি এত বড় হইয়াছে? সীতা যেন অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এই করিশাবক যখন অতি শিশু ছিল, নবীন-মৃণাল-পত্রের ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুকোমল নবোদ্গত দন্ত দ্বারা সে কেমন বনবাসিনী সীতাদেবীর কর্ণাভরণ হইতে লবলী-পল্লব টানিয়া লইত!—সেই আজ এত বড়টি হইয়াছে, সেই আজ প্রতিদ্বন্দ্বী গজপতিকে হারাইয়া দিয়াছে! সীতা আনন্দান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"আহা, বাছা আমার দীর্ঘজীবী হউক, এই মধুরদর্শনা করিণীর সঙ্গে চিরদিনই একত্রে থাকুক,—কখন যেন ইহাদের বিচ্ছেদ না হয়!"

বিচ্ছেদের ভয়টা সীতার কত! এমন যন্ত্রণাই বা আর কে পাইয়াছে?

করিশাবকটি দেখিয়া, দুঃখিনী সীতার লবকুশ পুত্র দুটিকে মনে পড়িল। আহা! তাহারাও এতদিনে কত বড় হইয়াছে! সীতা কি কেবল স্বামিসহবাস-সুখে বঞ্চিতা?—পুত্রমুখ-দর্শনেও দুঃখিনী বঞ্চিতা! এমন দুঃখিনী কি আর কোথাও দেখিয়াছ?

সন্তান দুইটির কথা মনে করিয়া, সীতা বলিলেন,—"হায় রে দুঃখিনীর পুত্রগণ! কেন তোরা এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলি? আহা, বাছাদের সে চাঁদমুখে কি সুধা-হাসিই লাগিয়া রহিয়াছে! আর্য্যপুত্র একবার বাছাদের সে চাঁদমুখ চুম্বন করিলেন না!"

সতীর প্রাণে এ যে কি ক্ষোভ, তা সতীই জানেন।

সীতা বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি তমসে, পুত্র দুটির কথা মনে পড়াতে এই দেখ, আমার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতেছে, আর আমি তাহাদের পিতার সম্মুখে আছি বলিয়া যেন বোধ হইতেছে,—আমি আবার সংসারী হইয়াছি!

এই অল্প কথায়, সীতা-চরিত্র কি মধুর ফুটিয়াছে! কি সুন্দর স্বাভাবিক উক্তি।

বাসন্তী, রামকে একে একে কত স্থান, কত স্থানের কত দৃশ্যই দেখাইতেছেন! সীতা একটি ময়ূর পুষিয়াছিলেন। সেটি আজিও জীবিত আছে। বাসন্তী, রামকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। ময়ূরটি নিজ প্রিয়ার সহিত এক কদম্বশাখাতে বসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কখন বা মধুর শব্দ করিতেছে। সীতা নিজহস্তে সেই কদম্ব বৃক্ষটি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখন সবে মাত্র তাহাতে দু'একটি পুষ্পোদ্‌গম হইয়াছিল। এখন তাহা ফুলপত্রে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারই শাখায় বসিয়া, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে। সীতা ময়ূরটির পানে চাহিয়া, সজলনয়নে বলিলেন,—"হাঁ, এই আমার সে পুত্রটি বটে।" রামের মনে পড়িল,—সীতা করতালি দিতেন, ময়ূরটি তালে তালে মণ্ডলাকারে কেমন নৃত্য করিত, আর তাহার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সীতার চক্ষুও কেমন পল্লব মধ্যে ঘুরিত!—হায় রে, আজিও তো সেই কদম্ব-তরু, সেই কদম্ব-শাখাতে সেই ময়ূর;—তবে সে সুখ, সে আনন্দ আজ কোথায়?

বাসন্তী, রামকে ডাকিলেন। একস্থানে চারিদিকে কদলীবন, তাহার অভ্যন্তরে একখণ্ড শিলা পতিত রহিয়াছে, রাম সেইখানে সীতাকে লইয়া শয়ন করিতেন। সেই শিলাতলে বসিয়া, সীতা হরিণ-শিশুগুলিকে তৃণ খাওয়াইতেন,—আজও তাহারা তাহা ভুলে

নাই,—আজও সেই পূর্ব্বপ্রেমের টানে, তাহারা সেখানে আসে।—বনের পশুপক্ষী, তাহারা তো কিছুই ভুলে না,—হায় রে! আমরাই কেবল ভুলি!

বাসন্তী রামকে সেইখানে বসিতে বলিলেন। রাম কি সেস্থানে বসিতে পারেন? চক্ষুজলে তাঁহার বুক ভাসিতে লাগিল। তিনি অন্যত্র উপবেশন করিলেন।

রাম, সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, প্রিয়সখী বাসন্তীর প্রাণে নাকি বড়ই লাগিয়াছে, তাই বিবিধ প্রকারে তিনি রামের মনে কষ্ট দিতে লাগিলেন। কিন্তু পতি-প্রাণা সতীর প্রাণে তাহা সহিবে কেন! সীতা বাসন্তীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পাঠক, মনে রাখিবেন, তমসা ভিন্ন আর কেহ ছায়াময়ী সীতাকে দেখিতে কিংবা তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে না। বাসন্তী জানেনও না যে, তাঁহার প্রিয়সখী সীতা তাঁহাদেরই কাছে কাছে রহিয়াছেন।

রামের অবস্থা দেখিয়া, বাসন্তীর একটু দয়াও হইল। সীতা-নির্ব্বাসন যদিও তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু সীতাশোকে দীর্ণপ্রাণ রামচন্দ্রের সে মূর্ত্তি দেখিয়া, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? বাসন্তী, সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি! কোথায় আছ, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার বিরহে, তোমার রামের কি দশাই ঘটিয়াছে! তুমি যাঁহার কোমল কমল-নিন্দিত অঙ্গ-সন্দর্শনে চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতে, যাঁহাকে বার বার দেখিয়াও তোমার দেখার-সাধ মিটিত না, সখি! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার সে রাম আর নাই! তোমার শোকে তিনি এমনই মলিন ও কৃশ হইয়াছেন যে, আজ অতি

কষ্টেই তাঁহাকে চিনিতে হয়! কিন্তু তবু সখি! তাঁহার স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তিটি আমাদের সেইরূপই মধুর-দর্শন রহিয়াছে!”

ছায়াময়ী বলিতে লাগিলেন,—“তাহা দেখিতেছি সখি!—হা দৈব! আর্য্যপুত্র আমায় ছাড়িয়া থাকিবেন, আমিও তাঁহার দূরে থাকিব,—স্বপ্নেও এ কথা কে ভাবিয়াছিল? এখন আমি আঁখি-জলের অবসরে, জন্মের-মতো আমার জীবনসর্ব্বস্বকে দেখিয়া লই!”

রামকে দেখিতে দেখিতে সীতার চক্ষু জলপূর্ণ হইতেছে। আঁখিজল গড়াইয়া পড়িতেছে, আবার কোথা হইতে জলে আঁখি ভরিয়া যাইতেছে। মাঝখানের সেই অবসরটুকুতে সীতা জন্মের-মতো তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বকে দেখিয়া লইতেছেন। দুঃখিনী সীতার আঁখিযুগল চিরদিনই তো এমনই জলভরা থাকিবে; আজ একবার কে হৃদয়দ্বারে—অশ্রুপথে দাঁড়াইয়া বলিবে,—“অশ্রু! আজিকার জন্য থাকো, আজ সীতা তাঁহার দুর্লভ জনকে একবার জন্মের মতো দেখিয়া লইবেন!”

রাম, বাসন্তীকে পার্শ্বে বসাইলেন। বাসন্তী, রামকে নানা-প্রকারে, সীতাবনবাস-জনিত-দুঃখে মর্ম্মপীড়িত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণের কুশল তো?”

রামের কাণে সে কথা পঁহুছিল না। রাম তখন ভাবিতেছেন,—

“করকমলবিতীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈ-
“স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রব ইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ।”

—“আমার প্রিয়তমা জানকীর করকমলবিকীর্ণ জলে পরিপুষ্ট

এই বৃক্ষরাজি, তাঁহার করকমল-বিকীর্ণ নীবার শস্যে পরিপুষ্ট এই বিহগ সকল, তাঁহার করকমল-বিকীর্ণ তৃণে পরিপুষ্ট এই মৃগ-সকল,—এ সকল দর্শন করিয়া কি এক বিকার উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে আমার এই পাষাণ হৃদয়কেও শতধা বিদীর্ণ করিতেছে!"

বাসন্তী—অকরুণা-বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণের কুশল তো?"

এবার রামের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি? আমার সেই প্রিয়সখী বাসন্তী,—তিনি আজ আমাকে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন? ইহা তো নিতান্ত অপ্রণয়ের কথা! আর কুমার লক্ষ্মণের কুশল জিজ্ঞাসা করি-লেন,—তাহাও বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে,—তবে দেখিতেছি, বাসন্তীও সীতা-বৃত্তান্ত সকলই অবগত হইয়াছেন।" রাম আর অধিক কিছু না বলিয়া জানাইলেন,—"লক্ষ্মণের কুশল"।

বাসন্তী। মহারাজ, আপনি কেন এই পাষাণ-হৃদয়ের কার্য্য করিলেন?—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"

"তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়ন-যুগলের কৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গের অমৃত",—এইরূপ কত মধুর বচনে সেই মুগ্ধস্বভাবা বালাকে বিমুগ্ধ করিতেন; মহারাজ! আপনি কি না তাহাকেই—" বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না, সীতা-পরিত্যাগের কথা তাঁহার মুখে সরিল না, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছা-ভঙ্গে, বাসন্তী বলিলেন,—"আপনি কিজন্য এমন নিষ্ঠুরের কার্য্য

করিলেন?" ছায়াময়ী বলিতেছেন,—"সখি! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।"

রাম। লোকে যে মার্জ্জনা করিল না!

বাসন্তী। কি জন্য?

রাম। লোকেই জানে,—কি জন্য।

তখন তমসা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"হাঁ, লোকের প্রতি আক্রোশ করিয়া, নিরপরাধা সহধর্ম্মিণী পরিত্যাগ উচিতই হইয়াছে!"

বাসন্তী বলিতে লাগিলেন,—"নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, যশই তোমার প্রিয়! যশোলাভের বশবর্ত্তী হইয়াই, তুমি তাদৃশ পাষাণের কার্য্য করিয়াছ! কিন্তু সে যশই বা তোমার কোথায় রহিল? জানো কি, সে পরিত্যক্তা, অসহায়া, পূর্ণগর্ভা সতীর কি দশা হইয়াছে! জানো কি, সে বাঁচিয়া আছে কিনা? হায়! এমনই করিয়াই কি তোমার যশের সঞ্চার হইল?"

রাম কি যশের প্রার্থী হইয়াই, সীতা নির্ব্বাসনরূপ এই দারুণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন? রামের লোকানুরঞ্জন-বৃত্তি কি তবে যশোলিপ্সার নামান্তর মাত্র? প্রাণ থাকিতে আমরা সে কথা কখন বলিতে পারিব না। রাম যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, সীতা-বিসর্জ্জন ভিন্ন তিনি আর কি করিতে পারিতেন? সীতা, শত্রুপুরীতে বাস করিয়াছিলেন, সীতা-চরিত্রে প্রজামণ্ডলীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সীতার যে অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, প্রজারা তাহা দেখে নাই। রামচন্দ্র জানিতেন, তাঁহার সীতা অকলঙ্কচরিত্রা, শুদ্ধস্বভাবা। তিনি জানিয়া-শুনিয়াও পত্নী পরিত্যাগ করিলেন। না করিলে, তিনি কি করিতে পারিতেন? দুইটি উপায় ছিল।

প্রথম, সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন ; দ্বিতীয়, সীতাকে লইয়া রাজ্য-ত্যাগ। এ দু'য়ের একটিও যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাই দেখাইতেছি।

প্রথম, সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন। রাম জানিতেন, সীতা নিষ্পাপহৃদয়া ; তাঁহাকে লইয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি ধর্ম্মে পতিত হইতেন না। তিনি রাজা, তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, বাধা দিতেও কেহ সাহস করিত না। লোক-নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া, অনায়াসে তিনি সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি রাজা, রাজার কর্ত্তব্য সাধারণ-কর্ত্তব্য নহে।—"আপনার চরিত্র দেখাইয়া, প্রজাকে সদ্দৃষ্টান্ত দান করা রাজার কর্ত্তব্য।" এ অবস্থায়, সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন করিলে কি হয়, ভাবো দেখি! প্রজামণ্ডলী ভাবিবে, রাম তো কলঙ্কিনী চরিত্রহীনা ভার্য্যা লইয়া সংসার করিতেছেন, তবে আমরা চরিত্র বা নীতি মানিব কেন? দুর্নীতি ও পাপের দণ্ডকর্ত্তা যিনি, যদি তিনিই নীতি না মানিলেন,—তবে আমরা কেন মানিব? প্রজা দুর্নীতিপরায়ণ হইবে,—পরদার হরণ, পরদার গমন প্রভৃতি পাপে রাজ্য পূর্ণ হইবে। সেই পাপের যে অনিবার্য্য ফল, তাহাও ফলিবে। লোকে লোকে শত্রুতা বাধিবে, বিদ্বেষ-বহ্নি গৃহে গৃহে জ্বলিবে, দেশে রাজ্য-বিপ্লব ঘটিবে।—সীতাকে লইয়া রাজ্যপালন কি কর্ত্তব্য?

দ্বিতীয়, সীতাকে লইয়া রাজ্যত্যাগ। যখন সীতাকে লইয়া রাজ্যপালনের কোন সুবিধা নাই, তখন রামচন্দ্র কেন সীতাকে লইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া যান না? রাম তাহাও পারিতেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন,—তিন ভ্রাতা আছেন, কাহারও না কাহার উপর রাজ্যভার দিয়া, তিনি যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা

হইলেও বা কি হইল? রাম যে সীতাকে লইয়া বনবাসে যাইবেন, তাহাতেই বা পরিত্রাণ কৈ? তাহাতেই কি রাম সুখী হইবেন,—না, সীতার আনন্দ হইবে? স্ত্রীর চরিত্রে অপবাদ,—সত্যই হউক আর মিথ্যা হউক, এ কথা ধ্রুব সত্য যে, "আর্য্যনারীর চরিত্রে কেহ মিথ্যা রটনা করিলেও আর্য্যনারী কলঙ্কিতা হন।" রাম কি এ নীতি পরিত্যাগ করিয়া, সেই স্ত্রীকে লইয়া বনবাসী হইবেন? এই কি রাম-চরিত্র? প্রজাপালক, সত্যধর্ম্মাবতার, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের কি এই চরিত্র? আর আর্য্যরমণী, সহিষ্ণু-প্রতিমা, সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া, সেই সীতাদেবীও কি এইরূপে ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা হইয়া, কেবল স্বামীর সাহচর্য্য জন্য, স্বামীর প্রজাপালন-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বামীকে লইয়া বনবাসিনী হইবেন? এমন কথা কি বলিতে আছে? আর্য্যরমণী স্বামি-পরিত্যক্তা হইয়াও আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারেন, কিন্তু কেবল তাঁহারই জন্য যে তাঁহার স্বামী ধর্ম্ম, নীতি, কর্ত্তব্য—সকলই বিসর্জ্জন দিবেন,—ইহা তাঁহার একান্ত অসহ্য। ধর্ম্ম ও সত্যপালনের জন্য পতির মৃত্যু হয়,—আপনি অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রণার হস্তে পতিতা হন, তাহাও তাঁহার বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ধর্ম্মপালনে একান্ত ভীরু, কর্ত্তব্য-সাধনে নিতান্ত অক্ষম,—এমন স্বামীর জীবন, এমন স্বামীর সাহচর্য্য, আর্য্য রমণীর বাঞ্ছনীয় নহে। এ কথা যে না বুঝে, আর্য্যরমণীর চরিত্র,—সীতার চরিত্র সে বুঝে না।—সীতাকে লইয়া রাজ্য-ত্যাগেই বা পরিত্রাণ কৈ?

এখন, সীতাকে ত্যাগ ভিন্ন, রাম আর কি করিতে পারেন? দর্শনশাস্ত্র-পড়া, নীতিবেত্তা তার্কিক বলিবেন,—"আচ্ছা বুঝিলাম, সীতাত্যাগ ব্যতীত রামের অন্য উপায় নাই। কিন্তু রামের কাজটা,

যে ধর্ম্মবিগর্হিত হইল, তাহা তো স্বীকার করিবে ?" আমরা তাহাও স্বীকার করিব না। রামচন্দ্র রাজা। যদি আত্ম-চরিত্র দেখাইয়া, প্রজামণ্ডলীকে কঠোর শিক্ষাপ্রদান, রাজার ধর্ম্ম হয়,—তবে বলিব—রামচন্দ্র ধার্ম্মিক। যদি আত্ম-বিসর্জ্জনে ধর্ম্ম থাকে, তবে বলিব,—রামচন্দ্র ধার্ম্মিক। এমন চরিত্র কি আর হয় ? ধন্য ভারতবর্ষ, যে দেশে এমন মহানুভব পুরুষ-সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! আর ধন্য আমরা যে, সেই মহাকবি আমাদেরই, যিনি এই রামচরিত্র লইয়া, এই বিশ্ব-পূজিত মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। *

বাসন্তী যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে তাহাই বলিলেন। রাম, সীতাকে বনবাস দিয়া, এইরূপে আত্মপ্রবোধ দিয়াছিলেন যে, যাহা হউক, লোকরঞ্জন হইয়াছে। লোকরঞ্জনই তাঁহার কুলধর্ম্ম, সীতা-বিরহে তাঁহার মর্ম্মচ্ছেদ হয় হউক, তাঁহার কুলধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে! কিন্তু বাসন্তী বলিলেন, সীতা-বিসর্জ্জনে তো কুলধর্ম্ম রক্ষিত হয় নাই, প্রজারঞ্জনের মূলেই তো রামের যশোলিপ্সা প্রবলা ; আর তাই কি সে যশের আকাঙ্ক্ষা ফলবতী-ই হইয়াছে ? যদি সীতার সেই অসহায় অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ?—সে মৃত্যুর হেতু কে ?

---

* যদি কথাটা পাড়িলাম, আরও একটা কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলেন এই যে, রামায়ণের এই উত্তর-ভাগটা প্রক্ষিপ্ত, রামের সীতা-বিসর্জ্জন-ব্যাপার মিথ্যা। আপদ-বালাই সব ঘুচিয়া গেল! এ বিষয়ে আমি আর কিছুই বলিব না, আমাদের বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান ভাবুক সমালোচক,—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "নবজীবনের" দ্বিতীয় খণ্ডে, "উদ্ভট কথা"র তৃতীয় শাখায় এ বিষয়ে যথেষ্ট বলিয়াছেন, পাঠককে সেই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

রাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক, সেই জ্যোৎস্না-নিন্দিত, স্নিগ্ধ মৃণাল-সুকোমল প্রিয়তমার দেহ বিনষ্ট হইয়াছে! এবার রাম মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন, জনস্থান সে ক্রন্দনে পূর্ণ হইল। বাঁধ তো ভাঙ্গিয়াই ছিল, এখন হু-হু-হু করিয়া অগাধ জলরাশি অপ্রতিহতবেগে কূল ভাসাইয়া চলিল!

ছায়াময়ী বলিতেছেন—"না, আর্য্যপুত্র! সেই দুঃখিনী আজও বাঁচিয়া আছে,—মরে নাই!"

রাম, "হা সীতা!" "হা জানকি!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সীতাও ব্যথিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তমসা সীতাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন,—"রাম কাঁদিতেছেন কাঁদুন, কান্নাই এখন উহাঁর উচিত। কারণ,

"পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥"

—অগাধ জলরাশি যখন তড়াগে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, তখন বাঁধ কাটিয়া দেওয়া যেমন জল নিঃসারণের উপায়, তেমনি অসহ্য শোকাবেগে হৃদয় অবসন্ন হইলে, বিলাপ বা ক্রন্দনে তাহার অনেকটা উপশম হইবার উপায়।"

রাম কতই কাঁদিলেন।—"হায়!

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

—দারুণ দুঃখে আমার হৃদয় বিদলিত করিতেছে, কিন্তু ইহা তো

দুইভাগে বিদীর্ণ হইতেছে না! এ বিকলদেহে বারবার মোহ হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য তো একেবারে লোপ হইতেছে না! অন্তর্দ্দাহে শরীর জ্বলিতেছে, কিন্তু ইহা একেবারে তো ছাই হইয়া যাইতেছে না! বিধাতা মর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিয়া প্রহার করিতেছেন,—কিন্তু এজীবন তো একেবারে ছেদন করিতেছেন না!”

যাহাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য, যাহাদিগের কথায়, রাম, সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কখন বা তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে প্রজামণ্ডলি! আমি অনেক সহিয়াছি, আর পারি না, এই হতভাগ্যের প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও!”

বলিয়াছি তো ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, এখন সেই বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ কি ভয়ানকরূপে আলোড়িত হইতেছে, পাঠক, দেখ।

বাসন্তী, রামকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন,—“সখি! কি বলিতেছ? ধৈর্য্যাবলম্বন? আজি বারো বৎসর হইল, দেবী এই জগৎ শূন্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি রাম কি জীবিত নাই? দিবানিশি প্রিয়াবিরহ-শোক আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে, আমি কি তাহা সহ্য করিতেছি না?—ধৈর্য্য আর কাহাকে বলে?”

বাসন্তী। “দেব! জনস্থানের অন্যান্য বিভাগ দেখুন, চিত্তবিনোদন হইতে পারে।”

সীতা নিষেধ করিতেছেন, আমরাও নিষেধ করি, বাসন্তি! আর দেখাইয়া কাজ নাই। রামের চিত্ত-বিনোদন আর কিসে হইবে?

বাসন্তী দেখাইলেন,—“দেব!

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ

সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে

আয়াস্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

—সীতা গোদাবরী সৈকতে গিয়া, হংস লইয়া তাহাদের জল-ক্রীড়া দর্শনে কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে, সীতা আসিয়া তোমাকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিয়া, মনে ভাবিতেন, না জানি আর্য্যপুত্রের নিকট কত অপরাধ করিয়াছি;—এই ভাবিয়া তিনি নিতান্ত আকুলভাবে পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা কি সুন্দর প্রণামাঞ্জলি বন্ধন করিতেন!"

বাসন্তি! এই কি রামের চিত্তবিনোদের উপায়?

রাম আর থাকিতে পারিলেন না, আবার শোকানল জ্বলিয়া উঠিল, আবার তাঁহার হাহাকারে জনস্থান পূর্ণ হইল। রাম যেদিকে চাহেন, সীতার মূর্ত্তি দেখিতে পান! প্রিয়তমার সেই প্রেমমূর্ত্তি, পরিত্যক্তা বনবাসিনীর সেই করুণমূর্ত্তি, চারিদিক্ হইতে যেন রামের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে লাগিল। রাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—"কৈ সীতা, কোথা সীতা! এই যে তোমায় দেখিতে পাইতেছি! চণ্ডি, দয়া করো, একবার দেখা দাও!—মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিল, আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না!"—বলিতে বলিতে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

ছায়াময়ী, সন্তপ্ত-হৃদয় রামচন্দ্রকে আবার ছায়া দিলেন। বাসন্তী এইরূপে রামকে মর্ম্মপীড়িত করিতেছেন, সীতা মনে মনে কত তিরস্কার করিলেন; রামের ক্রন্দনে আপনিও কাঁদিয়া অধীরা; —"আমার জন্যই তো আর্য্যপুত্রের এই দশা" ভাবিয়া, সতী কাতরা।—ছায়াময়ী আবার রামচন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিলেন।

সে স্পর্শ কেমন ?

বুঝি রামের মতো তেমনি অবস্থায় না পড়িলে, তেমন স্পর্শ, জগতে উপমা দিয়া বুঝানো যায় না ! সে স্পর্শ,—জগতের যেথানে যা কিছু সুন্দর, মধুর, পবিত্র, কোমল ও স্নিগ্ধ আছে, সেই সকলেরই একত্র সমাবেশ করিয়া তাহারই স্পর্শের মতো স্পর্শ ;—তেমন স্পর্শ-সুখ বুঝি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সেই সুখ-স্পর্শ,—সুনির্ম্মল, সুস্নিগ্ধ বসন্তানিলের মতো অদৃশ্য-স্পর্শের স্বর্গীয় সুখ,—রামচন্দ্রের আর এক নূতন মোহ আনিয়া দিল ! তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার অন্তরে-বাহিরে অমৃত-সিঞ্চন করিয়া দিতেছে। তিনি বলিলেন,—"সখি বাসন্তি ! বুঝি ভাগ্য প্রসন্ন হইল !"

বাসন্তী। দেব ! সে কিরূপ ?

রাম নিমিলিত-নয়নে থাকিয়াই বলিলেন,—"আর কি সখি ! সীতাকে পাইয়াছি !"

বাসন্তী। কৈ, জানকী কোথায় ?

রাম। আমি স্পর্শ-সুখেই জানিয়াছি ! দেখ দেখি, তিনি সম্মুখে কি না ?

বাসন্তী। দেব ! এমন মর্ম্মচ্ছেদী প্রলাপবাক্যে এ হত-ভাগিনীকে কেন দগ্ধ করেন ? আমি যে প্রিয়সখীর দুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি।

রাম বিশ্বাস করিলেন না যে, সেখানে সীতা নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সখি ! আমি তো মিথ্যা বলিতেছি না,—আমি পূর্ব্বে বিবাহকালে প্রিয়তমার যে কঙ্কণ-শোভিত সুকোমল পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং চিরদিনই যথেচ্ছ যাহার অমৃত-শীতল

স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়াছি, সেই শিশির-সুমধুর মনোহর লবলী-কন্দল-সদৃশ সুখ-স্পর্শ পাণি আজও পাইয়াছি! বিশ্বাস না হয়, সখি! তুমিও ধরিয়া দেখ!"

ছায়াময়ী মনে মনে বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র! আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!"

বিবাহকালে, প্রিয়তমার যে পাণিস্পর্শ করিয়াছিলেন, রাম-চন্দ্রের আজিও সে স্পর্শ-সুখ মনে আছে! কখন কেহ কি তাহা ভুলিতে পারে? সেই একদিনের, এক মুহূর্ত্তের স্পর্শে, জীবনে নূতন আবরণ পড়িয়া যায়; আধ-আলো, আধ-ছায়াপূর্ণ স্বপ্নরাজ্য হইতে, জীবন উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়, অনাবৃত পৃথিবী মাঝে আপনার পথ পায়,—জীবনেও কেহ কখন কি সে মুহূর্ত্ত, সে স্পর্শ, সে স্পর্শের সে অনির্ব্বচনীয় সুখ, ভুলিতে পারে? আবার, বড় দুঃখের মাঝে পড়িয়া, বড় অসহায় অবস্থায় উপনীত হইয়া, কত-বার আমরা সেই মুহূর্ত্ত স্মরণ করিয়া, প্রাণে বল পাই, হৃদয়ে উৎসাহ পাই, জীবনে আশা পাই! কেহ কখন সে মুহূর্ত্ত ভুলিতে পারে কি? সে মুহূর্ত্ত যে; "অনন্ত-মুহূর্ত্ত"!

সীতা ভাবিতেছেন,—"আর কেন? আমি এই অবসরে পলায়ন করি।"—আহা! সীতাও যে রামের স্পর্শে মুগ্ধ! পলায়ন করিবার কি আর তাঁহার সামর্থ্য আছে? রামের অঙ্গস্পর্শে তিনি পুলকিতা, কম্পিতা ও ঘর্ম্মাক্তদেহা হইলেন। "মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব।" পবনকম্পিত, নববারিশিক্ত, স্ফুট-কোরক কদম্বশাখা যেমন দেখায়, সীতাকে ঠিক তেমনি দেখিতে হইল! তখন সীতার বড় লজ্জা হইল। তিনি তমসাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"না জানি, আমার এ ভাবান্তর দেখিয়া,

তমসা কি মনে করিতেছেন! হয়ত ভাবিতেছেন, সেই যাঁহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, আবার তাঁহারই অঙ্গস্পর্শে এত অনুরাগ!”

রাম ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, সীতা তো সেখানে নাই! তখন তিনি আবার শোকাভিভূত হইলেন।

যেখান হইতে রাক্ষসপতি রাবণ, সতীলক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া, রথে তুলিয়া লইয়াছিল; যেখানে সেই বিহগরাজ জটায়ু রাবণের লৌহ-রথ চূর্ণীকৃত করিয়াছিল; বাসন্তী রামকে সেই স্থান দেখাইয়া বলিলেন, “দেব! ঐ দেখুন, ঐ স্থান হইতেই দুরাত্মা রাবণ দেদীপ্যমানা সীতাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল!”

রামের ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি যেন দেখিলেন, রোরুদ্যমানা অসহায়া সীতাকে লইয়া রাবণ পলাইতেছে। অমনি সবেগে উঠিয়া রাম চীৎকার করিলেন,—“আঃ পাপিষ্ঠ! সীতাপহারিন্! আমার সীতাকে লইয়া কোথায় যাস্!”

বাসন্তী তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাম বলিতে লাগিলেন,—“প্রিয়তমা আমার যখন রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন, তখন শত্রুবধের চিন্তায়, তাঁহার বিরহে তত ক্লেশ পাই নাই; আর বুঝিয়াছিলাম, শত্রু বিনষ্ট হইলেই বিরহ-দুঃখ ঘুচিবে। হায়! এখন যে আর এ বিরহের শেষ নাই!”

শেষ নাই!—এ কথা বলিও না। সুখ বলো, দুঃখ বলো, সকলেরই শেষ আছে। শেষ না থাকিলে এ জীবনভার একান্ত অসহনীয় হইত! বড় দুঃখের মাঝে পড়িয়াই মনে হয়, বুঝি ইহার শেষ নাই! কিন্তু কে কবে এ বিশ্বাস বুকে বাঁধিয়াছে যে, সত্য সত্যই তাহার শেষ নাই! কেবল দুঃখ বলিয়া কেন, সুখের দাবানলও আছে, তাহাতে দগ্ধ হইয়াও কেহ কেহ তাহার শেষ দেখিতে

চাহিয়াছে! শেষ সকলেরই আছে। তবে রামের এ সীতা-বিরহও কি একদিন শেষ হইবে?

রাম বাসন্তীর নিকট বিদায় চাহিলেন।

তখন সীতা নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। তমসাকে বলিলেন,—"দেবি, আর্য্যপুত্র চলিলেন যে!"

তমসা। চলো বাছা, আমরাও যাই।

সীতা। ভগবতি, ক্ষমা করুন, আর একটু দাঁড়ান, দুর্লভ-জনকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লই।

এমনই হয় বটে। ভালবাসার ধনকে এমনই করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। যত দেখ, মনে হয়, আর একবার দেখিলেই দেখার সাধ মিটে। কিন্তু তাহা কি হয়? হওয়া কি সম্ভবপর? সে দর্শন-পিপাসা যে অতৃপ্ত। জন্ম জন্ম দেখিয়াও যে, সে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না;—সাধ পূরে না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না। সে রূপের কি শেষ আছে,—না, সে রূপ-দর্শনে নয়নের তৃপ্তি আছে? তাই না কবি প্রাণের সুরে সুর মিলাইয়া গায়িয়াছেন,—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল!"

সীতা শুনিলেন, রাম বাসন্তীকে বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী হইয়াছে। সে সহধর্ম্মিণী, সীতার সুবর্ণ-ময়ী প্রতিমূর্ত্তি।"

রামের প্রেমপরিপূর্ণ অন্তর দেখিবে তো এইবার দেখিয়া লও! কঠোর কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য নিষ্ঠুর নরাধমের মতো যে হৃদয়, যে প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে;—অকৃত্রিম ও স্বর্গীয় প্রেমের সহিত, নব প্রেমিকের মতো, সেই হৃদয়, সেই প্রতিমাকে আবার অন্তরের

অন্তরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কেমন সমগ্র হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছে, দেখ! এমন কোমলে কঠোর আর কোথাও দেখিব কি? ধন্য কর্ত্তব্য-পালন, আর ধন্য প্রেম! সীতা-নির্ব্বাসন স্মরণ করিয়া যখন রামকে নিষ্ঠুর বলিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিও যে, রামের নূতন সহধর্ম্মিণী—সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি!

শুনিয়া সীতার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আনন্দের সহিত সীতা বলিতে লাগিলেন,—"অজ্জউত্ত! দাণীং সি তুমং, অম্মএ উক্খাণিদং দাণীং মে পরিচ্চাঅলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ।"

"আর্য্যপুত্র! এখন তুমি—তুমি হইলে। এতদিনে তুমি আমার পরিত্যাগ-জনিত অপমান-শল্য উন্মোচন করিলে!"

কথাটার অর্থ বুঝিও। সীতা নির্ব্বাসিতা হইলেও, তিনি যে স্বামি-সোহাগে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে সন্দেহ তাঁহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও হয় নাই। পাছে লোকে মনে করে, পাছে মুনিপত্নীরা ভাবেন যে, সীতা-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে সীতার প্রতি রামের স্নেহ প্রভৃতি সকলই গিয়াছে, সেই ভাবিয়াই সীতা দুঃখিতা। এ দুঃখ বা এ ভাবনাটা,—বড়ই স্বাভাবিক ও সুন্দর! স্বামী, পত্নীর উপর শত অত্যাচার করুন, সতীর তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই; কিন্তু তিনি যদি শুনিয়াছেন, স্বামী তাঁহাকে ভালবাসেন না, দিনান্তেও একবার হৃদয়ে স্থান দেন না,—আবার সেই তাচ্ছিল্যব্যবহার যদি লোকের মুখে মুখে ফিরিতে থাকে, তবেই পত্নীর যথার্থ দুঃখ, যথার্থই তিনি হতভাগিনী! স্বামীর সোহাগ, স্বামীর স্নেহ,—আর্য্য-রমণীর একমাত্র বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘনীয় বিষয়। আজ রামের যজ্ঞস্থানে, সুবর্ণময়ী সীতা মূর্ত্তি দেখিলে, কাহার না মনে হইবে যে, রামের সমগ্র হৃদয় ভরিয়া, সে মূর্ত্তি রাত্রিদিন বিরাজ

করিতেছে? স্বামিসোহাগেই আর্য্যরমণী আপনাকে এত ভাগ্যবতী মনে করেন। *

রাম জনস্থান হইতে চলিলেন। সীতা প্রাণ ভরিয়া রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু কি ফিরাইতে পারেন? ফিরাইয়া লইতে কত যত্ন করিতেছেন,—হায়! দর্শন-পিপাসা তো মিটিতেছে না!—"ণমো ণমো অপূর্ব্বপুণ্ণজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং।"

"আমি অপূর্ব্ব পুণ্যফলে, আজ যাঁহার দর্শনলাভ করিলাম, সেই আর্য্যপুত্রের চরণ-কমলে বারবার নমস্কার করি"—এই বলিয়া সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—

"কি অচ্চিরং বা মেহন্তরেণ পুণ্ণিমাচন্দস্সদংসণম্"—"আমার এ মেঘান্তরে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ ঘটিবে?"

ছায়াময়ীর ম্লান ছায়াখানি সরিয়া গেল! হৃদয়ে কিন্তু চিরদিনের জন্য সে ছায়া রহিয়া গেল!

এখন এই ছায়াতলে পাঠককে বসিয়া, একবার সেই "চিত্রদর্শনের" সময়টা মনে করিতে বলি। সে জ্যোৎস্নাও নাই, সে মৃদুসমীরণও নাই, সে নির্ম্মল আকাশ নাই, সে প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষ নাই,—

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "স্বামি বিচ্ছেদ যেন কাহারও কপালে কখন না হয়; কিন্তু যদি কখনও হয়, তাহাতে যেন এমনই সোহাগ থাকে।"—নবজীবন।

চিত্র-দর্শনের সে প্রেমলালা, সে সুখ, সে সোহাগ, সে কিছুই নাই। আকাশে যে মেঘ উঠিয়াছিল, প্রকৃতির শান্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া যে প্রচণ্ড ঝটিকা উঠিয়াছিল, সুনির্ম্মল গঙ্গাবক্ষের সে প্রশান্ত ভাব বিনষ্ট করিয়া, যে প্রবল তুফান ছুটিয়াছিল,—তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। এখন সহৃদয় পাঠক, এই ছায়াতলে বসিয়া, সেই চিত্র মনে মনে ভাবিয়া দেখ! যাহা কেবল মাত্র অন্তরে উপভোগ করিবার, সে সৌন্দর্য্য-বর্ণনের শক্তি আমার নাই।

সেই চিত্র-দর্শনের সীতা ও এই ছায়া-সীতা,—দেখিয়া, ছায়াময়ীর পানে চাহিও,—কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইবে!

LAH'S LIBRARY
23 SEP 1899
BEHAR.